জাতক সাহিত্যের আলোকে প্রাচীন ভারতের সমাজ জীবন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Library
469961

মৈত্রী তালুকদার
পিএইচ. ডি গবেষক
পালি এণ্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

469961

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ. ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ
জুন ২০১৫

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

জাতক সাহিত্যের আলোকে প্রাচীন ভারতের সমাজ জীবন

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ড. সুকোমল বড়ুয়া
পালি এণ্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

পিএইচ. ডি গবেষক

মৈত্রী তালুকদার
পালি এণ্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

469961

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ. ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

জুন ২০১৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি এণ্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের পিএইচ. ডি গবেষক মৈত্রী তালুকদার **"জাতক সাহিত্যের আলোকে প্রাচীন ভারতের সমাজ জীবন"** শিরোনাম শীর্ষক অভিসন্দর্ভ আমার নির্দেশনায় ও তত্ত্বাবধানে সমাপ্ত করেছেন। আমি অভিসন্দর্ভটি মনোযোগ সহকারে পড়েছি এবং ভুল-ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা করেছি।

অভিসন্দর্ভটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে সম্পন্ন করা হয়েছে। এটি একটি মৌলিক গবেষণার বিষয়, যেখানে তাঁর শ্রম, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। এ গবেষণাকর্মে প্রাচীন ভারতের সমাজ জীবন সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে নতুন দিগন্ত উন্মোচনে সহায়ক হবে।

আমি অভিসন্দর্ভে বর্ণিত বিষয়বস্তু যথাসম্ভব যাচাই করেছি এবং উপস্থাপিত তথ্যসমূহ সঠিক বলে প্রতীয়মান হয়েছে । এর কোনো অংশ ইতোপূর্বে কোথাও প্রকাশিত কিংবা অন্য কোনো ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত হয় নি।

আমার বিশ্বাস, অভিসন্দর্ভটি শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও গবেষকদের তথ্য ও পাঠ সহায়ক হবে। এমন কি নানা সামাজিক সংকটকে বিপর্যস্ত শান্তিকামী মানুষ এ গবেষণাকর্ম থেকে শান্তি-শৃঙ্খলা, নীতি-নৈতিকতা ও মানবিকগুণের বহু গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা লাভে সমর্থ হবে।

469961

উপর্যুক্ত মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে আমি পালি এণ্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের গবেষক মৈত্রী তালুকদারকে **'জাতক সাহিত্যের আলোকে প্রাচীন ভারতের সমাজ জীবন'** শিরোনাম শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে পিএইচ. ডিগ্রি প্রাপ্তির লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি অনুযায়ী জমা দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছি।

১৪.০৩.২০১৫

(অধ্যাপক ড. সুকোমল বড়ুয়া)
পিএইচ. ডি তত্ত্বাবধায়ক
পালি এণ্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

তত্ত্বাবধায়ক
এম. ফিল/পিএইচডি কোর্স
পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি মৈত্রী তালুকদার, পিএইচ. ডি গবেষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি এণ্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. সুকোমল বড়ুয়া-এর তত্ত্বাবধানে প্রয়োজনীয় কোর্স ওয়ার্ক সমাপ্ত করার পর যথাযথ গবেষণার নিয়ম অনুসরণপূর্বক **"জাতক সাহিত্যের আলোকে প্রাচীন ভারতের সমাজ জীবন"** শিরোনাম শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ. ডি ডিগ্রি প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করেছি। এ অভিসন্দর্ভে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলে তার দায়-দায়িত্ব আমার উপর বর্তাবে।

আমি আরো ঘোষণা করছি যে, এ অভিসন্দর্ভের কোনো অংশ ইতোপূর্বে কোথাও প্রকাশিত কিংবা অন্য কোনো ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত হয় নি।

মৈত্রী তালুকদার
২৪.৬.২০

(মৈত্রী তালুকদার)
পিএইচ. ডি গবেষক
পালি এণ্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

সূচি

	পৃষ্ঠা
প্রসঙ্গকথা	১
অবতরণিকা	২-৮
প্রথম অধ্যায় : জাতকের স্বরূপ সমীক্ষা	৯-৩৩
দ্বিতীয় অধ্যায় : প্রাচীন ভারতের ভৌগোলিক সংস্থান	৩৪-৬৩
তৃতীয় অধ্যায় : প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা	৬৪-১১১
চতুর্থ অধ্যায় : প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্র কাঠামো ও জনজীবন	১১২-১৩৯
পঞ্চম অধ্যায় : প্রাচীন ভারতের সমাজ ও সামাজিক প্রথা	১৪০-১৭৩
ষষ্ঠ অধ্যায় : প্রাচীন ভারতের ধর্মীয় মতাদর্শ	১৭৪-২০৩
সপ্তম অধ্যায় : প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতি	২০৪-২২৮
অষ্টম অধ্যায় : প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা	২২৯-২৪৯
উপসংহার	২৫০-২৫৭
গ্রন্থপঞ্জি	২৫৮-২৬৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গকথা

"জাতক সাহিত্যের আলোকে প্রাচীন ভারতের সমাজ জীবন" শিরোনাম শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমি বিশিষ্ট বৌদ্ধতত্ত্ববিদ্ পালি এণ্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. সুকোমল বড়ুয়ার তত্ত্বাবধানে রচনা করেছি। গবেষণার বিষয় নির্ধারণ, রূপরেখা প্রণয়ন, তথ্য নির্দেশ, তথ্য পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ এবং বিষয়-বিন্যাস প্রভৃতি গবেষণা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অসীম ধৈর্যসহকারে উপদেশ এবং নির্দেশনা প্রদান করে অভিসন্দর্ভ রচনায় তিনি সার্বিক সহযোগিতা করেছেন। ফলে আমি অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে গবেষণা সম্পন্ন করতে পেরেছি। প্রথমেই আমি তাঁর প্রতি অপরিসীম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

এছাড়াও, অভিসন্দর্ভ রচনার ক্ষেত্রে আমি বহু বিদগ্ধজনের সাহায্য, সহযোগিতা এবং পরামর্শ লাভ করেছি। তন্মধ্যে পালি এণ্ড বুদ্ধিস্ট বিভাগের মাননীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. বেলু রানী বড়ুয়ার নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। সেমিনার আয়োজন, অভিসন্দর্ভ জমাদান এবং অভিসন্দর্ভ রচনাকালে তাঁর সহযোগিতা, পরামর্শ এবং আন্তরিক উৎসাহ আমাকে দুরূহ গবেষণাকর্মে একনিষ্ঠ হতে অনুপ্রাণিত করেছে। আমি তাঁর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। জাপানের কিয়োটোস্থ রিওকোকু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইউশো ওয়াকাহারা (Prof. Yusho Wakahara) এবং ড. ওকামোতো কেনসুকে (Dr. Okamoto Kensuke) অভিসন্দর্ভ রচনায় আমাকে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। তাঁরা আমাকে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে নুমাতা ফেলোশিপের (Numata Fellowship) মাধ্যমে দু'মাস গবেষণা করার সুযোগ দান করেছেন এবং গবেষণার তথ্য সংগ্রহসহ অভিসন্দর্ভ রচনার কলা-কৌশল বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। তাঁদের আন্তরিক সহযোগিতা আমি কৃতজ্ঞ ও শ্রদ্ধাচিত্তে স্মরণ করছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক মনসুর মুসা এবং অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এ দু'জন বিদগ্ধ পণ্ডিতের সার্বক্ষণিক উৎসাহ এবং পরামর্শ আমাকে গবেষণা দ্রুত সমাপ্ত করতে উজ্জীবিত করেছে। পালি এণ্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের সম্মানিত শিক্ষকমণ্ডলী, বিশেষত ঋদ্ধ পণ্ডিত অধ্যাপক ড. সুমঙ্গল বড়ুয়া, অধ্যাপক ড. বিমান চন্দ্র বড়ুয়া, অধ্যাপক ড. সুমন কান্তি বড়ুয়া প্রমুখের সহযোগিতা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রভাষক আমার একান্ত সুহৃদ ড. ময়না তালুকদার এবং পালি এণ্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের প্রভাষক ভাগিনা শান্টু বড়ুয়ার প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তাঁরা অভিসন্দর্ভের প্রুফ দেখে এবং গবেষণা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নানা পরামর্শ প্রদান করে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করেছেন। অভিসন্দর্ভের তথ্যসংগ্রহকালে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাপানের রিওকোকু ও আইচি গাকুইন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীদের আন্তরিক সহযোগিতা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি। পালি এণ্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের সহযোগিতাও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

পরিশেষে, বাংলাদেশের বৌদ্ধদের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা, বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের সভাপতি পিতৃব্য সংঘনায়ক শুদ্ধানন্দ মহাথের এবং আমার স্বামী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি এণ্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. দিলীপ কুমার বড়ুয়ার প্রতি আমি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তাঁদের উৎসাহ এবং সহযোগিতায় এ অভিসন্দর্ভ সফলভাবে সমাপ্ত করতে সক্ষম হয়েছি।

মৈত্রী তালুকদার

(মৈত্রী তালুকদার)

Dhaka University Institutional Repository

অবতরণিকা

১. প্রস্তাবনা

গৌতমবুদ্ধের জীবন-দর্শন জাতকের প্রধান উপজীব্য বিষয়। বুদ্ধ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে তাঁর শিষ্য ও অনুসারীদের ধর্মোপদেশ দেওয়ার সময় অকুশলকর্ম পরিত্যাগ এবং কুশলকর্ম সম্পাদনে উদ্বুদ্ধ করার মানসে প্রসঙ্গক্রমে তাঁর অতীত জীবনের অর্থাৎ বোধিসত্ত্বরূপে পারমীপূর্ণকালীন জীবনের নানা কাহিনি ভাষণ করতেন। গৌতম বুদ্ধের অতীত জীবনের এসব কাহিনি বৌদ্ধ সাহিত্যের ভাণ্ডারে 'জাতক' নামে অভিহিত। কাহিনিগুলো যে গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে সে গ্রন্থও 'জাতক' নামে পরিচিত। উল্লেখ্য যে, জাতকের প্রতিটি কাহিনিতে একটি স্বতন্ত্র ধারার কিন্তু অভিন্ন রচনাশৈলী অনুসৃত হয়েছে। অপূর্ব রচনাশৈলী এবং বিষয়বস্তুর বহুমুখী গুরুত্ব ও আবেদনের কারণে বৌদ্ধ সাহিত্যের ভাণ্ডারে 'জাতক' একটি স্বতন্ত্র ধারার সাহিত্যকর্ম হিসেবে মর্যাদা লাভ করে এবং নানা দেশের নানা ভাষায় নানা আঙ্গিকে সংকলিত হয়ে জাতকের কলেবর বৃদ্ধি পায়। গৌতম বুদ্ধকে জাতকের স্রষ্টা হিসেবে গণ্য করা হলেও তিনি কতগুলো জাতক ভাষণ করেছিলেন তার সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন। উল্লেখ্য যে, বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ তথা মৃত্যুর পর থেকে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতক পর্যন্ত বুদ্ধের ধর্মবাণী গুর-শিষ্য পরম্পরা স্মৃতিতে ধারণপূর্বক সংরক্ষণ এবং প্রচার করা হতো। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে তা প্রথম সিংহলে তালপত্রে লিখিত আকারে সংরক্ষণ করা হয়। ফলে দীর্ঘ পথপরিক্রমায় নানা কারণে বহু জাতক কাহিনি কালের গর্ভে হারিয়ে যায়, আবার বহু কাহিনি যুক্ত হয়ে জাতকের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে। এ কারণে বিভিন্ন গ্রন্থে জাতকের সংখ্যা নিয়ে তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে পালি ভাষায় রচিত *জাতক* গ্রন্থে ৫৪৭টি জাতক বা কাহিনি পাওয়া যায়। এ গ্রন্থটি থেরবাদী বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থ ত্রিপিটকের অন্তর্গত খুদ্দক নিকায়ের দশম গ্রন্থ হিসেবে স্থান লাভ করেছে। তবে আচার্য বুদ্ধঘোষ কর্তৃক পালি ভাষায় রচিত *জাতকত্থবণ্ণনা* নামক অট্ঠকথায় ৫৫০টি জাতকের উল্লেখ পাওয়া যায়। অপরদিকে, সংস্কৃত ভাষায় রচিত *জাতকমালা* গ্রন্থে ৩৪টি জাতক সংকলিত আছে। বহু গবেষক এ ৩৪টি জাতককে আদি বা মূল জাতক হিসেবে অভিহিত করেন। সংস্কৃত ভাষায় রচিত 'মহাবস্তু' নামক অপর একটি গ্রন্থে প্রায় ৮০টি জাতকের উল্লেখ দেখা যায়। তিব্বতে তিব্বতি ভাষায় গল্পের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ৫৬৫টি কাহিনি যুক্ত একটি জাতক গ্রন্থ আছে। এছাড়া, জাতকের আদলে বৃহৎকথা, পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, কথাসরিৎসাগর, সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা, শুকসপ্ততি, জৈন কথাকোষ এবং অবদান প্রভৃতি গ্রন্থ রচিত হয়। এসব গ্রন্থে জাতকের ন্যায় অসংখ্য নৈতিক কাহিনি

সংকলিত আছে। মূলত জাতকের ন্যায় নৈতিক শিক্ষা দান ছিল এসব গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য। এতে বোঝা যায়, প্রাচীন ভারতে জাতকের বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত একটি স্বতন্ত্র সাহিত্য ধারা গড়ে ওঠেছিল। আমি 'জাতক সাহিত্যের আলোকে প্রাচীন ভারতের সমাজ জীবন' শিরোনাম শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি মূলত পালি ভাষায় রচিত জাতক গ্রন্থের ৫৪৭টি জাতক সমীক্ষার আলোকে রচনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।

২. গবেষণা উদ্দেশ্য

ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি, মানুষকে নৈতিকতায় প্রতিষ্ঠিত এবং কুশলকর্ম সম্পাদনে উদ্বুদ্ধ করার অভিপ্রায়ে জাতকগুলো ভাষিত হয়েছিল। গৌতম বুদ্ধ সুদীর্ঘ ৪৫ বছর ধর্ম প্রচারকালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে জাতকগুলো ভাষণ করেছিলেন। ফলে জাতকে বিক্ষিপ্তভাবে ভারতবর্ষের জনজীবন সংশ্লিষ্ট বহু তথ্য পাওয়া যায়। মূলত এসব তথ্য জাতকের 'প্রত্যুৎপন্ন বস্তু' তথা 'বর্তমান কথা' নামক অংশে পাওয়া যায়। এ অংশে কখন, কার উদ্দেশ্যে এবং কি উপলক্ষে জাতকটি ভাষিত হয়েছিল তার বর্ণনা আছে। অর্থাৎ এ অংশে বর্ণিত বিষয় জাতক ভাষণকারী বা রচয়িতার সমকালীন। এ অংশের তথ্যসমূহ জাতক ভাষণকারীর স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ বা দৃষ্ট হওয়ায় এসব তথ্যের ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। এ কারণে জাতককে প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক, ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পুরাতাত্ত্বিক, শিল্পকলা, ভাষা, সাহিত্য, লোকাচার, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতির ইতিহাস রচনার অনন্য উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়। জাতকে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা তথ্যাদির আলোকে প্রাচীন ভারতের সমাজ জীবনের স্বরূপ প্রকটিত করার মাধ্যমে নৃতাত্ত্বিক জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করাই এ অতিসন্দর্ভের মৌল উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যকে ফলপ্রসু করার মানসে 'জাতক সাহিত্যের আলোকে প্রাচীন ভারতের সমাজ জীবন' শিরোনাম শীর্ষক বিষয়টি গবেষণার বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছি।

জাতকের রচনাকাল নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতানৈক্য লক্ষ্য করা যায়। সবগুলো জাতক গৌতমবুদ্ধ কর্তৃক ভাষিত হয়েছিল কিনা সে বিষয়েও বিতর্ক পরিলক্ষিত হয়। জাতকের রচনাশৈলী বিচার করলে জাতকগুলো নানা ব্যক্তির নানা সময়ের রচনা বলে প্রতীয়মান হয়। রচনাকাল ও রচয়িতা সম্পর্কে বিতর্ক থাকলেও পণ্ডিতগণ বিশ্বাস করেন যে, অধিকাংশ জাতক খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের পূর্বে রচিত হয়েছিল। কারণ, সিংহলে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে বুদ্ধের অন্যান্য ধর্ম-দর্শনের ন্যায় জাতকসমূহও লিখিত আকারে সংরক্ষণ করা হয়েছিল। গৌতম বুদ্ধকে যেহেতু জাতকের স্রষ্টা এবং বর্তমানে যেসব জাতক পাওয়া যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক তিনি ভাষণ করেছিলেন বলে মনে করা হয়, সেহেতু জাতকে গৌতম বুদ্ধের পূর্ববর্তী

Dhaka University Institutional Repository

কয়েকশত বছরের পূর্বেকার তথ্য থাকা স্বাভাবিক। কারণ তাঁর সময়ে প্রচলিত বিষয়সমূহ অতীতের পথপরিক্রমা অতিক্রম করে বর্তমানে উপনীত হয়েছিল। অতএব, এখানে প্রাচীন ভারত বলতে, গৌতম বুদ্ধের কয়েকশত বছর পূর্ব থেকে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত সময়কালকে বোঝানো হয়েছে।

৩. গবেষণার পরিধি

'জাতক' প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার গুরুত্বপূর্ণ আধার। আধুনিক সাহিত্যেকর্মেও জাতকের উল্লেখযোগ্য প্রভাব লক্ষ্য করা যায় বিধায় জাতককে বর্তমানকালের উপন্যাস, রূপকথা এবং আখ্যায়িকা রচনার উৎস হিসেবেও বিবেচনা করা হয়। শুধু তা-ই নয়, যে সমস্ত কথাসাহিত্য লোক পরম্পরা চলে আসছে আদিম অবস্থায় সেগুলোর স্বরূপ কি ছিল, কেন রচিত হয়েছিল, স্থান-কাল-পাত্র ভেদে সেগুলো কিভাবে পরিবর্তিত হয়ে আসছিল প্রভৃতি জানার জন্যও জাতক সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। তাছাড়া, জাতকের কাহিনিগুলো নৈতিক আদর্শে পরিপূর্ণ হওয়ায় জাতক সাহিত্য হতে চিত্তরঞ্জক আখ্যান সংগ্রহ করে শিশুতোষ গ্রন্থ রচনার প্রবৃত্তিও লক্ষণীয় হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অধিকন্তু জাতকে প্রাপ্ত তথ্যের মাধ্যমে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে নতুন আঙ্গিকে, নতুন মাত্রায় উপস্থাপন করা সম্ভব হবে। উপর্যুক্ত কারণে পালি ভাষায় রচিত জাতকসমূহ শুধু বৌদ্ধ সাহিত্যে নয়, বিশ্বসাহিত্যের ভাণ্ডারেও এক অমূল্য সম্পদ হিসেবে স্বীকৃত।

জাতক সাহিত্যের বহুমুখী উপযোগিতা লক্ষ্য করে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন ভাষায় জাতক সাহিত্যের অনুবাদ ও গবেষণাকর্ম দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশে বিক্ষিপ্ত কিছু প্রবন্ধ ছাড়া সুচারুরূপে প্রাতিষ্ঠানিক কোনো গবেষণা হয়নি। এর কারণ হিসেবে নিম্নের বিষয়সমূহ চিহ্নিত করা যায় :

ক) অনুবাদসহ মূল পাঠের দুস্প্রাপ্যতা;
খ) বিদেশী গবেষকদের গবেষণা লব্ধ তথ্যের অভাব;
গ) পালি ভাষায় দক্ষতার অভাব;
ঘ) বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পালি এবং বৌদ্ধ সাহিত্যের পঠন-পাঠন ও গবেষণার সীমাবদ্ধতা; এবং
ঙ) বাংলাদেশের গবেষকদের প্রস্তাবিত বিষয়ে অনাগ্রহ।

উপর্যুক্ত বিষয় বিবেচনা করে বলা যায়, গবেষণার বিষয় হিসেবে প্রস্তাবিত অভিসন্দর্ভের বিষয়টির যথেষ্ট উপযোগিতা রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে দেশ-বিদেশের গবেষকদের

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণাকর্ম ও তথ্যাদি অনেক ক্ষেত্রে সহজলভ্য হয়েছে। ফলে প্রস্তাবিত বিষয়ে গবেষণা করার জন্য আমি উৎসাহ বোধ করি।

৪. গবেষণার পদ্ধতি

গবেষণাকর্মটি মূলত সাহিত্য নির্ভর এবং বিবৃতি মূলক। এ কারণে গবেষণায় তুলনামূলক বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। জাতকে প্রাচীন ভারতের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে যেসব তথ্য পাওয়া যায়, তাতে ইতিহাসস্পর্শী তথ্যের পাশাপাশি অতিরঞ্জিত তথ্যও রয়েছে। অতিরঞ্জিত তথ্যসমূহ হতে ইতিহাসস্পর্শী তথ্যসমূহ পৃথক করার ক্ষেত্রে তুলনামূলক বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি গ্রহণ করাই আমি অধিক যুক্তিযুক্ত বলে মনে করি। বিশেষত, জাতক সাহিত্যের সমকালীন ভারতবর্ষের সমাজ জীবনের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে ইতিহাসসম্মত ধারণা দেওয়ার জন্য নিম্নোক্ত গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করি।

ক) ঐতিহাসিক তথ্য নির্ধারণ।

খ) অতিরঞ্জিত তথ্যসমূহের ভিত্তি বিচার।

ক) ঐতিহাসিক তথ্য নির্ধারণ : ত্রিপিটকের অন্তর্গত গ্রন্থসমূহে বুদ্ধের সমকালীন অনেক তথ্য পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জাতক সাহিত্যে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ কতটুকু সত্যস্পর্শী তা ত্রিপিটক সাহিত্যের গ্রন্থসমূহ, প্রাচীন শিলালেখ, ঐতিহাসিক আকর গ্রন্থ, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এবং বিভিন্ন ভ্রমণবিদ্‌দের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পর্যালোচনার মাধ্যমে তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ করি। জাতকের যেসব তথ্য উপর্যুক্ত উৎসের তথ্যের সঙ্গে মিল পাওয়া গেছে বা একাধিক ভারতীয় আকর গ্রন্থে এবং বিভিন্ন দেশের অনুবাদ গ্রন্থে অভিন্নরূপে পাওয়া গেছে সেসব তথ্য ইতিহাসস্পর্শী তথ্য হিসেবে বিবেচনা করেছি এবং বৈসাদৃশ্য তথ্যসমূহ অতিরঞ্জিত তথ্য বা Legend হিসেবে গণ্য করেছি।

খ) অতিরঞ্জিত তথ্যসমূহের ভিত্তি বিচার : অতিরঞ্জিত তথ্যসমূহ সৃষ্টি ও প্রচারের কারণ বিচার–বিশ্লেষণপূর্বক তথ্যসমূহের ভিত্তি যাচাই করি। বিশেষত, অতিরঞ্জিত বিষয়সমূহ সৃষ্টির পশ্চাতে কোনো ঐতিহাসিক কারণ নিহিত আছে কিনা তা সমীক্ষাপূর্বক তথ্যসমূহের ঐতিহাসিকত্ব নির্ধারণ করার চেষ্টা করি।

এভাবে উপর্যুক্ত গবেষণা পদ্ধতির মাধ্যমে ইতিহাসসম্মত তথ্যসমূহ নির্ধারণ করে প্রাচীন ভারতের সমাজ জীবনের প্রকৃত স্বরূপ প্রকটিত করার চেষ্টা করেছি ।

Dhaka University Institutional Repository

৫. অভিসন্দর্ভের গঠন-পরিকল্পনা

প্রথমে অবতরণিকায় অভিসন্দর্ভের উদ্দেশ্য-আদর্শ, পরিধি, গবেষণা পদ্ধতি এবং গবেষণার উৎস প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করি। তৎপর আলোচ্য বিষয়বস্তু আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে অভিসন্দর্ভটি বিন্যস্ত করি।

প্রথম অধ্যায়ে জাতকের স্বরূপ সমীক্ষা করেছি। অভিসন্দর্ভটি যেহেতু জাতকের তথ্যের আলোকে রচিত, সেহেতু জাতকে বর্ণিত তথ্যের ঐতিহাসিকত্ব নির্ধারণ করা অত্যাবশ্যক। জাতকের স্বরূপ সমীক্ষার মাধ্যমে জাতকে বর্ণিত তথ্যের ঐতিহাসিকত্ব নির্ণয় করা যায়। তাই প্রথম অধ্যায়ে বিষয়টি সন্নিবেশিত করেছি। ভৌগোলিক সীমারেখা, রাজনীতি, রাষ্ট্র ব্যবস্থা, জনজীবন, সামাজিক প্রথা ও রীতি-নীতি, ধর্ম-দর্শন, শিক্ষা-সংস্কৃতি, অর্থনীতি প্রভৃতি সমাজ জীবনের অবিচ্ছেদ্য উপাদান। পরবর্তী অধ্যায়সমূহে এসব উপাদান ব্যাখ্যাপূর্বক প্রাচীন ভারতের সমাজ জীবনের প্রতিচ্ছবি অঙ্কন করার চেষ্টা করেছি।

ভৌগোলিক প্রভাবের কারণে বা অঞ্চল ভেদে সমাজ জীবন, রীতি-নীতি এবং আচার-অনুষ্ঠানে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীন ভারতের সমাজ জীবনের প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচন করতে হলে কোন্ কোন্ ভৌগোলিক অঞ্চল বা এলাকাকে ঘিরে সেই সমাজ জীবনের ভিত্তি রচিত হয়েছিল তা নির্ণয় করা আবশ্যক। এ উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রাচীন ভারতের ভৌগোলিক সংস্থান বা অবস্থা সম্পর্কে পর্যালোচনা করেছি।

রাষ্ট্র-কাঠামো গঠন ও সমাজ জীবন বিকাশে রাজনৈতিক কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রাচীন ভারতের রাষ্ট কাঠামো গঠনে এবং সমাজ জীবন বিকাশে রাজনীতি কীরূপ ভূমিকা রেখেছিল তা প্রতিভাত করার অভিপ্রায়ে তৃতীয় অধ্যায়ে প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা বা কার্যক্রম পর্যালোচনা করেছি।

রাষ্ট্র এবং জনজীবন ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। কারণ রাষ্ট্রীয় অবকাঠামো এবং বিধি-বিধান সমাজ জীবনের ভিত্তি নির্মাণ করে। তাই প্রাচীন ভারতে সমাজ জীবনের ভিত্তি কীভাবে রচিত হয়েছিল তা প্রকটিত করার মানসে চতুর্থ অধ্যায়ে প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্র কাঠামো ও জনজীবন সম্পর্কে আলোচনা করেছি।

সমাজ ব্যবস্থা এবং নানা রকম সামাজিক প্রথা বা বিধি-নিষেধ, রীতি-নীতি এবং আচার-অনুষ্ঠান সুশৃঙ্খল সামাজিক অবকাঠমো নির্মাণ করে। উপর্যুক্ত বিষয়গুলো প্রাচীন ভারতের সমাজ জীবনের অবকাঠামো

Dhaka University Institutional Repository

নির্মাণে কীরূপ প্রভাব বিস্তার করেছিল তা নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে পঞ্চম অধ্যায়ে প্রাচীন ভারতের সমাজ ব্যবস্থা এবং প্রচলিত সামাজিক প্রথাসমূহ সমীক্ষা করেছি।

ধর্ম সমাজ জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। প্রাচীন ভারতের ধর্মীয় মতাদর্শ কীরূপ ছিল এবং তা তৎকালীন সমাজ জীবনকে কীরূপ প্রভাবিত করেছিল তার স্বরূপ উন্মোচন করার প্রয়াসে ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ধর্মীয় মতাদর্শ সম্পর্কে আলোচনা করেছি।

শিক্ষা এবং সংস্কৃতি মানব সমাজের অন্যতম দু'টি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। শিক্ষা মানুষের অর্ন্তদৃষ্টিকে সম্প্রসারিত করে এবং জাতীয় সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করতে সহযোগিতা করে। অপরদিকে, সংস্কৃতি মননশীলতাকে ঋদ্ধ করত মানুষের মধ্যে অনন্ত সম্ভাবনার বিকাশ ঘটায়। তাই শিক্ষা এবং সংস্কৃতিতে যে জাতি যত বেশি সমৃদ্ধ সে জাতি বিশ্বদরবারে তত বেশি মর্যাদার আসনে সমাসীন। শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রাচীন ভারতের সমাজ জীবনে কিরূপ ভূমিকা রেখেছিল তা উন্মোচন করার উদ্দেশ্যে সপ্তম অধ্যায়ে প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে পর্যালোচনা করেছি।

অর্থনীতি এবং সমাজজীবন ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। অর্থনীতিতে যে দেশ যতবেশি সমৃদ্ধ সে দেশের জনজীবন ততবেশি উন্নত। তাই অর্থনীতিকে একটি রাষ্ট্রের মূল চালিকা শক্তি এবং সমৃদ্ধির মাপকাঠি হিসেবে গণ্য করা হয়। শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং মুদ্রা ব্যবস্থা হচ্ছে অর্থনীতির তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বা স্তম্ভ। অষ্টম অধ্যায়ে এসব বিষয় আলোচনাপূর্বক প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং সমাজ জীবনে এর প্রভাব সম্পর্কে ধারণা প্রদানের চেষ্টা করেছি।

পরিশেষে, গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল উপস্থাপনপূর্বক অভিসন্দর্ভের উপসংহার টানি এবং সর্বশেষে তথ্যপঞ্জি উপস্থাপনপূর্বক অভিসন্দর্ভের উৎস নির্দেশ করি।

৬. গবেষণার উৎস :

অভিসন্দর্ভ রচনায় প্রাথমিক এবং দ্বৈতীয়িক - দু'ধরণের উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করি। অভিসন্দর্ভটি মূলত জাতকের তথ্যের আলোকে রচিত। এ কারণে জাতককে প্রাথমিক উৎসসমূহের মধ্যে অন্যতম হিসেবে গণ্য করেছি। এক্ষেত্রে লণ্ডনের পালি টেকস্ট সোসাইটি হতে ষষ্ঠ খণ্ডে প্রকাশিত জাতক গ্রন্থ এবং শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক বাংলায় অনূদিত ষষ্ঠ খণ্ডে প্রকাশিত জাতক গ্রন্থকে আদর্শ উৎস হিসেবে বিবেচনা করেছি। জাতকের তথ্যের ঐতিহাসিকত্ব নির্ণয়ের জন্য বিভিন্ন পালি এবং সংস্কৃত গ্রন্থের তথ্যের সঙ্গে

Dhaka University Institutional Repository

তুলনামূলক পর্যালোচনা করেছি। এ কারণে পালি এবং সংস্কৃত ভাষায় রচিত বহু গ্রন্থও প্রাথমিক উৎস হিসেবে গণ্য করেছি। এরূপ উৎসের মধ্যে অন্যতম হলো : দীর্ঘনিকায়, মজ্ঝিমনিকায়, সংযুক্ত-নিকায়, অঙ্গুত্তর-নিকায়, খুদ্দকনিকায় (খুদ্দকনিকায়ের অন্যান্য ১৫টি গ্রন্থ), মহাবর্গ, সুত্তবিভঙ্গ, কথাবত্থু, মিলিন্দ প্রশ্ন, বিশুদ্ধিমার্গ, সুমঙ্গলবিলাসিনী, পপঞ্চসূদনী, সারত্থপ্পকাসিনী, মনোরথপূরণী, পরমত্থজোতিকা, ধম্মপদট্ঠকথা, পরমত্থদীপনী, সদ্ধম্মপজ্জোতিকা, সদ্ধম্মপ্পকাসিনী, সমন্তপাসাদিকা, অত্থসালিনী, সম্মোহবিনোদনী, পঞ্চপকরণট্ঠকথা, মহাবস্তু, ললিতবিস্তর, বুদ্ধচরিতম্, সৌন্দরনন্দম্, বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা, মনুসংহিতা, শ্রীমদ্ভগবদগীতা, মৃচ্ছকটিক, কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম।

বিষয়বস্তুর যথার্থতা প্রতিপাদনের জন্য দেশ-বিদেশে বিভিন্ন গবেষকের বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ হতেও তথ্য সংগ্রহ করি, যা দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে গণ্য করেছি। এছাড়া, ভ্রমণবৃত্তান্ত এবং প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য প্রমাণেরও সাহায্য নিয়েছি। এভাবে প্রাথমিক ও দ্বৈতীয়িক উৎস হতে তথ্য সংগ্রহপূর্বক অভিসন্দর্ভটি রচনা করেছি।

৭. প্রত্যাশা

আমার বিশ্বাস অভিসন্দর্ভটি ভারতীয় নৃতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞানকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করবে। বিশেষত, প্রাচীন ভারতের সমাজ জীবন সম্পর্কে ধারণা প্রদানে অভিসন্দর্ভটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। যদি তা-ই হয়, তাহলে আমার পরিশ্রম সার্থক প্রতিপন্ন হবে। আশা করি, ভবিষ্যতে গবেষকগণ আলোচ্য বিষয়ে আরো বিস্তারিতভাবে গবেষণা করে আমার অভিসন্দর্ভের অপূর্ণতাটুকু পূর্ণতায় ভরে তুলবেন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

জাতকের স্বরূপ সমীক্ষা

১. ভূমিকা

ইতোপূর্বে ভূমিকায় উল্লেখ করেছি, জাতকে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে প্রাচীন ভারতের সমাজ জীবন প্রকটিত করাই আমার অভিসন্দর্ভের মূল উদ্দেশ্য। অভিসন্দর্ভের আলোচ্য বিষয়ের যথার্থতা প্রতিপন্ন করার জন্য জাতকে প্রাপ্ত তথ্য কতটুকু বস্তুনিষ্ঠ এবং ইতিহাসস্পর্শী তা নির্ধারণ করা একান্ত আবশ্যক। এ বিষয়টি জাতক গ্রন্থের স্বরূপ সমীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্ট করা যায়। তাই এ অধ্যায়ে জাতকের প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচন করার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে।

২. জাতক কী?

জাতকে গৌতম বুদ্ধের অতীত জীবনের কাহিনীগুলো সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ আছে। পালি সাহিত্য মতে, সিদ্ধার্থ গৌতম এক জন্মের পুণ্য কর্মের ফলে বুদ্ধ হন নি। বুদ্ধত্ব বা বোধিজ্ঞান লাভের জন্য তাঁকে জন্ম-জন্মান্তর ধরে সংসার চক্রে পরিভ্রমণ করে পারমী[১] সাধনা করতে হয়েছিল। পালি সাহিত্যে উল্লেখ আছে, বুদ্ধ দশ পারমী অর্থাৎ দান, শীল, নৈষ্ক্রম্য, বীর্য, ক্ষান্তি, মৈত্রী, সত্য, ভাবনা, অধিষ্ঠান ও উপেক্ষা প্রভৃতি চর্চা করে বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন। এ পারমীগুলো পূর্ণ করার জন্য বোধিসত্ত্ব বা বুদ্ধাংকুরকে অসংখ্যবার নানা কূলে জন্ম গ্রহণ করতে হয়েছিল। প্রতিটি জন্মে তিনি 'বোধিসত্ত্ব' নামে অভিহিত হতেন। জাতকের বিভিন্ন কাহিনী বিশ্লেষণে দেখা যায়, বোধিসত্ত্ব কর্মফলের কারণে কখনও রাজা, কখনও দেবতা, কখনও প্রজা, কখনও বণিক, কখনও সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোক, কখনও চণ্ডাল, আবার কখনও হস্তী, অশ্ব, ময়ূর কিংবা রাজহংসরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।[২] কিন্তু প্রতি জন্মে তিনি পারমী পূর্ণ এবং মঙ্গলময় কর্ম সাধন করে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হন। বোধিসত্ত্ব তাঁর নানা জন্মের পরস্পর সূত্রাবদ্ধ জীবনে দশ পারমিতার অনুশীলন দ্বারা সম্বোধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এতে তাঁর জাতিস্বর জ্ঞান লাভ হয়। তিনি জাতিস্বর জ্ঞানের দ্বারা অতীত জীবনের কাহিনী বলতে পারতেন। বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নৈতিক বা ধর্মের গূঢ়তত্ত্ব শিক্ষা দানের জন্য তিনি শিষ্যদের অতীত জীবনের এসব কাহিনী বলতেন। নৈতিকতা সংশ্লিষ্ট এই উপদেশগুলো শিষ্যদের নিকট অতীব মনোরম ও চমকপ্রদ মনে হতো। ফলে জাতকের মাধ্যমে বুদ্ধশিষ্যগণ অতি সহজে ধর্মের গভীর তত্ত্বগুলো হৃদয়ঙ্গম করতে পারতেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মহাধর্মপাল জাতক[৩] শুনিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

বুদ্ধ স্বীয় পিতাকে স্বদ্ধর্মে দীক্ষিত করেন এবং চন্দ্রকিন্নর জাতক[৪] ভাষণ করে রাহুল মাতাকে[৫] তাঁর পতিব্রতার প্রশংসা করেন। স্পন্দন, দর্দ্দভ, লটুকিক, বৃক্ষধর্ম ও সম্মোদমান এই পঞ্চ জাতক[৬] শুনিয়ে শাক্য ও কোলিয়দের বিরোধ নিরসন করেন। মূলত নৈতিক শিক্ষাদান প্রসঙ্গে জাতকগুলো কথিত বা ভাষিত হয়েছিল। গৌতম বুদ্ধের অতীত জীবনের এসব কাহিনীই বৌদ্ধ সাহিত্যে 'জাতক' নামে অভিহিত।

৩. 'জাতক' শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ

'জাতক' শব্দটি 'জাত' হতে উদ্ভূত হয়েছে। 'জাত' শব্দটি 'জনেতি' ক্রিয়ার অতীত কালের ক্রিয়া বাচক বিশেষণ, যার অর্থ উৎপন্ন, উদ্ভূত, প্রসূত, জন্ম ইত্যাদি।[৭] সুতরাং 'জাতক' শব্দের অর্থ যিনি উৎপন্ন বা জন্মলাভ করেছে। টি. ডব্লিউ রীচ ডেবিড্স এবং উইলিয়াম স্টিড (T.W.Rhys Davids and Willam Stede)[৮] 'জাতক' শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ করেছেন এরূপ : Jāta+ka = Jātaka, that means belonging to, connected with what has happened, a birth story as found in the earlier books; this is always the story of a previous birth of the Buddha as a wise man of old. রবার্ট সিজার চাইল্ডার্স (Rober Caesar Childers) রচিত 'Dictionary of the Pali Language'[৯] গ্রন্থ মতে জাতক শব্দের অর্থ হলো : Birth, nativity; a birth or existence in the Buddhist sense; a jātaka, or story of one of the former births of Buddha. জাতকে মূলত গৌতম বুদ্ধের পূর্ব জীবন কাহিনীই প্রকাশিত হয়েছে। অতএব, উপরে বর্ণিত বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করে বলা যায়, 'জাতক' শব্দের অর্থ 'যিনি জন্ম গ্রহণ করেছেন' এরূপ অর্থ বোঝালেও পালি সাহিত্যে একমাত্র গৌতম বুদ্ধের পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত বোঝাতেই 'জাতক' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

৪. জাতকের রচনাকাল ও রচয়িতা

জাতকের রচনাকাল ও রচয়িতা অনুল্লেখিত। তবে জাতক গ্রন্থের আভ্যন্তরীণ বিষয়বস্তু সমীক্ষাপূর্বক জাতকের রচনাকাল ও রচয়িতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিশ্লেষণ করে জাতকের রচনাকাল নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছেন। সাধারণ বৌদ্ধগণ বিশ্বাস করেন যে, জাতকগুলো গৌতম বুদ্ধের অতীত জীবনের ঘটনাবলী। এসব ঘটনা বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের বিভিন্ন উপলক্ষে ও ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বলতেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে গৌতম বুদ্ধকে জাতকের স্রষ্টা হিসেবে চিহ্নিত করা যায় এবং গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক কালেই জাতক সৃষ্টি হয়েছিল এরূপ ধারণা করা যায়। বি. সি. ল্য (B. C. Law) এর মতে, জাতকগুলো উত্তর ভারতের মজ্ঝিম বা মধ্যদেশে রচিত হয়েছিল। টি.

Dhaka University Institutional Repository

ডব্লিউ. রীস ডেবিড্স (T. W. Rhys Davids) মনে করেন, জাতকগুলো উত্তর ভারতে বা মধ্যদেশে সম্রাট অশোকের পূর্বে রচিত হয়েছিল।[১০] কিন্তু জাতকের ভাষা, গঠনশৈলী, বিষয়বস্তু প্রভৃতি বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সবগুলো জাতক গৌতম বুদ্ধ কর্তৃক সৃষ্ট বা একজন লেখক কর্তৃক এবং একই সময়ে রচিত হয়েছিল একথা স্বীকার করা যায় না। বিচার-বিশ্লেষণে দেখা যায়, জাতকের আখ্যানগুলোর মধ্যে রচনাশৈলীর পার্থক্য, পুনঃরুক্তি দোষ এবং বর্ণিত গাথাসমূহের ভাষাশৈলী, ভাব ও কবিত্বগত পার্থক্য রয়েছে। কোনো কোনো আখ্যায়িকা আবার কৃত্রিম এবং বৌদ্ধ ভাবধারা হতে বিচ্যুত বলে প্রতীয়মান হয়। এ কারণে ধারণা করা যায় যে, জাতকগুলো ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রচিত হয়েছিল। জাতকের রচয়িতা হিসেবে ভদন্ত রেবত, সংঘপাল, অত্তদর্শী, বুদ্ধমিত্র প্রমুখ কয়েকজন সিংহলী পণ্ডিতদের নামোল্লেখ পাওয়া যায়।[১১] তবে এ বিষয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে।

জাতকের মূল লক্ষ্য হচ্ছে কথাচ্ছলে সদুপদেশ দেয়া এবং নৈতিক জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করা। কথাচ্ছলে উপদেশ দেয়ার এ পদ্ধতি প্রাচীন ভারতে স্মরণাতীত কাল থেকেই প্রচলিত ছিল। প্রাচীনকালে লোকেরা সভা-সমিতিতে নানা প্রাণীর চরিত্র অবলম্বন করে রচিত বা সংকলিত কথা-কাহিনীর মাধ্যমে মনোরঞ্জন করার কথা জানা যায়। সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে এসব মনোরঞ্জক কথা সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এরূপ বহু কথা-কাহিনী যেমন রচিত হয়েছিল তেমনি বহু কথা-কাহিনী কালের গর্ভে হারিয়ে যায়। তন্মধ্যে যেগুলো সরস, সারগর্ভ ও রসযুক্ত তা স্মৃতিতে ধারণ করে মুখে মুখে প্রচারিত হতো। ক্রমে সাহিত্যে এসব কথা-কাহিনীর প্রয়োগ আরম্ভ হলে তা দীর্ঘস্থায়ী রূপ লাভ করতে থাকে। এ ভাবধারায় 'রামায়ণ', 'মহাভারত', 'পঞ্চতন্ত্র', 'হিতোপদেশ' প্রভৃতি রচিত হয়েছিল।[১২] বুদ্ধ এ পদ্ধতি অবলম্বন করে তথা জাতক ভাষণ করে তাঁর শিষ্যদের সদুপদেশ দিতেন এবং মঙ্গলময় কর্ম সম্পাদনে উদ্বুদ্ধ করতেন। পণ্ডিতদের ধারণা গৌতম বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের অব্যবহিত পরেই রাজগৃহে অনুষ্ঠিত প্রথম সংগীতিতে[১৩] বুদ্ধভাষিত এসব জাতক সংকলিত হয়েছিল। সম্রাট অশোকের সময়কালে বুদ্ধবাণী সুত্তপিটক, বিনয় পিটক এবং অভিধম্ম পিটক - এ তিনভাগে বিভক্ত করে সংকলন করা হয়েছিল। জাতক সুত্ত পিটকের সঙ্গে যুক্ত ছিল। *দীপবংস* এবং *মহাবংস* সাক্ষ্য দেয় যে, তৃতীয় সঙ্গীতির পর সম্রাট অশোকপুত্র মহিন্দ থের জাতকসহ ত্রিপিটক সিংহলে নিয়ে যান, যা খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতকে সিংহলরাজ বট্টগামণীর রাজত্বকালে তালপত্রে লিখে রাখা হয়। বর্তমানকালে যে ত্রিপিটক তথা জাতক পাওয়া যায় তা সিংহলে তালপত্রে সংরক্ষিত পুঁথি থেকে সম্পাদনা করা হয়েছিল। সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচার-প্রসারে এবং ত্রিপিটক প্রেরণে সম্রাট অশোকের অবদান সর্বজন স্বীকৃত। এ প্রসঙ্গে এম. উইন্টারনীটস্ (M.

Dhaka University Institutional Repository

Winternitz), বি.সি. ল্য (B. C. Law), উইলহেলম্ গাইগার (Wilhelm Geiger), কে. আর. নরমান (K. R. Norman), ওসকার ভন হিনোবের (Oskar von Hinuber) এবং সুমঙ্গল বড়ুয়া বলেন, তৃতীয় সঙ্গীতিতে ত্রিপিটক তিনভাগে বিভক্ত করে বিন্যস্ত করা হয়েছিল এবং এ সময় থেরবাদী ত্রিপিটক পূর্ণাঙ্গরূপ প্রাপ্ত হয়েছিল।[১৪] জাতক গ্রন্থে গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক কালের রাজাদের নামোল্লেখ পাওয়া গেলেও নন্দবংশের রাজাদের নাম ও মৌর্যবংশের রাজা অশোকের নামোল্লেখ পাওয়া যায় না। এ কারণে ধারণা করা হয় যে, বৌদ্ধ জাতকসমূহ সম্রাট অশোকের পূর্বে অর্থাৎ খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের পূর্বে রচিত বা সংকলিত হয়েছিল। এ ধারণার সত্যতা পাওয়া যায় ভরহুত ও সাঁচি স্তূপের শিল্পশৈলীতে। ভরহুত ও সাঁচি স্তূপের প্রস্তর নির্মিত দেয়াল গাত্রে কোনো কোনো জাতকের দৃশ্য ও জাতকের নাম খোদিত অবস্থায় পাওয়া যায়।[১৫] ভরহুত, সাঁচি এবং অমরাবতী স্তূপের সময়কাল খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতক। ফলে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত সময়ের পূর্বেই জাতকসমূহ রচিত বা সংকলিত হয়েছিল। আবার অনেক পণ্ডিত ধারণা করেন যে, জাতকের গ্রন্থনাকাল 'রামায়ণ', 'মহাভারত', 'পঞ্চতন্ত্র', 'হিতোপদেশ' -এর চেয়েও প্রাচীন। কেননা জাতকের রচনা পদ্ধতি ও ভাষাশৈলী 'রামায়ণ', 'মহাভারত', 'পঞ্চতন্ত্র', 'হিতোপদেশ'- এর অপেক্ষা অমার্জিত, অসংস্কৃত ও কাব্যোৎকর্ষতা বর্জিত। পক্ষান্তরে জাতকের তুলনায় এসব গ্রন্থ বর্ণনাচাতুর্যে, ভাব মাধুর্যে, চরিত্র বিশ্লেষণ ও বিষয় বিন্যাসে অদ্বিতীয়।[১৬] এ কারণেও ধারণা করা হয় জাতকের আখ্যানসমূহ এসব গ্রন্থ রচনার বহু পূর্বে রচিত হয়েছিল এবং এসব গ্রন্থে জাতক হতে ভাব গ্রহণ করা হয়েছিল। উপর্যুক্ত কারণে ঈশানচন্দ্র ঘোষ[১৭] অনুমান করেন যে, এসব গ্রন্থের পূর্বেই জাতক রচিত হয়েছিল। তিনি খ্রিষ্টের অন্তত ৩৭০ বছর পূর্বে জাতক রচিত হয়েছিল বলে মনে করেন। অতএব, উপরে বর্ণিত বিষয় পর্যালোচনা করে ধারণা করা যায়, খ্রিষ্টপূর্বে দ্বিতীয় শতক বা তৎপূর্বে অধিকাংশ জাতক রচিত হয়েছিল, তবে তৎপরবর্তীকালেও বহু জাতক রচিত হয়।

এ প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ মহাযানী গ্রন্থ সদ্ধর্মপুণ্ডরীক[১৮] এ উল্লেখ আছে যে, বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের গাথা, গল্প, পৌরাণিক কাহিনী প্রভৃতির সাহায্যে বিভিন্ন উপদেশ দিতেন। বুদ্ধ শিষ্যগণও এ পন্থা অনুসরণ করে ধর্মোপদেশ দান করতেন। যার প্রেক্ষিতে নতুন নতুন কাহিনী উদ্ভব হয়ে জাতকের কলেবর বৃদ্ধি হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। বি. সি. ল্য,[১৯] এম. উন্টারনীর্টস,[২০] ওসকার ভন হিনোবের[২১] এবং ঈশানচন্দ্র ঘোষ[২২] প্রমূখ গবেষকগণ মনে করেন, অনেক জাতক পরবর্তী কালে রচিত হয়েছিল, যা মূল জাতকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জাতকের কলেবর বৃদ্ধি করেছিল। টি. ডব্লিউ রীস ডেবিড্স[২৩] এর মতে, ষষ্ঠ খণ্ডের উপন্যাসের ন্যায় দীর্ঘ আকৃতির জাতকগুলোর ভাষা এবং সমাজ বিষয়ক তথ্যগুলো বিচার করলে মনে হয় সেসব জাতক

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তীকালে রচিত। খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতকে আচার্য বুদ্ধঘোষ জাতকট্ঠকথা নামক জাতকের অট্ঠকথা রচনা করেন। ফলে ধারণা করা যায় যে, জাতকের অট্ঠকথা রচনার পূর্বেই জাতকগুলো রচিত হয়েছিল। বুদ্ধঘোষের সময়কাল খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতক। সুতরাং বলা যায়, খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতকের পূর্বে জাতক রচনা সম্পন্ন হয়েছিল।

৫. জাতকের সংখ্যা

জাতকের সঠিক সংখ্যা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। উদীচ্য বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের 'জাতকমালা' নামক একটি সংস্কৃত গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থে ৩৪টি জাতকের সন্ধান পাওয়া যায়। কোনো কোনো গবেষক এ ৩৪টি জাতককে আদি বা মূল জাতক হিসেবে অভিহিত করেন। তবে এ উদীচ্য বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের আবার 'মহাবস্তু' নামক অপর একটি গ্রন্থে প্রায় ৮০টি জাতকের উল্লেখ দেখা যায়।[২৪] আচার্য বুদ্ধঘোষ রচিত অট্ঠকথা বা ভাষ্যগ্রন্থ *জাতকত্থবণ্ণনায়* (জাতকার্থবর্ণনা) জাতকের সংখ্যা ৫৫০টি উল্লেখ আছে।[২৫] চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন দুই বছর সিংহলে অবস্থান করেন। ফা-হিয়েনের [২৬] মতে সিংহলে ৫০০টি জাতক প্রচলিত ছিল, *চূল্লনিদ্দেস* [২৭] গ্রন্থেও জাতকের সংখ্যা ৫০০টি বলে উল্লেখ আছে। অপরদিকে লণ্ডন পালি টেক্সস্ট সোসাইটি হতে ফৌজবল (Fausboll) কর্তৃক সম্পাদিত জাতক গ্রন্থে মোট ৫৪৭টি জাতক কাহিনী আছে। ঈশানচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক অনূদিত বাংলা জাতক গ্রন্থেও ৫৪৭টি জাতক আছে। অধ্যাপক হজসন (B. H. Hodgson) তিব্বতে গল্পের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ৫৬৫টি কাহিনী যুক্ত একটি জাতক গ্রন্থ আছে বলে উল্লেখ করেছেন। কারো কারো মতে দাক্ষিণাত্য বৌদ্ধ শাস্ত্র উদীচ্য বৌদ্ধ সম্প্রদায় অপেক্ষা বহুপ্রাচীন এবং এ দাক্ষিণাত্য শাস্ত্রে ৫৫০টি জাতকের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। উপর্যুক্ত বিষয় বিশ্লেষণ করে গবেষকগণ মনে করেন নতুন নতুন কাহিনী সংযোজনের ফলে জাতক কাহিনীর সংখ্যা কালক্রমে বৃদ্ধি পায়। তাই জাতকের সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন।

মূলত জাতক নামে অভিহিত আখ্যানগুলোর কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই। কেননা ক্রমিক সংখ্যা গণনা না করে যদি জাতকের আখ্যান ভাগ ও উপাখ্যান গণনা করা হয় তা হলে পালিতে জাতকের সংখ্যা প্রচুর বলে প্রতীয়মান হয়। শুধুমাত্র উন্মার্গ জাতক বিশ্লেষণ করলে বিষয়টি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা লাভ করা যায়। কেননা এ জাতকটিতে শতাধিক উপাখ্যান রয়েছে। এ থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, জাতক সাহিত্য ক্রমিক রচনার ফসল। এ প্রসঙ্গে জাতকের বাংলা অনুবাদক ঈশানচন্দ্র ঘোষ বলেছেন, "পৃথিবীর নানাদেশীয় প্রচলিত কথাকোষের মধ্যে ইহা যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ কেবল তাহা নহে; সর্বাপেক্ষা প্রাচীনও

বটে; মূল জাতকগুলির প্রকৃত সংখ্যা কত তাহা নির্দেশ করা কঠিন।"[২৮] যাহোক, পালি ত্রিপিটক এবং অট্‌ঠকথা সর্বপ্রথম সিংহলে লিখিত আকারে সংরক্ষিত হয়েছিল। এ কারণে সিংহলী পুঁথি প্রামাণিক হিসেবে গণ্য করা হয়। বর্তমানকালে গ্রন্থাকারে ছাপানো ত্রিপিটক এবং অট্‌ঠকথা সিংহলী পুঁথি হতেই সংকলিত হয়েছিল। অট্‌ঠকথাচার্য বুদ্ধঘোষ রচিত 'জাতকাত্থবণ্ণনা' গ্রন্থটি সিংহলী তথ্যের ভিত্তিতে রচিত হয়েছিল। এ কারণে গ্রন্থটি প্রামাণিক বলে গ্রহণ করা যায়। এ গ্রন্থে প্রথম পঞ্চাশটি জাতকের শেষে 'পঠমো পঞ্ঞাসো নিট্‌ঠিতো', দ্বিতীয় পঞ্চাটি জাতকের শেষে 'মজ্ঝিম পঞ্ঞাসো নিট্‌ঠিতো' এরূপ ভাবে উপসংহার টানা হয়েছে। জাতকের সংখ্যা ৫৫০টি এরূপ বিশ্বাস না থাকলে পঞ্চাশটি করে বিভাজন করা সম্ভবপর হতো না। এ গ্রন্থে যেহেতু ৫৫০টি এবং জাতক গ্রন্থে ৫৪৭টি জাতকের উল্লেখ পাওয়া যায় সেহেতু আদর্শ বা মূল জাতকের সংখ্যা ৫৫০টি বলে গ্রহণ করা যায়। নানা কারণে তিনটি জাতক কালের গর্ভে হারিয়ে যাওয়ায় তা বর্তমান জাতক গ্রন্থে সংকলিত হয়নি। জাতক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, অনেক জাতক মাত্র কয়েক লাইনে সমাপ্ত। তাতে কেবল জাতকের নামই উল্লেখ পাওয়া যায়। ফলে সেই জাতকগুলো যে কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে সেই ধারণা সত্য বলে প্রতীয়মান হয়। তাছাড়া, বেলাম, মহাগোবিন্দ এবং সুমেধপণ্ডিত - এ তিনটি জাতক বর্তমানে পাওয়া না গেলেও এগুলোর নামোল্লেখ পাওয়া যায় এবং এগুলোর অস্তিত্ব ছিল বলে ধারণা করা হয়। কারণ প্রাচীন ব্রহ্মদেশে (বার্মা বা মিয়ানমারে) এসব জাতকের খোদিত শিল্পকর্ম বা রিলিফ পাওয়া যায়। তাছাড়া, বর্মি ঐতিহ্যও মূল বা আদর্শ জাতকের সংখ্যা ৫৫০টি বলে সাক্ষ্য দেয়।[২৯] সিংহলী ঐতিহ্য সাক্ষ্য দেয় যে, চৌদ্দশ শতকের সিংহলরাজ পরাক্রম বাহু (৪র্থ) দক্ষিণ ভারতের এক ভিক্ষুকে রাজগুরু হিসেবে মর্যাদা দান করেন। উল্লেখ আছে যে, রাজা পরাক্রম বাহু তাঁর নিকট হতে ৫৫০টি জাতক শ্রবণ করেছিলেন।[৩০] অতএব, উপরের বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, মূল বা আদর্শ জাতকের সংখ্যা ৫৫০টি। তবে জাতকগুলো কাহিনীর আদলে রচিত হওয়ায় সংখ্যার ক্ষেত্রে তারতম্য হওয়া স্বাভাবিক।

৬. জাতকের বিন্যাস শৈলী

লণ্ডনের পালি টেক্সট সোসাইটি হতে জাতকগুলো ছয়টি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে (ইনডেক্সসহ ৭ খণ্ড)। পালি টেক্সট সোসাইটি হতে প্রকাশিত জাতক গ্রন্থকে আদর্শ সংকলন হিসেবে গন্য করা হয়। জাতকের বিষয় বিন্যাস সমীক্ষার ক্ষেত্রে উক্ত প্রকাশনা সংস্থা হতে প্রকাশিত গ্রন্থকে মূলভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ছয় খণ্ডে জাতকগুলো কী নামে এবং কীভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে তা সমীক্ষার মাধ্যমে নিম্নে তুলে ধরা হলো :

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম খণ্ড

একনিপাত :

অপণ্ণকবগ্গ : ১.অপণ্ণকজাতক ২.বণ্ণুপথজাতক ৩.সেরিবানিজ জাতক ৪. চূলসেট্ঠিজাতক ৫. তণ্ডুলনালিজাতক ৬. দেবধম্মজাতক ৭. কট্ঠহারিজাতক ৮. গামনিজাতক ৯. মখাদেবজাতক ১০. সুখবিহারিজাতক

সীলবগ্গ : ১. লক্খণজাতক ২. নিগ্রোধমিগজাতক ৩. কণ্ডিনজাতক ৪. বাতমিগজাতক ৫. খরাদিযজাতক ৬. তিপল্লত্থমিগজাতক ৭. মালুতজাতক ৮. মতকভত্তজাতক ৯. অযাচিতভত্তজাতক ১০. নলপানজাতক

কুরুঙ্গবগ্গ : ১. কুরুঙ্গমিগজাতক ২. কুক্কুরজাতক ৩. ভোজাজানীযজাতক ৪. অজঞ্‌ঞজাতক ৫. তিত্থজাতক ৬. মহিলামুখজাতক ৭. অভিণ্‌হজাতক ৮. নন্দিবিসালজাতক ৯. কণ্‌হজাতক ১০. মুণিকজাতক

কুলাবকবগ্গ : ১. কুলাবকজাতক ২. নচ্চজাতক ৩. সম্মোদমানজাতক ৪. মচ্ছজাতক ৫. বট্টকজাতক ৬. সকুণজাতক ৭. তিত্তিরজাতক ৮. বকজাতক ৯. নন্দজাতক ১০. খদিরঙ্গারজাতক

অত্থকামবগ্গ : ১. লোসকজাতক ২. কপোতজাতক ৩. বেড়ুকজাতক ৪. মকসজাতক ৫. রোহিণীজাতক ৬. আরামদূসকজাতক ৭. বারুণিজাতক ৮. বেদব্‌ভজাতক ৯. নক্খত্তজাতক ১০. দুম্মেধজাতক

আসিংসবগ্গ : ১. মহাসীলবজাতক ২. চূলজনকজাতক (এ জাতকটি খুবই ছোট) ৩. পুণ্ণপাতিজাতক ৪. ফলজাতক ৫. পঞ্চাবুধজাতক ৬. কঞ্চনক্খন্ধজাতক ৭. বানরিন্দজাতক ৮. তয়োধম্মজাতক ৯. ভেরিবাদজাতক ১০. সংখধমনজাতক

ইত্থিবগ্গ : ১. অসাতমন্তজাতক ২. অণ্ডভূতজাতক ৩. তক্কজাতক ৪. দুরাজানজাতক ৫. অনভিরতিজাতক ৬. মুদুলক্খণজাতক ৭. উচ্ছঙ্গজাতক ৮. সাকেতজাতক ৯. বিসবন্তজাতক ১০. কুদ্দালজাতক

বরণবগ্গ : ১. বরণজাতক ২. সীলবনাগজাতক ৩. সচ্চংকিরজাতক ৪. রুক্খধম্মজাতক ৫. মচ্ছজাতক ৬. অসংকিয়জাতক ৭. মহাসুপিনজাতক ৮. ইল্লীসজাতক ৯. খরস্‌সরজাতক ১০. ভীমসেনজাতক

অপায়িমহাবগ্গ : ১. সুরাপানজাতক ২. মিত্তবিন্দজাতক ৩. কালকণ্ণিজাতক ৪. অত্থস্‌সদ্বারজাতক

Dhaka University Institutional Repository

৫. কিম্পক্কজাতক ৬. সীলবীমংসনজাতক ৭. মঙ্গলজাতক ৮. সারম্ভজাতক

৯. কুহকজাতক ১০. অকতঞ্ঞুজাতক

লিত্তবগ্গ : ১. লিত্তজাতক ২. মহাসারজাতক ৩. বিস্সাসভোজনজাতক ৪. লোমহংসজাতক

৫. মহাসুদনজাতক ৬. তেলপত্তজাতক ৭. নামসিদ্ধিজাতক ৮. কূটবাণিজজাতক

৯. পরোসহস্সজাতক ১০. অসাতরূপজাতক

পরোসতবগ্গ : ১. পরোসতজাতক ২. পণ্ণিকজাতক ৩. বেরিজাতক ৪. মিত্তবিন্দজাতক

৫. দুব্বলকট্ঠজাতক ৬. উদঞ্চনিজাতক ৭. সালিত্তকজাতক ৮. বাহিয়জাতক

৯. কুরুকপূবজাতক ১০. সব্বসংহারকপঞ্হ (এটি মাত্র তিন লাইনে প্রশ্নোত্তর আকারে রচিত)

হংসিবগ্গ : ১. গদ্রভপঞ্হ (এটি দুই লাইনে প্রশ্নোত্তর আকারে রচিত) ২. অমরাদেবীপঞ্হ (এটি দুই লাইনে প্রশ্নোত্তর আকারে রচিত) ৩. সিগালজাতক ৪. মিতচিন্তিজাতক

৫. অনুসাসিকজাতক ৬. দুব্বচজাতক ৭. তিত্তিরজাতক ৮. বট্টকজাতক ৯. অকালরাবিজাতক

১০. বন্ধনমোক্খজাতক

কুসনালিবগ্গ : ১. কুসনালিজাতক ২. দুম্মেধজাতক ৩. নঙ্গলীসজাতক ৪. অম্বজাতক ৫. কটাহকজাতক

৬. অসিলক্খণজাতক ৭. কলণ্ডুকজাতক ৮. বিড়ালজাতক ৯. অগ্গিকজাতক

১০. কোসিয়জাতক

অসম্পদানবগ্গ : ১. অসম্পদানজাতক ২. পঞ্চগরুজাতক ৩. ঘতাসনজাতক ৪. ঝানসোধনজাতক

৫. চন্দাভজাতক ৬. সুবণ্ণহংসজাতক ৭. বব্বুজাতক ৮. গোধজাতক

৯. উভতোভট্ঠজাতক ১০. কাকজাতক

ককন্টকবগ্গ : ১. গোধজাতক ২. সিগালজাতক ৩. বিরোচনজাতক ৪. নঙ্গুট্ঠজাতক ৫. রাধজাতক

৬. কাকজাতক ৭. পুপ্ফরত্তজাতক ৮. সিগালজাতক ৯. একপণ্ণজাতক ১০. সঞ্জীবজাতক

দ্বিতীয় খণ্ড

দুকনিপাত

দল্হবগ্গ : ১. রাজোবাদজাতক ২. সিগালজাতক ৩. সূকরজাতক ৪. উরগজাতক ৫. গগ্গজাতক

Dhaka University Institutional Repository

৬. অলীনচিত্তজাতক ৭. গুণজাতক ৮. সুহনুজাতক ৯. মোরজাতক ১০. বিনীলকজাতক

সন্থবগ্গ : ১. ইন্দসমানগোত্তজাতক ২. সন্থবজাতক ৩. সুসীমজাতক ৪. গিজ্ঝজাতক
৫. নকুলজাতক ৬. উপসাল্হজাতক ৭. সমিদ্ধিজাতক ৮. সকুণগ্ঘিজাতক
৯. অরকজাতক ১০. ককণ্ঠকজাতক (এ জাতকটি খুবই ক্ষুদ্র। মাত্র আড়াই লাইনে সমাপ্ত।)

কল্যাণধম্মবগ্গ : ১. কল্যাণধম্মজাতক ২. দদ্দরজাতক ৩. মক্কটজাতক ৪. দূভিয়মক্কটজাতক
৫. অদিচ্চুপট্ঠানজাতক ৬. কলায়মুট্ঠিজাতক ৭. তিণ্ডুকজাতক ৮. কচ্ছপজাতক
৯. সতধম্মজাতক ১০. দুদ্দদজাতক

অসদিসবগ্গ : ১. অসদিসজাতক ২. সংগামাবচরজাতক ৩. বালোদকজাতক ৪. গিরিদন্তজাতক
৫. অনভিরতিজাতক ৬. দধিবাহনজাতক ৭. চতুমট্টজাতক ৮. সীহকোট্ঠুকজাতক
৯. সীহচম্মজাতক ১০. সীলানিসংসজাতক

রুহকবগ্গ : ১. রুহকজাতক ২. সিরিকালকণ্নিজাতক (এই জাতকাট মাত্র দুই লাইন) ৩. চূল্লপদুমজাতক
৪. মণিচোরজাতক ৫. পব্বতূপত্থরজাতক ৬. বলাহস্সজাতক ৭. মিত্তামিত্তজাতক
৮. রাধজাতক ৯. গহপতিজাতক ১০. সাধুসীলজাতক

নতংধল্হবগ্গ : ১. বন্ধনাগারজাতক ২. কেলিসীলজাতক ৩. খন্ধবত্তজাতক ৪. বীরকজাতক
৫. গঙ্গেয়্যজাতক ৬. কুরুঙ্গমিগজাতক ৭. অস্সকজাতক ৮. সুংসুমারজাতক
৯. কক্করজাতক ১০. কন্দলগলকজাতক

বীরণত্থম্ভকবগ্গ : ১. সোমদত্তজাতক ২. উচ্ছিট্ঠভত্তজাতক ৩. ভরুজাতকং ৪. পুণ্ননদীজাতক
৫. কচ্ছপজাতক ৬. মচ্ছজাতক ৭. সেগ্গুজাতক ৮. কূটবাণিজজাতক
৯. গরহিতজাতক ১০. ধম্মদ্ধজজাতক

কাসাববগ্গ : ১. কাসাবজাতক ২. চূলনন্দিয়জাতক ৩. পুটভত্তজাতক ৪. কুম্ভীলজাতক (এ জাতকটিও খুব ছোট) ৫. খন্তিবণ্ননজাতক ৬. কোসিয়জাতক ৭. গূথপাণজাতক
৮. কামিনীতজাতক ৯. পলায়িজাতক ১০. দুতিয়পলায়িজাতক

উপাহনবগগ : ১. উপাহনজাতক ২. বীণাথূণজাতক ৩. বিকণ্নকজাতক ৪. অসিতাভূজাতক
৫. বচ্ছনখজাতক ৬. বকজাতক ৭. সাকেতজাতক ৮. একপদজাতক ৯. হরিতমাতজাতক
১০. মহাপিঙ্গলজাতক

Dhaka University Institutional Repository

সিগালবগ্গ : ১. সব্বদাঠজাতক ২. সুনখজাতক ৩. গুত্তিলজাতক ৪. বীতচ্ছজাতক ৫. মূলপরিয়ায়জাতক
৬. তেলোবাদজাতক ৭. পদঞ্জলিজাতক ৮. কিংসুকোপমজাতক ৯. সালকজাতক
১০. কপিজাতক

তিকনিপাত

সংকপ্পবগ্গ : ১. সংকপ্পজাতক ২. তিলমুট্ঠিজাতক ৩. মণিকণ্ঠজাতক
৪. কুণ্ডককুচ্ছিসিন্ধবজাতক ৫. সুকজাতক ৬. জরুদপাণজাতক
৭. গামণিচণ্ডজাতক ৮. মন্ধাতুজাতক ৯. তিরীটবচ্ছজাতক ১০. দূতজাতক

কোসিবগ্গ : ১. পদুমজাতক ২. মুদুপাণিজাতক ৩. চূল্লপলোভনজাতক ৪. মহাপনাদজাতক
৫. খুরপ্পজাতক ৬. বাতগ্গসিন্ধবজাতক ৭. কক্কটজাতক ৮. আরামদূসজাতক
৯. সুজাতজাতক ১০. উলূকজাতক

অরঞ্ঞবগ্গ : ১. উদপানদূসকজাতক ২. ব্যগ্ঘজাতক ৩. কচ্ছপজাতক ৪. লোলজাতক
৫. রুচিরজাতক ৬. কুরুধম্মজাতক ৭. রোমকজাতক ৮. মহিসজাতক
৯. সতপত্তজাতক ১০. পুটদূসকজাতক

অব্ভন্তরবগ্গ : ১. অব্ভন্তরজাতক ২. সেয়্যজাতক ৩. বড্ঢকিসূকরজাতক ৪. সিরিজাতক
৫. মণিসূকরজাতক ৬. সালূকজাতক ৭. লাভগরহজাতক ৮. মচ্ছুদ্দানজাতক
৯. নানচ্ছন্দজাতক ১০. সীলবীমংসজাতক

কুম্ভবগ্গ : ১. ভদ্রঘটজাতক ২. সুপত্তজাতক ৩. কায়বিচ্ছিন্দজাতক ৪. জম্বুখাদক জাতক ৫. অন্তজাতক
৬. সমুদ্দজাতক ৭. কামবিলাপজাতক ৮. উদুম্বরজাতক ৯. কোমায়পুত্তজাতক ১০. বকজাতক

তৃতীয় খণ্ড

চতুক্কনিপাত

বিবরবগ্গ : ১. চূল্লকালিঙ্গজাতক ২. মহাস্সারোহজাতক ৩. একরাজজাতক ৪. দদ্দরজাতক
৫. সীলবীসনজাতক ৬. সুজাতজাতক ৭. পলাসজাতক ৮. জবসকুণজাতক ৯. ছবকজাতক
১০. সয্হজাতক

পুচিমন্দবগ্গ : ১. পুচিমন্দজাতক ২. কস্সপমন্দিয়জাতক ৩. খন্তিবাদিজাতক ৪. লোহকুম্ভিজাতক
৫. মংসকজাতক ৬. সসজাতক ৭. মতরোদনজাতক ৮. কণবেরজাতক ৯. তিত্তিরজাতক
১০. সুচ্চজজাতক

Dhaka University Institutional Repository

কুটিদূসকবগ্গ : ১. কুটিদূসকজাতক ২. দদ্দভজাতক ৩. ব্রহ্মদত্তজাতক ৪. চম্মসাটকজাতক
৫. গোধজাতক ৬. কক্করুজাতক ৭. কাকাতিজাতক ৮. অননুসোচিয়জাতক
৯. কালবাহুজাতক ১০. সীলবীমংসজাতক

কোকিলবগ্গ : ১. কোকালিকজাতক ২. রথলট্‌ঠিজাতক ৩. গোধজাতক ৪. রাজোবাদজাতক
৫. জম্বুকজাতক ৬. ব্রহাছত্তজাতক ৭. পীঠজাতক ৮. থুসজাতক
৯. বাবেরুজাতক ১০. বিসয্হজাতক

চূল্লকুণালবগ্গ : ১. কণ্ডরিজাতক ২. বানরজাতক ৩. কুন্তনিজাতক ৪. অম্বচোরজাতক
৫. গজকুম্ভজাতক ৬. কেসবজাতক ৭. অয়কূটজাতক ৮. অরঞ্‌ঞজাতক
৯. সন্ধিভেদজাতক ১০. দেবতাপঞ্‌হজাতক (এটি মাত্র তিন লাইনের জাতক, প্রশ্নোত্তর আকারে রচিত)

পঞ্চনিপাত

মণিকুণ্ডলবগ্গ : ১. মণিকুণ্ডলজাতক ২. সুজাতজাতক ৩. ধোনসাখজাতক ৪. উরগজাতক
৫. ঘটজাতক ৬. কারণ্ডিয়জাতক ৭. লটুকিকজাতক ৮. চূল্লধম্মপালজাতক
৯. সুবণ্ণমিগজাতক ১০. সুস্‌সোন্দিজাতক

বণ্ণারোহবগ্গ : ১. বণ্ণারোহজাতক ২. সীলবীমংসজাতক ৩. হিরিজাতক ৪. খজ্জোপনকজাতক
(এটি খুবই ছোট জাতক, মাত্র দু'ই প্রশ্নোত্তর আকারে লাইানে রচিত)
৫. অহিগুণ্ডিকজাতক ৬. গুম্বিয়জাতক ৭. সালিয়জাতক ৮. তচসারজাতক
৯. মিত্তবিন্দজাতক ১০. পলাসজাতক

অড্‌ঢবগ্গ : ১. দীঘিতিকোসলজাতক ২. মিগপোতকজাতক ৩. মূসিকজাতক ৪. চূল্লধনুগ্গহজাতক
৫. কপোতজাতক

ছনিপাত

অবারিয়বগ্গ : ১. অবারিয়জাতক ২. সেতকেতুজাতক ৩. দরীমুখজাতক ৪. নেরুজাতক ৫. আসংকজাতক
৬. মিগালোপজাতক ৭. সিরিকালকণ্নিজাতক ৮. কুক্কুটজাতক ৯. ধম্মদ্ধজাতক
১০. নন্দিংমিগজাতক

Dhaka University Institutional Repository

সেনকবগ্গ : ১. খরপুত্তজাতক ২. সূচিজাতক ৩. তুণ্ডিলজাতক ৪. সুবণ্ণকক্কটকজাতক

৫. ময্হকজাতক ৬. ধজবিহেঠজাতক ৭. ভিসপুপ্ফজাতক ৮. বিঘাসজাতক

৯. বট্টকজাতক ১০. কাকজাতক

সত্তনিপাত

কুক্কুবগ্গ : ১. কুক্কুজাতক ২. মনোজজাতক ৩. সুতনোজাতক ৪. গিজ্ঝজাতক

৫. দব্ভপুপ্ফজাতক ৬. দসণ্ণকজাতক ৭. সত্তুভস্তজাতক ৮. অট্ঠিসেনজাতক

৯. কপিজাতক ১০. বকব্রহ্মজাতক

গন্ধারবগ্গ : ১. গন্ধারজাতক ২. মহাকপিজাতক ৩. কুম্ভকারজাতক ৪. দল্হধম্মজাতক

৫. সোমদত্তজাতক ৬. সুসীমজাতক ৭. কোটিসিম্বলিজাতক ৮. ধূমকারিজাতক

৯. জাগরজাতক ১০. কুম্মাসপিণ্ডজাতক ১১. পরন্তপজাতক

অট্ঠনিপাত

কচ্চানিবগ্গ : ১. কচ্চানিজাতক ২. অট্ঠসদ্দজাতক ৩. সুলসাজাতক ৪. সুমঙ্গলজাতক

৫. গঙ্গমালজাতক ৬. চেতিয়জাতক ৭. ইন্দ্রিয়জাতক ৮. আদিত্তজাতক

৯. অট্ঠানজাতক ১০. দীপিজাতক

নবনিপাত : এ নিপাতে বর্গের নামোল্লেখ নেই। এ নিপাতের অন্তর্ভুক্ত জাতকগুলো হলো :

১. গিজ্ঝজাতক ২. কোসাম্বীজাতক ৩. মহাসুকজাতক ৪. চূল্লসুকজাতক

৫. হারিতজাতক ৬. পদকুসলমাণবকজাতক ৭. লোমসকস্সপজাতক ৮. চক্কবাকজাতক

৯. হলিদ্দিরগজাতক ১০. সমুগ্গজাতক ১১. পূতিমংসজাতক ১২. তিত্তিরজাতক

চতুর্থ খণ্ড

দসনিপাত : এ নিপাতেও বর্গের নামোল্লেখ নেই। এ নিপাতের অন্তর্ভুক্ত জাতকগুলো হলো :

১. চতুদ্বারজাতক ২. কণ্হজাতক ৩. চতুপোসথিকজাতক (এ জাতকটি খুবই ক্ষুদ্র। মাত্র দুই লাইনে সমাপ্ত) ৪. সংখজাতক ৫. চূল্লবোধিজাতক ৬. কণ্হদীপাযনজাতক

৭. নিগ্রোধজাতক ৮. তক্কলজাতক ৯. মহাধম্মপালজাতক ১০. কুক্কটজাতক

১১. মট্টকুণ্ডলিজাতক ১২. বিলারিকোসিযজাতক ১৩. চক্কবাকজাতক

১৪. ভূরিপঞ্হাজাতক (এই জাতকটিও মাত্র দুই লাইনে সমাপ্ত) ১৫. মহামঙ্গলজাতক

১৬. ঘটজাতক

Dhaka University Institutional Repository

একাদসনিপাত : এ নিপাতেও বর্গের নামোল্লেখ নেই। এ নিপাতের অন্তর্ভুক্ত জাতকগুলো হলো : ১. মাতিপোসকজাতক ২. জুণ্হজাতক ৩. ধম্মজাতক ৪. উদযজাতক ৫. পানিযজাতক ৬. যুবঞ্জযজাতক ৭. দসরথজাতক ৮. সংবরজাতক ৯. সুপ্পারকজাতক

দ্বাদসনিপাত : ১. চূল্লকুণালজাতক (এই জাতকটিও মাত্র দুই লাইনে সমাপ্ত) ২. ভদ্দসালজাতক ৩. সমুদ্দবাণিজজাতক ৪. কামজাতক ৫. জনসন্ধজাতক ৬. মহাকণ্হজাতক ৭. কোসিযজাতক (এ জাতকের একটি মাত্র লাইন পাওয়া যায়) ৮. মেণ্ডকজাতক (এ জাতকেরও একটি মাত্র লাইন পাওয়া যায়) ৯. মহাপদুপমজাতক ১০. মিত্তামিত্তজাতক

তেরসনিপাত : এ নিপাতেও বর্গের নামোল্লেখ নেই। এ নিপাতের অন্তর্ভুক্ত জাতকগুলো হলো : ১. অম্বজাতক ২. ফন্দনজাতক ৩. যবনহংসজাতক ৪. চূল্লনারদজাতক ৫. দূতজাতক ৬. কালিনাগবোধিজাতক ৭. অকিত্তিজাতক ৮. তক্কারিযজাতক ৯. রুরুজাতক ১০. সরভমিগজাতক

পকিণ্ণকনিপাত : এ নিপাতেও বর্গের নামোল্লেখ নেই। এ নিপাতের অন্তর্ভুক্ত জাতকগুলো হলো : ১. সালিকেদারজাতক ২. চন্দকিন্নরজাতক ৩. মহাউক্কুসজাতক ৪. উদ্দালকজাতক ৫. ভিসজাতক ৬. সুরুচিজাতক ৭. পঞ্চূপোসথজাতক ৮. মহামোরজাতক ৯. তচ্ছসূকরজাতক ১০. মহাবাণিজজাতক ১১. সাধীনজাতক ১২. দসব্রাহ্মণজাতক ১৩. ভিক্খাপরম্পরজাতক

বীসতিনিপাত : এই নিপাতেও বর্গের নামোল্লেখ নেই। এ নিপাতের অর্ন্তভুক্ত জাতকগুলো হলো : ১. মাতঙ্গজাতক ২. চিত্ত-সম্ভূত-জাতক ৩. সিবিজাতক ৪. সিরিমণ্ডজাতক (এই জাতকটিও মাত্র এক লাই সমাপ্ত) ৫. রোহন্তমিগজাতক ৬. হংসজাতক ৭. সত্তিগুম্বজাতক ৮. ভল্লাটিযজাতক ৯. সোমনস্সজাতক ১০. চম্পেয্যজাতক ১১. মহাপলোভনজাতক ১২. পঞ্চপণ্ডিতজাতক (এ জাতকেরও একটি মাত্র লাইন পাওয়া যায়) ১৩. হত্থিপালজাতক ১৪. অযোঘরজাতক

পঞ্চম খণ্ড

তিংসনিপাত : এ নিপাতেও বর্গের নামোল্লেখ নেই। এ নিপাতের অন্তর্ভুক্ত জাতকগুলো হলো : ১.কিংছন্দজাতক ২. কুম্ভজাতক ৩. জযদ্দিসজাতক ৪. ছদ্দন্তজাতক ৫. সম্ভবজাতক

Dhaka University Institutional Repository

৬. মহাকপিজাতক ৭. দকরক্খসজাতক (এই জাতকটি মাত্র দ'ুটি লাইনে সমাপ্ত)

৮. পণ্ডরজাতক ৯. সম্ভুলজাতক ১০. গণ্ডতিন্দুজাতক

চত্তালিসনিপাত : এ নিপাতেও বর্গের নামোল্লেখ নেই। এ নিপাতের অন্তর্ভুক্ত জাতকগুলো হলো :

১. তেসকুণজাতক ২. সরভঙ্গজাতক ৩. অলম্বুসজাতক ৪. সংখপালজাতক

৫. চূল্লসুতসোমজাতক

পণ্নাসনিপাত : এ নিপাতেও বর্গের নামোল্লেখ নেই। এ নিপাতের অন্তর্ভুক্ত জাতকগুলো হলো :

১. নলিনিকাজাতক ২. উম্মদন্তিজাতক ৩. মহাবোধিজাতক

ছট্ঠিনিপাত : এ নিপাতেও বর্গের নামোল্লেখ নেই। এ নিপাতের অন্তর্ভুক্ত জাতকগুলো হলো :

১. সোনকজাতক ২. সংকিচ্চজাতক

সত্তনিপাত : এ নিপাতেও বর্গের নামোল্লেখ নেই। এ নিপাতের অন্তর্ভুক্ত জাতকগুলো হলো :

১. কুসজাতক ২. সোন-নন্দ-জাতক

অসীতিনিপাত : এ নিপাতেও বর্গের নামোল্লেখ নেই। এ নিপাতের অন্তর্ভুক্ত জাতকগুলো হলো :

১. চূল্লহংসজাতক ২. মহাহংসজাতক ৩. সুদ্ধাভোজনজাতক ৪. কুণালজাতক

৫. মহাসুতসোমজাতক

ষষ্ঠ খণ্ড

মহানিপাত : এ নিপাতেও বর্গের নামোল্লেখ নেই। এ নিপাতের অন্তর্ভুক্ত জাতকগুলো হলো :

১. মূগপক্খজাতক ২. মহাজনকজাতক ৩. সামজাতক ৪. নিমিজাতক

৫. খণ্ডহালজাতক ৬. ভূরিদত্তজাতক ৭. মহানারদকস্‌সপজাতক ৮. বিধুরপণ্ডিতজাতক

৯. মহাউম্মগ্গজাতক ১০. বেস্‌সন্তরজাতক

৭. জাতকের বিন্যাসশৈলী পর্যালোচনা

জাতকের বিন্যাসশৈলী সমীক্ষায় দেখা যায়, সূচনায় *বুদ্ধবংস* গ্রন্থ হতে গাথা সংগ্রহ করে গদ্যে ও পদ্যে বুদ্ধের জীবনী বর্ণনা করা হয়েছে, যা নিদানকথা নামে অভিহিত। নিদানকথা অংশটি তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত। যথা : দূরেনিদান, অবিদূরেনিদান এবং সন্তিকেনিদান। দূরেনিদানে দীপঙ্কর বুদ্ধ থেকে অতীত বুদ্ধের জীবন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। দীপঙ্কর বুদ্ধের সময়কালে সিদ্ধার্থ গৌতম সুমেধ তাপসরূপে পারমীপূর্ণ করেন। তখন দীপঙ্কর বুদ্ধ ভবিষ্যতবাণী করেন, সুমেধ তাপস বুদ্ধ হয়ে জগতের সত্ত্বগণকে

Dhaka University Institutional Repository

দুঃখমুক্তির পথ প্রদর্শন করবেন। অবিদূরেনিদানে তাবতিংস হতে বুদ্ধত্ব লাভ পর্যন্ত গৌতম বুদ্ধের সংক্ষিপ্ত জীবনী বর্ণিত আছে। সন্তিকেনিদানে বুদ্ধত্বলাভের পর থেকে মহাপরিনির্বাণ পর্যন্ত গৌতমবুদ্ধের জীবনকাহিনী বর্ণনা করা হয়। নিদানকথার পর জাতক কাহিনী আরম্ভ হয়।

সমীক্ষায় দেখা যায়, জাতকগুলো নিপাত ও বর্গে বিভক্ত করে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথমখণ্ডে 'একনিপাত' নামক একটি মাত্র নিপাত আছে। একনিপাতে ১৫টি বর্গে ১৫০টি জাতক বিন্যস্ত আছে। তৎপর দ্বিতীয় খণ্ডে দু'টি নিপাত আছে। যথা : দ্বি-নিপাত ও ত্রি-নিপাত। দ্বি-নিপাতে ১০টি বর্গে ১০০টি জাতক এবং ত্রি-নিপাতে ৫টি বর্গে ৫০টি জাতক আছে। তৃতীয় খণ্ডে ৬টি নিপাত আছে। তৃতীয় খণ্ডের চতুর্নিপাতে ৫টি বর্গে ৫০টি জাতক, পঞ্চনিপাতে তিনটি বর্গে ২৫টি জাতক, ষন্নি বা ষষ্ঠনিপাতে ২টি বর্গে ২০টি জাতক, সপ্তনিপাতে ২টি বর্গে ২১টি জাতক, অষ্টনিপাতে ১টি বর্গে ১০টি জাতক, নবনিপাতে ১২টি জাতক আছে। চতুর্থ খণ্ডে ৫টি নিপাত আছে। চতুর্থ খণ্ডের দশনিপাতে ১৬টি জাতক, একাদশনিপাতে ৯টি জাতক, দ্বাদশনিপাতে ১০টি জাতক, ত্রয়োদশনিপাতে ১০টি জাতক, প্রকীর্ণক-নিপাতে ১৩টি জাতক এবং বিংশতি-নিপাতে ১৪টি জাতক আছে। পঞ্চম খণ্ডে ৫টি নিপাত আছে। তবে তাতে নিপাতের ক্রমধারা রক্ষিত হয়নি এবং একবিংশতি (২১তম) নিপাত হতে ঊনত্রিশতম নিপাতের উল্লেখ নেই। পঞ্চমখণ্ড আরম্ভ হয় ত্রিংশতিনিপাত হতে। পঞ্চম খণ্ডের ত্রিংশতিনিপাতে ১০টি জাতক, চত্বারিংশন্নিপাত (৪০তম নিপাতে) নিপাতে ৫টি জাতক, পঞ্চাশণ্নিপাত (৫০তম নিপাত) ৩টি জাতক, ষষ্ঠিনিপাতে (৬০তম নিপাত) ২টি জাতক, সপ্ততি-নিপাতে (৭০তম নিপাত) ২টি জাতক এবং অশীতি-নিপাতে (৮০তম নিপাতে) ৫টি জাতক রয়েছে। ষষ্ঠ খণ্ডে মহানিপাত নামে একটি মাত্র নিপাত আছে, তাতে ১০টি জাতক আছে। ৬টি খণ্ডে মোট ৫৪৭টি জাতক সন্নিবেশিত আছে।

নিপাত সমীক্ষায় দেখা যায়, একনিপাত থেকে তেরশনিপাত পর্যন্ত ক্রমধারা অক্ষুণ্ন রাখা হয়। তৎপর প্রকীর্ণকনিপাত, বিংশতিনিপাত, ত্রিংশতিনিপাত, চত্তারিংশন্নিপাত, পঞ্চাশণ্নিপাত, ষষ্ঠিনিপাত, সপ্ততিনিপাত, অশীতিনিপাত, মহানিপাত প্রভৃতি নিপাত যুক্ত করা হয়। তেরশ নিপাতে সঙ্গে পরবর্তী নিপাতগুলো যোগ করলে মোট নিপাতের সংখ্যা দাঁড়ায় ২২টি। নিপাতের বিভাজনে তেরশনিপাতের পর ক্রমধারা অসংলগ্ন হওয়ায় নিপাতের সংখ্যা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক লক্ষ্য করা যায়। ওসকর ভন হিনোবের (Oskar van Hinuber)[৩১] এর মতে, জাতকের কাহিনীগুলো আনুমানিক ২৫০০ গাথার সমন্বয়ে তেরটি নিপাতে বিভক্ত। তৎপর প্রকীর্ণক নিপাত (পকিণ্নকনিপাত) এবং মহানিপাত যুক্ত করা হয়। রবীন্দ্র

Dhaka University Institutional Repository

বিজয় বড়ুয়া, সুকোমল বড়ুয়া এবং সুমন কান্তি বড়ুয়ার[৩২] মতে, জাতকগুলো গাথার সংখ্যানুসারে ২২ টি নিপাতে বিভক্ত। প্রথম নিপাতে একটি করে গাথা, দ্বিতীয় নিপাতে দুইটি করে গাথা, এভাবে ২২তম নিপাতে ২২টি করে গাথার সমন্বয়ে জাতক গ্রন্থ সমাপ্ত। মূলত নিপাতের অসংলগ্ন বিভাজনের কারণে পণ্ডিতদের মধ্যে জাতকের নিপাতের সংখ্যা বিষয়ে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। জাতকের সংখ্যা ও আকারের দিক থেকেও নিপাতগুলোতে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

প্রত্যেকটি নিপাত কয়েকটি বর্গে বিভক্ত এবং প্রত্যেকটি বর্গে গড়ে দশটি জাতক রয়েছে। অধিকাংশ নিপাতে বর্গের নামোল্লেখ থাকলেও কিছু কিছু নিপাতে বর্গের নামোল্লেখ নেই। নবনিপাত, দশনিপাত, একাদশনিপাত, দ্বাদশনিপাত, তেরশনিপাত, প্রকীর্ণকনিপাত, ত্রিংশতিনিপাত, চত্বারিংশন্নিপাত, পঞ্চাশন্নিপাত, ষষ্ঠিনিপাত এবং অশীতিনিপাত প্রভৃতিতে বর্গের নামোল্লেখ নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বর্গগুলো প্রারম্ভিক জাতকের নামানুসারে নামকরণকৃত। যেমন, একনিপাতের প্রথম জাতকের নাম অপণ্নকজাতক। তাই এ বর্গের নামকরণ করা হয়েছে অপণ্নকবগ্গ। অনুরূপভাবে একনিপাতের কুরঙ্গবর্গের প্রথম জাতক হচ্ছে কুরঙ্গমিগজাতক। এ জাতকের নামানুসারে এ বর্গের নামকরণ করা হয় কুরঙ্গবর্গ। তবে ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করা যায়। যেমন, একনিপাতের সীলবগ্গ, অত্থকামবগ্গ, আসিংসবগ্গ, ইত্থিবগ্গ, অপায়িবগ্গ, হংসিবগ্গ, ককন্টকবগ্গ; দুকনিপাতের দল্হবগ্গ, সন্থবগ্গ, নতংধল্হবগ্গ, বীরণত্থম্ভকবগ্গ, সিগালবগ্গ; তিকনিপাতের কোসিবগ্গ, অরঞ্ঞবগ্গ, কুম্ভবগ্গ; চতুক্কনিপাতের বিবরবগ্গ, চূল্লকুণালবগ্গ; পঞ্চনিপাতের অড্ঢবগ্গ প্রভৃতি বর্গ প্রথম জাতকের নামানুসারে নামকরণকৃত হয়নি।

জাতকগুলো গদ্যে ও পদ্যে রচিত। পণ্ডিতদের মতে পদ্যাংশটি (গাথা) অপেক্ষাকৃত পুরানো এবং এটি জাতকের প্রাণস্বরূপ।[৩৩] তবে এই অংশটি বেশী প্রাচীন হওয়ায় ক্ষেত্রবিশেষে দুর্বোধ্যও বটে। কোনো কোনো জাতকের গাথায় এবং তৎসংলগ্ন গদ্যাংশে ভাষার ও ভাবের মধ্যে কোনো রকম প্রভেদ দেখা যায় না। আমরা খুদ্দক নিকায়ে গাথাসহ 'জাতক' নামে যে গদ্য কাহিনীর সংগ্রহ পাই তা পরবর্তীকালের সংকলন বলে অনেক পণ্ডিত মনে করেন।[৩৪] মূল জাতক কেবল গাথায় রচিত ছিল। বর্তমানে গাথার সংখ্যানুসারে জাতকগুলো ২২টি নিপাতে বিভক্ত। প্রথম নিপাতে একটি করে গাথা, দ্বিতীয় নিপাতে দুইটি করে গাথা, এভাবে ২২তম নিপাতে ২২টি করে গাথার সমন্বয়ে জাতক গ্রন্থ সমাপ্ত হয়।

জাতকের বিষয়বস্তু এবং নামকরণের মধ্যে সুশৃঙ্খলতার অভাব রয়েছে। যেমন, একই জাতক ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে, কোথাও ভিন্ন ভিন্ন নামে, কোথাও বা একই নামে পুনরুক্ত হয়েছে। কাহিনী ভিন্ন হলেও একই নামে

Dhaka University Institutional Repository

বেশ কিছু জাতক রয়েছে। যেমন : বকজাতক নামে দুটি জাতক, কুরঙ্গমিগজাতক নামে দুটি জাতক, মিত্তবিন্দজাতক নামে দুটি জাতক, তিত্তিরজাতক নামে তিনটি জাতক, বট্টকজাতক নামে দুটি জাতক, গোধজাতক নামে দুটি জাতক, সিগাল জাতক নামে দুটি জাতক পাওয়া। আবার নাম ভিন্ন হলেও অনেক জাতকের উপখ্যানাংশ এক, কেবল গাথার সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যেমন : প্রথম খণ্ডের মুণিকজাতক এবং দ্বিতীয় খণ্ডের শালুকজাতক, প্রথম খণ্ডের মৎস্যজাতক এবং দ্বিতীয় খণ্ডের মৎস্যজাতক, প্রথম খণ্ডের বানরেন্দ্রজাতক এবং দ্বিতীয় খণ্ডের কুম্ভীরজাতক প্রভৃতির উপাখ্যানাংশ এক। একই খণ্ডে একই জাতকের পুনরুক্তিও লক্ষ্য করা যায়। যেমন, প্রথম খণ্ডের ভোজাজানীয়জাতক এবং অজঞ্ঞঞ্ঞজাতকের আখ্যায়িকা একই। এছাড়া, কিছু জাতক খুবই সংক্ষিপ্ত। মাত্র দুয়েকটি লাইনে সমাপ্ত। এতে কেবল জাতকের নামোল্লেখ পাওয়া গেলেও বিষয়বস্তুর ধারণা লাভ করা যায় না। এরূপ জাতকের মধ্যে কুণ্ডকজাতক, চতুপোসথিকজাতক, ভূরিপঞ্ঞহাজাতক, মেণ্ডকজাতক উল্লেখযোগ্য। এতে বোঝা যায়, জাতকগুলো কোনো একটি নিকায় বা ব্যক্তি বিশেষের রচনা নয়। পরবর্তীকালে অনেক লোককাহিনীকে জাতকে রূপান্তরিত করে জাতক গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এ বিষয়ে জাতকের বাংলা অনুবাদক ঈশানচন্দ্র ঘোষের অভিমত প্রণিধানযোগ্য :

"যিনি যখন সুবিধা পাইয়াছেন, তিনি তখন প্রচলিত কোন আখ্যানকে বৌদ্ধবেশে সজ্জিত করিয়া এবং বোধিসত্ত্বকে তাহার নায়কের স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া জাতক নামে চালাইয়া গিয়াছেন।"[৩৫]

৮. জাতকের গঠনশৈলী

জাতকের একটি নির্দিষ্ট গঠনশৈলী রয়েছে। প্রতিটি জাতক প্রধানত প্রত্যুৎপন্ন বস্তু বা বর্তমান কথা, অতীত বস্তু, সমাধান বা সমবধান - এ তিনটি অংশে বিভক্ত। কিন্তু বর্তমানকালের গবেষক, বিশেষত উইলিয়াম গাইগার, এম. উইন্টারনীট্স, জি. পি. মালালাসেকেরা, ওসকার ভন হিনোবার, কে. আর. নরমান, কানাই লাল হাজরা প্রমুখ গবেষকগণ আরো দু'টি অংশ যুক্ত করে জাতককে মোট পাঁচটি অংশ বিভক্ত করেছেন।[৩৬] অপর দুটি অংশ বা বিভাগ হলো - গাথা ও বেয়্যাকরণ। নিম্নে জাতকের পাঁচটি অংশের ধারণা প্রদান করা হলো :

ক) প্রত্যুৎপন্ন বস্তু : জাতকের প্রথম অংশের নাম প্রত্যুৎপন্ন বস্তু (পচ্চুপন্নবত্থু) বা বর্তমান কথা। এ অংশে গৌতম বুদ্ধ কখন, কার উদ্দেশ্যে এবং কি উপলক্ষে জাতকটি ভাষণ করেছিলেন তার বর্ণনা আছে। এই অংশটিকে জাতকের উপক্রমণিকা বা ভূমিকাও বলা হয়। এ অংশে গৌতমবুদ্ধের সমকালীন ঘটনা বা বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। ফলে এ অংশ প্রাচীন ভারতীয়

উপমহাদেশের সমাজ-সংস্কৃতি, ধর্ম-দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ধারণ করে আছে। তাই প্রাচীন ভারতের ইতিহাস জানার জন্য এ অংশটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

খ) **অতীত বত্থু :** জাতকের দ্বিতীয় অংশ হলো অতীত বত্থু (অতীতবত্থু) বা অতীত কাহিনী। এই অংশে গৌতম বুদ্ধের অতীত জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। এটিই হল প্রকৃত জাতক বা মূল কাহিনী। তথাগত বুদ্ধ অতীত জীবনের কাহিনীগুলো তাঁর শিষ্যদের নিকট ধর্মোপদেশ দেয়ার ছলে বলতেন।

গ) **গাথা :** জাতকের তৃতীয় অংশ হচ্ছে গাথা বা অভিসম্বুদ্ধ গাথা। প্রতিটি জাতক গদ্য ও পদ্যের সংমিশ্রণে রচিত। বিশেষত অতীতবত্থুর বিষয়বস্তু পদ্যে ব্যক্ত করা হয়েছে। এ পদ্যাংশটিকে গাথা বলা হয়।[৩৭] গাথাকে জাতক কাহিনীর মর্মবীজ এবং প্রাচীনতম উপকরণ হিসেবে গণ্য করা হয়। এ অংশটি বেশী প্রাচীন হওয়ায় এর অংশবিশেষ দুর্বোধ্য। তাই জাতকে গাথার ব্যাখ্যাও লক্ষ্য করা যায়। প্রতিটি জাতকে এক বা একাধিক গাথা থাকে।

ঘ) **বেয়্যাকরণ :** জাতকের চতুর্থ অংশ হচ্ছে বেয়্যাকরণ। এ অংশে গাথার প্রতিটি শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। একে বেয়্যাকরণ বলা হয়। গাথা এবং ব্যাকরণের উপর ভিত্তি করেই পরবর্তীতে জাতকের ভাষ্য রচিত হয়েছিল।

ঙ) **সমবধান বা সমাধান :** জাতকের পঞ্চম বা শেষ অংশের নাম সমবধান বা সমাধান। এ অংশে অতীতবত্থুতে বর্ণিত পাত্র-পাত্রীর সঙ্গে প্রত্যুৎপন্নবত্থুতে বর্ণিত পাত্র-পাত্রীর অভেদ প্রদর্শন বা উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে। অর্থাৎ অতীত কাহিনীতে বর্ণিত চরিত্রগুলোর সঙ্গে বর্তমান কাহিনীতে বর্ণিত চরিত্রগুলোর মধ্যে অভিন্নতা প্রদর্শন বা সম্পর্ক স্থাপনই এ অংশের প্রদান উদ্দেশ্য।

৯. জাতকের প্রারম্ভ বা সূচনা

জাতক পাঠে পরিলক্ষিত হয় যে, অধিকাংশ জাতকের প্রারম্ভেই 'অতীতে বারাণসিযং ব্রহ্মদত্তে রজ্জং কারেন্তে' এরূপ বাক্যের মাধ্যমে জাতকের সূচনা করা হয়েছে। জাতকত্থবণ্ণানায় (জাতকার্থবর্ণনা) ৫৪৭টি জাতকের মধ্যে ৩৭২টি জাতকে বারাণসী রাজ ব্রহ্মদত্তের কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু এ 'বারাণসী রাজ ব্রহ্মদত্ত' কে তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে এবং এ বিষয়ে বহু প্রকার অলোচনা হয়েছে। এ

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গে পণ্ডিত ঈশানচন্দ্র ঘোষের অভিমত হলো, "পাশ্চাত্য কথাকারেরা যেমন-'একদা' (Once Upon a time) দ্বারা মামুলিভাবে গল্প আরম্ভ করেন, জাতক রচয়িতারাও 'বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে' এরূপ বাক্যাংশ দ্বারাই জাতকের ভণিতা করতেন।"[৩৮] সুতরাং ধারণা করা যায়, এটা গল্প আরম্ভ করার একটা পদ্ধতি মাত্র। আবার রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া'র মতে, "বস্তুত 'ব্রহ্মদত্ত' কাহারও নাম নহে। ইহা একটি রাজবংশের উপাধি। এই বংশে যত রাজা জন্মেছিলেন তাদের প্রত্যেকেরই উপাধি ছিল ব্রহ্মদত্ত এবং রাজধানী ছিল বারাণসীতে। বর্তমানে ইংল্যান্ডের রাজার যেমন 'জর্জ', 'এডওয়ার্ড' প্রভৃতি এবং জাপানের 'সিকাডো,' রাশিয়ার 'জার' সেরূপ 'ব্রহ্মদত্ত'ও একটি উপাধি বিশেষ।"[৩৯] এ সিদ্ধান্তের সঙ্গে পালি সাহিত্য বিশ্লেষক এম. উইন্টারনীট্স এর অভিমতের মিল পাওয়া যায়।[৪০] তবে ঈশানচন্দ্র ঘোষের অভিমত অধিক গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। কারণ সুদূর অতীতে গল্পবলার এরূপ রীতি প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যে প্রচলিত ছিল। তাছাড়া 'ব্রহ্মদত্ত' উপাধিধারী ভারতীয় রাজবংশের ইতিহাস তেমন একটা পাওয়া যায় না।

১০. জাতকের উদ্দেশ্য

জাতকগুলোর বলার কারণ পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, জাতকসমূহ বিশেষ উদ্দেশ্যে ভাষিত হয়েছিল। কখনো ঝগড়া বিবাদ দমনের জন্য, কখনো রাগ-দ্বেষ-মোহের অপকারিতা বর্ণনা এবং তা ক্ষয় করার জন্য, কখনো শীলাদি পালনের জন্য, কখনো অপ্রমাদ পরায়ণ ও উদ্যমশীল হওয়ার জন্য, কখনো সৎকর্ম অনুষ্ঠানের জন্য, কখনো নৈতিক জীবন-যাপনে উদ্বুদ্ধ করার জন্য জাতকগুলো ভাষিত হয়েছিল বলে প্রতীয়মান হয়। উইন্টারনীট্স (M. Winternitz) এর মতে,[৪১] জাতকের প্রধান উদ্দেশ্য হলো নীতি শিক্ষা দান। সুমন কান্তি বড়ুয়া এবং শান্টু বড়ুয়ার মতে, "জাতকের প্রধান উদ্দেশ্য পারমিতাসমূহের মহিমার্কীত্তন। বোধিসত্ত্ব কোনো জন্মে দান, কোনো জন্মে শীল, কোনো জন্মে প্রজ্ঞা, কোনো জন্মে সত্য, কোনো জন্মে মৈত্রী ইত্যাদি পারমিতার অনুষ্ঠান করেছিলেন এবং সেই সঞ্চিত পুণ্যবলে অভিসম্বুদ্ধ হয়ে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। উপাসকেরাও স্ব স্ব সাধ্যানুসারে এই সমস্ত পারমিতার অনুষ্ঠান করুক; তা হলে তাঁরাও জন্ম-জন্মান্তরে উন্নতি লাভ করে শেষে নির্বাণ লাভ করবেন; সহজ কথায় এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করাই জাতকের মুখ্য উদ্দেশ্য।"[৪২] তবে জাতকের বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করলে জাতকের উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিম্নরূপ বিষয় লক্ষ্য করা যায় :

১. জাতকের সমস্ত কথাই উপদেশাত্মক এবং মহাপুরুষ বাক্য। ফলে জাতকের আবেদন সহজে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে।

Dhaka University Institutional Repository

২. জাতকগুলোর মর্মবাণী সার্বজনীন এবং করুণারসে সিক্ত। ফলে জাতকগুলো সহজে সর্বজীবের প্রতি প্রীতিভাব জন্মাতে সাহায্য করে।

৩. প্রতিটি জাতকে অসৎ কর্মের ভয়াবহ পরিণতি এবং সৎকর্মের পুরস্কার হিসেবে স্বর্গীয় প্রীতিসুখ ভোগের নির্দেশ আছে। ফলে জাতকগুলো অনৈতিক কর্ম পরিহার করে সৎকর্ম অনুষ্ঠানে উদ্বুদ্ধ করে।

৪. জাতকে মানুষকে ভোগস্পৃহা পরিত্যাগপূর্বক লোভ, দ্বেষ, মোহ ক্ষয়ে উদ্বুদ্ধ করে।

৫. জাতকের কাহিনীগুলো দুঃখে জর্জরিত প্রাণীকূলকে নির্বাণ অভিমুখে পরিচালিত করে।

অতএব, পরিশেষে বলা যায়, কুশলকর্ম সম্পাদন এবং অকুশকর্ম বর্জনে উদ্বুদ্ধ করে নির্বাণে পরিচালিত করাই জাতকের মূল শিক্ষা।

১১. উপসংহার :

গৌতম বুদ্ধের অতীত জীবন-বৃত্তান্তই জাতকের প্রধান আলোচ্য বিষয়। জাতক শব্দের অর্থ 'যিনি জন্ম গ্রহণ করেছেন' বোঝালেও পালি সাহিত্যে গৌতম বুদ্ধের পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত বোঝাতেই 'জাতক' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। বুদ্ধ তাঁর শিষ্যা এবং অনুসারীদের উপদেশ দেয়ার সময় তাঁর অতীত জীবনের বিভিন্ন কাহিনী ও ঘটনা বলতেন। পালি সাহিত্যের ইতিহাসে এসব কাহিনী জাতক নামে অভিহিত। মানুষকে নৈতিক জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করা এবং নির্বাণের পথে পরিচালিত করাই জাতকগুলোর প্রধান উদ্দেশ্য। গৌতম বুদ্ধ জাতকের প্রবক্তা হলেও তিনি সকল জাতক ভাষণ করেননি। বিষয়বস্তু ও রচনাশৈলী বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, অনেক জাতক পরবর্তীকালে রচিত এবং অনেক কাহিনীকে বৌদ্ধবেশে সজ্জিত করে জাতকে রূপদান করা হয়েছে। এ কারণে কোন্‌গুলো প্রকৃত জাতক এবং প্রকৃত জাতকের সংখ্যা কত ছিল সে বিষয়ে মতদ্বৈততা লক্ষ্য করা যায়। তবে অধিকাংশ জাতক খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক বা মৌর্যযুগের পূবেই রচিত হয়েছিল। জাতকগুলো একটি নির্দিষ্ট রচনাশৈলী অনুসরণ করে রচিত। কিন্তু জাতকের আখ্যানগুলোর মধ্যে রচনাশৈলীর পার্থক্য, পুনঃরুক্তি দোষ এবং বর্ণিত গাথাসমূহের ভাষাশৈলী, ভাব ও কবিত্বগত পার্থক্য রয়েছে। আবার কোনো কোনো আখ্যায়িকা কৃত্রিম এবং বৌদ্ধ ভাবধারা হতে বিচ্যুত বলে প্রতীয়মান হয়। এ কারণে জাতকগুলো কোনো একক ব্যক্তির রচনা হিসেবে স্বীকার করা যায় না এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক রচিত হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। জাতকের বিষয়বস্তু

Dhaka University Institutional Repository

কাহিনী আকারে সন্নিবেশিত। এ কারণে এতে অতিরঞ্জিত ভাব-কল্পনা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু প্রত্যুৎপন্নবত্থু বা বর্তমানকথা অংশে প্রসঙ্গক্রমে জাতকের রচনাকালীন সময়ের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করা হয়েছে। ফলে উপর্যুক্ত অংশটি বুদ্ধের সমকালীন বা জাতকের রচনাকালীন সময়ের ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের বহু গুরুত্বপূর্ণ ধারণ করে আছে। এ কারণে জাতককে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার আকর গ্রন্থ বা অনন্য উৎস হিসেবে গণ্য করলে অত্যুক্তি হবে না। অতএব, বলা যায়, জাতকে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসস্পর্শী সমাজ জীবনের চিত্র অঙ্কন সম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

[১] সুকোমল চৌধুরী, *গৌতম বুদ্ধের ধর্ম-দর্শন*, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলিকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ৩৮২-৪০৩; ভিক্ষু শীলাচার শাস্ত্রী, *মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন*, নন্দন কানন বৌদ্ধ বিহার, চট্টগ্রাম, ১৯৭৮, পৃ., ৯৯; সুমঙ্গল বড়ুয়া এবং বেলু রানী বড়ুয়া, *বুদ্ধবাণীর মূলতত্ত্ব*, পালি এণ্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা, ২০১০, পৃ.১৪৮-১৪৯; সুকোমল বড়ুয়া এবং সুমন কান্তি বড়ুয়া, *ত্রিপিটক পরিচিতি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৯৯-১০১; সুমন কন্তি বড়ুয়া, *বৌদ্ধ দর্শনে পারমিতত্ত্ব*, পালি এণ্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ১৫-২০।

পারম্ +ই= পারমী, পরিশুদ্ধিতা অর্জনের জন্য যে চর্যা, যে সাধনা, যে সৎকর্মের অনুষ্ঠান তা পারমী। বুদ্ধত্ব অর্জনে অভিলাষী বোধিসত্ত্বগণকে পারমী পূর্ণ করতে হয়। থেরবাদী সাহিত্যে দশ প্রকার, মহাযানী সাহিত্যে ছয় প্রকার পারমীর উল্লেখ পাওয়া যায়। পারমীসমূহ তিনটি প্রধানভাগে বিভক্ত। যথা : উপ-পারমী, পারমী এবং পরমার্থ-পারমী। এগুলো প্রত্যেকটি দশভাগে বিভক্ত। এভাবে পারমী ত্রিশ প্রকার হয়।

[২] বোধিসত্ত্ব কয়টি জাতকে কি হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তার একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো :

রাজা-৮৫টি জাতকে, ঋষি-৮৩, বৃক্ষদেবতা-৪৩, আচার্য-২৬, অমাত্য-২৪, ব্রাহ্মণ-২৪, রাজপুত্র-২৪, ভূম্যাধিকারী-২৩, পণ্ডিত-২২, ইন্দ্র-২০, বানর-১৮, শ্রেষ্ঠী-১৩, ধনী-১২, মৃগ-১১, সিংহ-১০, রাজহংস-৮, বর্তক-৬, হস্তী-৬, কুক্কুট-৫, দাস-৫, গৃধ্ন-৫, অশ্ব-৪, গো-৪, ব্রহ্মা-৪, ময়ূর-৪, সর্প-৪, কুম্ভকার-৩, নিচ জাতীয় লোক-৩, গোধা-৩, মৎস-২, গজচালক-২, মূষিক-২, শৃগাল-২, কাক-২, কাষ্ঠ-কুট্টিক ২, চোর-২, শূকর-২, কুকুর-১, বিষবৈদ্য, ধূর্ত, কর্মকার, বর্ধকী এক এক বার করে।

[৩] ঈষাণচন্দ্র ঘোষ (অনু.), *জাতক*, করুণা প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৩৮৫ বাংলা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৭-৩৯।

[৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩-১৯৬।

[৫] সিদ্ধার্থ গৌতমের স্ত্রী যশোধরাকে 'রাহুলমাতা' বলা হত।

[৬] জাতক, প্রাগুক্ত, স্পন্দন জাতক (৪৭৫); দদ্দভ জাতক (৩২২), লটুকিক জাতক (৩৫৭); বৃক্ষধর্ম জাতক (৭৫); সম্মোদমান জাতক (৩৩)।

[৭] শান্তরক্ষিত মহাস্থবির (সংকলিত), *পালি-বাংলা অভিধান*, বৌদ্ধধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৬৬৮; শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গীয় শব্দকোষ*, প্রথম খণ্ড, সাহিত্য অকাদেমী, কলিকাতা, ১৯৬৬, পৃ. ৯৩৫-৯৩৬।

[৮] T. W. Rhys Davids, *Pali-English Dictionary*, Munshiram Manoharlal Publishers, New Delhi, 1975, p. 281.

[৯] Robert Caesear Childers, *A Dictionary of the Pali Language*, Rinsen Book House, Kyoto, p. 116-167.

[১০] Bimala Churn Law, *A History of Pali Literature*, Indica Books, Varanasi, India, 2000

Dhaka University Institutional Repository

(rep.), p.273; T. W. Rhys Davids, *Buddhist India*, Motilal Vanarsidas Publishers Private Limited, Delhi, 1993 (rep.), pp. 206.

[১১] রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া, *পালি সাহিত্যের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৯ (পুনমুদ্রন), পৃ.২৫৫; সুমন কান্তি বড়ুয়া এবং শান্টু বড়ুয়া, *জাতক সন্দর্শন*, অ্যার্ডন পাবিলিকেশন, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ১৭।

[১২] Jan Gonda (ed.), *A History of Indian Literature*, vol. vii., Fasc. 2, Wiesbaden, 1983, p. 79; *জাতক*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, ভূমিকা অংশ।

[১৩] সঙ্গীতি হলো ভিক্ষুসংঘের সর্বোচ্চ সভা। যে সভায় ভিক্ষুসংঘ সম্মিলিত হয়ে ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে ধর্মের রীতি-নীতির সংস্কার ও সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে এ পর্যন্ত ছয়টি মহাসঙ্গীতির উল্লেখ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সঙ্গীতি; Sumangal Barua, *Buddhist Councils and Development of Buddhism*, Atisha Memorial Publishing Society, Calcutta, 1997, p. 21-39; G.P. Malalasekera, *The Pali Literature of Ceylon*, Buddhist Publication Society, Kandy, 1994, p.122.

[১৪] M.Winternitz, *History of Indian Literature*, vol. 2, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., New Delhi, 1991, p. 53; B. C. Law, *A History of Pali Literature*, op. cit. p. 279; Wilhelm Geiger, *Pali Language and Literature*, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., New Delhi, 1996 (rep.), p. 9; *A History of Indian Literature*, vol. vii., Fasc. 2, p. 79; Oskae von Hinuber, *A Handbook of Pali Literature*, De Griyter, New York, 1996, p. 5-6; *Buddhist Councils and Development of Buddhism*,op. cit., p. 95; Wilhelm Geiger (ed.), *The Mahavamsa*, P.T.S. London, 1958, p. 94-99; সুমঙ্গল বড়ুয়া এবং বেলু রানী বড়ুয়া, *দীপবংস*, বাংলাদেশ রিসার্স সেন্টার ফর বুড্ডিস্ট স্টাডিজ, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ১২৭; দিলীপ কুমার বড়ুয়া এবং মৈত্রী তালুকদার, *মহাবংস*, অ্যার্ডন পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ১৫৩-১৬৪।

[১৫] *History of Indian Literature*, vol. 2, op. cit., p. 121; *A History of Pali Literature*, op. cit. p. 279.

[১৬] *জাতক সন্দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।

[১৭] *জাতক*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ভূমিকা, জাতককসমূহের 'সংগ্রহ কাল' অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

[১৮] *Sacred Book of the East*, vol. xxi, 1884, p. 120.

[১৯] *A History of Pali Literature*, op. cit. p.

[২০] *History of Indian Literature*, op. cit., pp. 121-123.

[২১] *A Handbook of Pali Literature*, op. cit., pp. 55-56.

[২২] *জাতক*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ভূমিকা।

Dhaka University Institutional Repository

[২৩] T. W. Rhys Davids, *Buddhist India*, Motilal Vanarsidas Puvlishers Private Limited, Delhi, 1993 (rep.), pp. 202, 208.

[২৪] *জাতক*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ভূমিকা।

[২৫] *A Handbook of Pali Literature*, op. cit., p. 57.

[২৬] J. Leggs (trans.), *Record of the Buddhists Kingdom*, Oxford, 1886, p. 106; J. Wang, *Buddhist Nikayas through Ancient Chinese Eyes*, Beiheft, 1994, p. p. 172.

[২৭] W. Stede, *Cullaniddesa*, P.T.S. London, 1956, p. 80; জি. পি. মালালাসেকেরা, ৫৫১ টি জাতক সংযুক্ত একটি গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন, যা ২২টি নিপাতে বিভক্ত ছিল। G.P. Malalasekera, *The Pali Literature of Ceylon*, Buddhist Publication Society, Kandy, 1994, p. 120.

[২৮] *জাতক*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ভূমিকা।

[২৯] *Husting's Encyclopedia of Religion and Ethics*, voll. Viii, p. 494.

[৩০] *The Pali Literature of Ceylon*, op. cit., p. 127; *A Handbook of Pali Literature*, op.cit., pp.55.

[৩১] *A Handbook of Pali Literature*, op. cit., pp. 54.

[৩২] *পালি সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭; সুকোমল বড়ুয়া এবং সুমন কান্তি বড়ুয়া, *ত্রিপিটক পরিচিতি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৪৩.

[৩৩] *Buddhist India*, op. cit., pp. 202; *A Handbook of Pali Literature*, op. cit., p. 56; *The Pali Literature of Ceylon*, op. cit., p. 121; *History of Indian Literature*, vol. 2, op. cit., p. 121; *A History of Pali Literature*, op. cit. p. 279; *A History of Pali Literature*, op. cit., p.278; *জাতক*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ভূমিকা, জাতককসমূহের 'সংগ্রহ কাল' অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

[৩৪] প্রাগুক্ত।

[৩৫] *জাতক*, ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ভূমিকা।

[৩৬] *Pali Language and Literature*, op. cit., p. 30; *History of Indian Literature*, vol. 2, op. cit., p 115-116; *Pali Literature of Ceylon*, op. cit., p. 120; *A Handbook of Pali Literature*, op. cit., p. 56; *A History of Pali Literature*, op. cit. p. 279; Kanai Lal Hazra, *Pali Languagr and Literature*, D. K. Printworld (P) Ltd, 1994, p. 311; *জাতক*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ভূমিকা; *ত্রিপিটক পরিচিতি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪।

[৩৭] *History of Indian Literature*, vol. 2, op. cit., p. 121.

[৩৮] *জাতক*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ভূমিকা।

Dhaka University Institutional Repository

[৩৯] *পালি সাহিত্যের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৬।

[৪০] *History of Indian Literature*, vol. 2, op. cit., p. 113.

[৪১] *History of Indian Literature*, vol. 2, op. cit., p. 125.

[৪২] *জাতক সন্দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাচীন ভারতের ভৌগোলিক সংস্থান

১. ভূমিকা

অঞ্চল ভেদে সামাজিক রীতি-নীতি এবং আচার-অনুষ্ঠানে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। এতে বোঝা যায়, সমাজ জীবনে ব্যাপক ভৌগোলিক প্রভাব রয়েছে। প্রাচীন ভারতের সমাজ জীবনের ক্ষেত্রেও এ বিষয়টি সত্য। তাই প্রাচীন ভারতের সমাজ জীবনের প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচন করতে হলে কোন্ কোন্ ভৌগোলিক অঞ্চল বা এলাকাকে ঘিরে সেই সমাজ জীবনের ভিত্তি রচিত হয়েছিল তা নির্ণয় করা আবশ্যক। এ উদ্দেশ্যে বর্তমান অধ্যায়ের প্রাচীন ভারতের ভৌগোলিক সংস্থান বা অবস্থা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হবে। জাতকে বিক্ষিপ্তভাবে প্রাচীন ভারতের ভৌগোলিক অবস্থা সম্পর্কে প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রে এসব তথ্যের সঙ্গে প্রাচীন ভারতের ঐতিহাসিক আকর গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত গ্রন্থসমূহে প্রাপ্ত তথ্যের মিল পাওয়া যায়। নিম্নে জাতকে প্রাপ্ত তথ্যের সঙ্গে অন্যান্য পালি ও সংস্কৃত সাহিত্যে এবং বিভিন্ন ঐতিহাসিক আকর গ্রন্থে প্রাপ্ত তথ্যের সমন্বয় সাধনপূর্বক প্রাচীন ভারতের ভৌগোলিক সংস্থান সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হবে।

২. ভারতবর্ষের প্রাচীন নাম

বর্তমানে 'ভারত' (ইণ্ডিয়া) নামে পরিচিত দেশটি প্রাচীন বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে নানা নামে উল্লেখ পাওয়া যায়। এতে বোঝা যায়, প্রাচীনকালে দেশটি নানা নামে পরিচিত ছিল। পালি সাহিত্যে দেশটি জম্বুদ্বীপ নামে উল্লেখ আছে। বিশেষত, দীঘনিকায়,[১] অঙ্গুত্তর নিকায়,[২] বিনয়পিটক,[৩] কথাবত্থু,[৪] বিনয় পিটকের অট্‌ঠকথা সমন্তপাসাদিকা,[৫] মজ্ঝিম নিকায়ের অট্‌ঠকথা পপঞ্চসূদনী,[৬] সংযুক্তনিকায়ের অট্‌ঠকথা সারত্থপ্পকাসিনী,[৭] বুদ্ধবংসের অট্‌ঠকথা মধুরত্থবিলাসিনী,[৮] ধম্মপদট্‌ঠকথা,[৯] থেরীগাথার অট্‌ঠকথা পরমত্থদীপনী,[১০] দীপবংস,[১১] মহাবংস,[১২] মিলন্দপঞ্হ,[১৩] চূল্লবংস,[১৪] এবং অধিকাংশ জাতকে[১৫] দেশটিকে জম্বুদ্বীপ নামে অভিহিত করা হয়েছে। মহাবস্তু,[১৬] ললিতবিস্তর,[১৭] বোধিসত্ত্বাবধানকল্পলতা [১৮] প্রভৃতি বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যে এবং সম্রাট অশোকের শিলালিপিতেও[১৯] দেশটি জম্বুদীপ নামে উল্লেখ করা হয়েছে। অঙ্গুত্তর নিকায়,[২০] বিসুদ্ধিমগ্গ,[২১] অত্থসালিনী [২২] এবং বিনয় পিটক[২৩] প্রভৃতি বৌদ্ধ ঐতিহ্যে উল্লেখ আছে যে, জম্বু বৃক্ষের[২৪] সমারোহের কারণে দ্বীপটি জম্বুদ্বীপ নামে পরিচিতি লাভ করে। সুত্তনিপাত এবং

Dhaka University Institutional Repository

সুত্তনিপাতের অট্‌ঠকথায় উল্লেখ আছে যে, জম্বুবৃক্ষের কারণে জম্বুদ্বীপকে জম্বুসণ্ডও বলা হত।[২৫] ব্রাহ্মণ্য কাব্য সাহিত্যেও দেশটির নানা নাম পাওয়া যায়। বায়ুপুরাণে দেশটি জম্বুদ্বীপ নামে উল্লেখ আছে। তবে এ গ্রন্থে আরো উল্লেখ আছে যে, জম্বুদ্বীপের একটি অংশে ম্লেচ্ছগণ বসবাস করতেন, যা 'অঙ্গদ্বীপ' নামে পরিচিত ছিল। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে[২৬] দেশটি সুদর্শনদ্বীপ নামে অভিহিত। এরূপ নামকরণের কারণ হিসেবে এ গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, এ দ্বীপে এক প্রকার সুন্দর বৃক্ষ ছিল, যার শাখা এক হাজার যোজন বিস্তৃত ছিল। ঋগ্‌বেদে সপ্ত নদীর দেশ হিসেবে ভারতবর্ষকে 'সপ্ত-সিন্ধব' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। চাইল্ডাসের[২৭] মতে, সিংহলদ্বীপের বিপরীতে দেশটিকে জম্বুদ্বীপ বলা হত।

অঙ্গুত্তর নিকায়, চূল্লনিদ্দেস, মহাবস্তু এবং জৈন ভাগবতী সূত্রে উল্লেখ আছে যে, বুদ্ধ এবং মহাবীরের সমসাময়িককালে প্রাচীন ভারতবর্ষ ষোড়শ জনপদে বিভক্ত ছিল এবং জনপদসমূহ বসবাসরত জনগোষ্ঠির নামানুসারে পরিচিত ছিল। যেমন : অঙ্গ, মগধ, কাশী, কোসল, বজ্জি, মল্ল ইত্যাদি। এ বিষয়ে ৪ নং অনুচ্ছেদে বিস্তারিত বর্ণনা করা হবে। ফা-হিয়েন[২৮] খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর দিকে ভারত ভ্রমণে আসেন। তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে দেশটি 'সিন্ধু' (Shin-tuh/Sindhu) নামে উল্লেখ আছে। ফলে অনুমান করা যায় যে, খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত দেশটি নানা নামে অভিহিত ছিল। তবে ধারণা করা হয় যে, সিন্ধু নদী বা ইন্দাস (Indus) নদীর নাম থেকে 'ইণ্ডিয়া' নামের উৎপত্তি হয়।[২৯]

নানা নাম পাওয়া গেলেও দেশটি কীভাবে 'ভারত' নামে পরিচিতি লাভ করলো সে বিষয়ে তেমন একটা তথ্য পাওয়া যায় না। তবে এ সম্পর্কে বি. সি. ল্য জৈন গ্রন্থ *জম্বুদ্দীবপণ্ণত্তি* গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, "এ গ্রন্থ মতে জম্বুদ্বীপ নয়টি বর্ষে বা ভাগে বিভক্ত ছিল। তন্মধ্যে ভারতবর্ষ একটি। বর্ষসমূহের মধ্যে ভারতবর্ষ সর্বদক্ষিণে অবস্থিত ছিল। রাজা ভরতের নামানুসারে দেশটি ভারতবর্ষ নামে অভিহিত হয়।"[৩০] বিষয়টি কতটুকু সত্যস্পর্শী তা প্রামাণিক তথ্যের অভাবে নির্ণয় করা কঠিন। তবে রাজা ভরতের নাম *রামায়ণে* উল্লেখ পাওয়া যায়, যিনি রামের অনুপস্থিতিতে বার বছর রাজ্য শাসন করেছিলেন। *রামায়ণের* কাহিনী ভারতীয় জনজীবনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। ফলে *রামায়ণে* বর্ণিত রাজা ভরতের নামানুসারে দেশটি ভারতবর্ষ নামে অভিহিত করা হয়েছিল- এরূপ ধারণা অযৌক্তিক বলে মনে হয় না।

যাহোক, উপর্যুক্ত তথ্য পর্যালোচনা করে বলা যায়, বৌদ্ধ ও অধিকাংশ ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে প্রাচীন ভারতবর্ষকে জম্বুদ্বীপ নামে অভিহিত করা হয়েছে। ফলে দেশটির প্রাচীন নাম যে 'জম্বুদ্বীপ' ছিল তা গ্রহণযোগ্য। এছাড়াও দেশটি জম্বুসণ্ড, সুদর্শনদ্বীপ, সিন্ধু, সপ্ত সিন্ধব প্রভৃতি নামেও পরিচিত ছিল। মূলত

প্রাচীন ভারতবর্ষ ছিল পাহাড়-পর্বত, সাগর-মহাসাগর, নদ-নদী, খাল-বিল, বন-জঙ্গল, গাছ-পালা, ফুল-ফল, হ্রদ, দ্বীপ এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা একটি বিশাল দেশ। ফলে অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার সেই যুগে বিশাল দেশটি পরিভ্রমণ করে একজনের পক্ষে সমগ্র দেশটি সম্পর্কে ধারণা দেয়া কঠিন ছিল। ফলে দর্শনার্থী দেশটির যে অংশ দেখেছেন সে অংশ সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এ কারণে দেশটি সম্পর্কে নানা রকম বর্ণনা পাওয়া যায় এবং দেশটিকে নানা নামে অভিহিত করতে দেখা যায়।

৩. প্রাচীন ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সংস্থান

ব্রাহ্মণ্য সাহিত্য তথা কাব্য এবং পুরাণে উল্লেখ আছে যে, 'চক্রবাল বা মহাবিশ্ব সাতটি মহাদ্বীপে বিভক্ত এবং সাতটি সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। দ্বীপগুলো হলো : জম্বু, সাক, কুস, সালমল, কৌঞ্চ, গোমেদ এবং পুষ্কর। তন্মধ্যে জম্বুদ্বীপ নানা রকম ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ ছিল এবং বর্তমান ভারতবর্ষ জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত ছিল। বৌদ্ধ ও জৈন ঐতিহ্যেও অভিন্ন অভিমত লক্ষ্য করা যায়। তবে দ্বীপের নাম ও সংখ্যা বিষয়ে অমিল লক্ষ্য করা যায়। বৌদ্ধ সাহিত্যে জম্বুদ্বীপকে মহাচক্রবালের চারি মহাদ্বীপের অন্যতম একটি মহাদ্বীপ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বৃহ্চ্ছত্তজাতক (III, p. 115),[৩১] ঘটজাতক (IV, p. 79), কুণ্ডককুক্ষি সৈন্ধব জাতক (II, p. 287) এবং সরভঙ্গজাতক (V, p. 135) প্রভৃতিতে প্রাচীন ভারতবর্ষকে রাষ্ট্র (রট্‌ঠ) বা রাজ্য হিসেবে বিভাজনের পাশাপাশি মজ্‌ঝিমদেশ বা মধ্যদেশ, দক্ষিণাপথ এবং উত্তরাপথ - এরূপভাবেও বিভাজন করতে দেখা যায়। কিন্তু জাতকে এসব অঞ্চলের বা জনপদের ভৌগোলিক সীমারেখা বা সংস্থান সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায় না। বিনয়পিটক,[৩২] সুমঙ্গলবিলাসিনী,[৩৩] ধম্মপদট্‌ঠকথা,[৩৪] সুত্তনিপাত, সুত্তনিপাতের অট্‌ঠকথা পরমত্থজোতিকা,[৩৫] অঙ্গুত্তর নিকায়ের অট্‌ঠকথা মনোরথপূরণী,[৩৬] বিভঙ্গের অট্‌ঠকথা সম্মোহবিনোদনী,[৩৭] পেতবত্থুর অট্‌ঠকথা পরমত্থদীপনী,[৩৮] ধম্মসঙ্গনীর অট্‌ঠকথা অত্থসালিনী,[৩৯] মহানিদ্দেস এবং চূল্লনিদ্দেস এর অট্‌ঠকথা সদ্ধম্মপজ্জোতিকা[৪০] প্রভৃতি পালি গ্রন্থে জাতকের ন্যায় বিভাজন লক্ষ্য করা যায়। মহাবস্তু [৪১] নামক বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যেও অভিন্ন বিভাজন লক্ষ্য করা যায়।

তবে এসব গ্রন্থে বিক্ষিপ্তভাবে মজ্‌ঝিমদেশ, দক্ষিণাপথ এবং উত্তরাপথের ভৌগোলিক সীমারেখা সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। জি. পি. মালালাসেকেরার এসব তথ্য সংগ্রহ করে মজ্‌ঝিম দেশের ভৌগোলিক সীমারেখা নির্ণয়ের প্রচেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, মজ্‌ঝিমদেশ পূর্বে কঙ্গল, দক্ষিণ-পূর্বে শালবতী নদী, দক্ষিণ-পশ্চিমে শতকণ্নিক নগর, পূর্বে থুনা নামক ব্রাহ্মণ গ্রাম, উত্তরে উসিরধ্বজ পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[৪২] দীঘনিকায়ের

Dhaka University Institutional Repository

অট্ঠকথা সুমঙ্গলবিলাসিনী[৪৩] নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে, মজ্ঝিমদেশ দৈর্ঘ্যে তিনশত যোজন, প্রস্থে দুইশত পঞ্চাশ যোজন এবং নয়শত যোজন বিস্তৃত ছিল। দিব্যাবদান[৪৪] এবং বিনয়পিটক[৪৫] সাক্ষ্য দেয় যে, মজ্ঝিমদেশের পূর্বসীমা উত্তর বঙ্গের পুণ্ড্রবর্ধননগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বৃহৎছত্তজাতক (III, p. 115) হতে জানা যায় যে, মজ্ঝিমদেশ বা মধ্যদেশের জনগন পণ্ডিত এবং পূণ্যবান ছিলেন। জি. পি. মালালাসেকেরা [৪৬] পালি সাহিত্য হতে তথ্য সংগ্রহ করে উত্তরাপথের সীমারেখা নির্ধারণ করেছেন এরূপ : "উত্তরাপথ মূলত একটি বাণিজ্যপথ, যা শ্রাবস্তী হতে গান্ধারের তক্ষশিলা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দক্ষিণাপথের বিপরীতে উত্তরাঞ্চলকে উত্তরাপথ নামে অভিহিত করা হয়। ফলে ধারণা করা যায় যে, উত্তরাপথ বোঝাতে প্রাচীন ভারতের সমগ্র উত্তরাঞ্চল বোঝাত। এ কারণে বলা যায়, পূর্বে অঙ্গ হতে উত্তর-পশ্চিমে গান্ধার পর্যন্ত এবং উত্তরে হিমালয় হতে দক্ষিণে বিন্ধ পর্বত পর্যন্ত উত্তরাপথ বিস্তৃত ছিল।" ঘটজাতকে (IV, p. 79) কংসভোগ নামক রাজ্যটি উত্তরা পথে অবস্থিত ছিল বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। পালি সাহিত্যে কাশ্মির-গান্ধার এবং কম্বোজ উত্তরাপথের প্রধান বিভাগ বা অঞ্চল হিসেবে উল্লেখ আছে।' অপরদিকে, সুমঙ্গলবিলাসিনী[৪৭] গ্রন্থ মতে, গঙ্গার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত অঞ্চলই হচ্ছে দক্ষিণাপথ। জি. পি. মালালাসেকেরার [৪৮] মতে, দক্ষিণাপথও মূলত একটি বাণিজ্যপথ। তবে পালি সাহিত্যে দক্ষিণাপথ শব্দটি গোদাবরী নদীর তীরস্থ অঞ্চল বোঝতে ব্যবহৃত হয়েছে। মূলত, গোদাবরীর উত্তর তীরে এবং গঙ্গার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত বিস্তীর্ণ অঞ্চলই ছিল দক্ষিণাপথ। যাহোক, জাতকে জম্বুদ্বীপের নানা স্থানের আয়তন সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া গেলেও সমগ্র জম্বুদ্বীপের আয়তন কত ছিল তা উল্লেখ পাওয়া যায় না। যেমন, সরভঙ্গজাতকে (V, p. 135) উল্লেখ আছে যে, বারাণসী ১২ যোজন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, কিন্তু তাতে জম্বুদ্বীপের আয়তন উল্লেখ নেই । তবে দীঘনিকায়ের অট্ঠকথা সুমঙ্গলবিলাসিনী[৪৯] নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, জম্বুদ্বীপ দশ হাজার (১০,০০০) যোজন বিস্তৃত ছিল এবং এতে পাঁচশত দ্বীপ ছিল। মেগাস্থিনিস[৫০] এর মতে, প্রাচীন ভারতবর্ষের বিস্তৃতি (দক্ষিণ সাগর হতে ককেসাস পর্যন্ত) ছিল বিশ হাজার (২০,০০০) স্তদিয়া (Stadia)। প্রস্থ ছিল ষোল হাজার (১৬,০০০) স্তদিয়া এবং দৈর্ঘ্য ছিল বাইশ হাজার তিনশত (২২, ৩০০) স্তদিয়া। দীর্ঘনিকায়[৫১] মতে, জম্বুদ্বীপের উত্তরাংশ ছিল বিস্তৃত এবং দক্ষিণাংশ গরুর গাড়ীর সম্মুখ অংশের ন্যায় সরু। এটি সাতটি সম অংশে বিভক্ত ছিল। স্পেন্স হার্ডি পালি অট্ঠকথাসমূহের তথ্য বিশ্লেষণ করে বলেন, "জম্বুদ্বীপের দশ হাজার যোজনের মধ্যে চার হাজার যোজন সমুদ্র দ্বারা, তিন হাজার যোজন বন ও পর্বতশ্রেণির দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল এবং তিন হাজার যোজন ছিল মনুষ্য বসতি। গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরভূ এবং মাহী - এই পাঁচটি মহানদী জম্বুদ্বীপের মধ্যে দিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে পতিত হয়।"[৫২] সমন্তপাসাদিকা গ্রন্থে[৫৩] উল্লেখ আছে যে, ভিক্ষুগণ ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে পরিভ্রমণের সময় জম্বুদ্বীপকে তিনটি মণ্ডলে বিভক্ত করতেন। যথা : 'মহামণ্ডল, মজ্ঝিম মণ্ডল এবং অন্তিম মণ্ডল। মহামণ্ডল নয়শত লিগ, মজ্ঝিমমণ্ডল ছয়শত লিগ এবং অন্তিম মণ্ডল তিনশত লিগ বিস্তৃত ছিল। ত্রিপিটকের অন্তর্গত দীঘনিকায়ের চক্কবত্তিসীহনাদ সূত্রে[৫৪] জম্বুদ্বীপকে শক্তিশালী এবং সমৃদ্ধ দ্বীপ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে আরো উল্লেখ আছে যে, জম্বুদ্বীপের গ্রাম ও শহরগুলো খুবই কাছাকাছি অবস্থিত ছিল।' অঙ্গুত্তরনিকায়[৫৫] গ্রন্থে জম্বুদ্বীপ সম্পর্কে এরূপ উক্ত আছে : জম্বুদ্বীপ সুন্দর ও মনোরম উদ্যান, বন, ভূমি, হ্রদ, নদী, ঢালু জায়গা, পর্বত এবং বনাঞ্চল পরিবেষ্টিত ছিল। পালি পপঞ্চসূদনী[৫৬] নামক অট্ঠকথায় জম্বুদ্বীপকে বনাঞ্চল হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং এ গ্রন্থে আরো উল্লেখ আছে যে, সমগ্র জম্বুদ্বীপে প্রচুর স্বর্ণ উত্তোলন হতো। মহাবস্তু[৫৭] গ্রন্থ সাক্ষ্য দেয় যে, জম্বুদ্বীপ সমুদ্রবন্দর পরিবেষ্টিত ছিল এবং এখান থেকে বাণিজ্যযাত্রা করা হত।

মহাভারতে বর্ণিত আছে যে, ভারতবর্ষের অবয়ব সমভূজ আকৃতির ত্রিভুজের ন্যায়, যা চারটি ছোট সম আকৃতির ত্রিভুজে বিভক্ত ছিল। আলেকজ্যাণ্ডার কানিংহাম প্রাচীন ভারতবর্ষ বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা করে বলেন, "ভারতবর্ষের প্রাচীন আকার ছিল অসম চতুষ্কোণ আকৃতির। যদি উত্তর-পশ্চিম কোণ গজনী পর্যন্ত এবং অন্য দু'টি কোণ কর্ণকুমারী ও আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত করা হয় তা হলে ভারতবর্ষের যে সাধারণ আকার পাওয়া যায় তা মহাভারতের বর্ণনার সঙ্গে মিল পাওয়া যায়।"[৫৮] প্রাচীন জ্যোতিষবিদ পরাসর এবং বরাহমিহির ভারতবর্ষ নয়খণ্ডে বিভক্ত ছিল বলে উল্লেখ করেছেন।[৫৯] এরূপ বিভাজন পুরাণ সাহিত্যেও উদ্ধৃত আছে। পুরাণ মতে, প্রাচীন ভারতবর্ষ ছিল অষ্ট-পাপড়িযুক্ত পদ্মের ন্যায় গোলাকার অবয়ব সম্পন্ন।[৬০] জৈন গ্রন্থ জম্বুদ্দীবপণ্ণত্তি[৬১] মতে, জম্বুদ্বীপ সাতটি বর্ষে বা ভাগে বিভক্ত ছিল। কিন্তু কাব্যমীমাংসা[৬২] গ্রন্থে ভারতবর্ষ পাঁচটি প্রধানভাগে বিভক্ত ছিল বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা : ১) পূর্বদেশ, যা বারাণসী পূর্বদিকে অবস্থিত ছিল ২) দক্ষিণাপথ, যা মহিস্মতীর দক্ষিণে অবস্থিত ছিল ৩) পশ্চাতদেশ বা পশ্চিমদেশ, যা দেবসভার পশ্চিমে অবস্থিত ছিল ৪) উত্তরাপথ, যা পৃথুদক (বর্তমান থানেশ্বরের ১৪ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত) এর দক্ষিণে অবস্থিত ছিল এবং ৫) অন্তরবেদী, যা বিনসন এবং প্রয়াগের মধ্যবর্তী অঞ্চলে বা যমুনা ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত ছিল। পুরাণের ভুবনকোষ অনুচ্ছেদেও ভারতবর্ষকে পাঁচটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। তবে নামকরণে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। নিচে পুরাণ[৬৩] অনুসারে ভারতবর্ষের বিভাজন তুলে ধরা হলো :

১. মজ্ঝিমদেশ বা মধ্যদেশ (মধ্য ভারত)

Dhaka University Institutional Repository

২. উদীচ্য (উত্তর ভারত)

৩. প্রাচ্য (পূর্ব ভারত)

৪. দক্ষিণাপথ (দক্ষিণ ভারত)

৫. অপরান্ত (পশ্চিম ভারত)

চৈনিক তথ্যেও (Official Record of Thang Dynasty, 7th Century) অভিন্ন বিভাজন লক্ষ্য করা যায়। পুরাতত্ত্ব ও ভারততত্ত্ববিদ্ কার্নিংহাম[৬৪] চৈনিক তথ্য পর্যালোচনা করে প্রাচীন ভারতবর্ষের বিভাজন নিম্নরূপভাবে উপস্থাপন করেন :

১. উত্তর ভারত : পাঞ্জাব, কাশ্মীর এবং তৎসংলগ্ন পার্বত্য রাজ্যগুলো, পূর্ব আফগানিস্তান, যা সরস্বতী নদীর পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

২. পশ্চিম ভারত : সিন্ধু, পশ্চিম রাজপুতনা, গুজরাট এবং নর্মদা নদীর নিম্নাঞ্চলের কিয়দংশ।

৩. মধ্য ভারত : সমগ্র গাঙ্গেয় উপত্যকা, যা থানেশ্বর থেকে ব-দ্বীপের মাথা এবং হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল থেকে নর্মদা নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

৪. পূর্ব-ভারত : আসাম, বঙ্গ, উড়িষ্যা এবং গঞ্জম, যা গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

৫. দক্ষিণ ভারত : নাসিক, কর্ণকুমারী, তেলিঙ্গনা, মহারাষ্ট্র, কঙ্কন, হায়দ্রোবাদ, মহিশূর প্রভৃতি রাজ্য নিয়ে গঠিত ছিল।

চৈনিক বিভাজনটা মূলত পুরাণ এবং কাব্যমীমাংসার ভিত্তিতে করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। চৈনিক লেখক ফা-কাই-লি-তু (Hah-kai-lih-to) এর মতে, ভারতবর্ষের উত্তর ভাগ বিস্তৃত এবং দক্ষিণভাগ সরু।[৬৫] চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ভারত ভ্রমণে আসেন। তাঁর মতে, ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অবয়ব অর্ধচন্দ্রাকৃতি, যার উত্তর দিক বিস্তৃত এবং দক্ষিণ দিক ক্রমাগত সরু হয়ে সমাপ্ত হয়।[৬৬] চৈনিক লেখকদের তথ্য বর্তমান এবং প্রাচীন ভারতবর্ষের মানচিত্রের অবয়বের সঙ্গে প্রায়ই মিল পাওয়া যায় (নিম্নে প্রাচীন মানচিত্র যুক্ত করা হলো)।

উপর্যুক্ত তথ্য সমীক্ষায় দেখা যায়, বিভিন্ন গ্রন্থে ভৌগোলিক সীমারেখা এবং বিভাজন সম্পর্কে বর্ণনা পাওয়া গেলেও কেবল বৌদ্ধ ঐতিহ্য দীঘনিকায়ের অট্‌ঠকথা সুমঙ্গলবিলাসিনী এবং মেগাস্থিনিসের বর্ণনায় প্রাচীন ভারতবর্ষের আয়তন উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু সুমঙ্গলবিলাসিনীর তথ্য অসম্পূর্ণ মনে হয়। কারণ এতে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের উল্লেখ নেই। শুধু উল্লেখ আছে জম্বুদ্বীপ দশ হাজার যোজন বিস্তৃত ছিল। ফলে সঠিক

Dhaka University Institutional Repository

আয়তন নির্ণয় করা কঠিন। বৈদিক ও বৌদ্ধ সাহিত্যে 'যোজন' দূরত্ব পরিমাপের একক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। জানা যায়, এক যোজন সমান ১৩ কিলোমিটার বা ৮ মাইল।[৬৭] ফলে দশ হাজার (১০,০০০) যোজন = এক লক্ষ ত্রিশ হাজার (১৩,০০০০) কিলোমিটার বা আশি হাজার (৮০,০০০) হাজার মাইল। এখন মেগাস্থানিসের তথ্য পর্যালোচনা করব। সাধারণত ১ স্তদিয়া = ৬০০ ফুট ।[৬৮] ফলে মেগাস্থানিসের তথ্য মতে ভারতবর্ষের আয়তন দাঁড়ায় ছয়চল্লিশ লক্ষ সাত হাজার চারশত পঞ্চান্ন (৪৬,০৭, ৪৫৪.১০) বর্গ মাইল। তাছাড়া, দক্ষিণ সাগর হতে ককেসাস পর্যন্ত ভারতবর্ষ ছিল দুই হাজার দুইশত তিয়াত্তর মাইল (২০,০০০ স্তদিয়া = ১২,০০০০০০ ফুট= ৪০০০০০০ গজ=২২৭২.৭৩ মাইল, তথ্যনির্দেশে বিস্তারিত প্রদান করা হলো)।

বর্তমানে ভারতবর্ষের আয়তন একত্রিশ লক্ষ ছয়ষট্টি হাজার চারশত চৌদ্দ (৩১,৬৬,৪১৪) বর্গ কিলোমিটার বা বার লক্ষ বাইশ হাজার পাঁচশত উনষাট (১২,২২,৫৫৯) বর্গমাইল।

উপর্যুক্ত আলোচনা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, জম্বুদ্বীপ তথা প্রাচীন তারতবর্ষের আয়তন ও ভৌগোলিক সংস্থান বা অবয়র সম্পর্কে প্রাচীন উৎসসমূহে যে তথ্য পাওয়া যায় তাতে মিল অমিল উভয়ই পরিলক্ষিত হয়। উৎসসমূহের (sources) তথ্য ক্ষেত্র বিশেষে অলৌকিক ও অতিরঞ্জিত মনে হয় এবং উৎসসমূহে যে সীমারেখা বর্ণিত হয়েছে তা বর্তমান ভূখণ্ডের ভৌগোলিক সীমারেখার বাইরেও বিস্তৃত ছিল বলে প্রতীয়মান হয়। ইতোপূর্বে বলেছি, বিশাল ভারতবর্ষকে যে যেভাবে দেখেছে সে সেভাবে তার বর্ণনায় লিপিবদ্ধ করেছে। এ কারণে তথ্যের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া, ভৌগোলিক সীমারেখা নানা কারণে পরিবর্তিত হয়। ভারতবর্ষের সীমারেখাও নানা সময়ে নানাভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। এ কারণে আয়তন এবং সীমারেখায় কিছুটা পার্থক্য থাকা অস্বাভাবিক নয়। ফলে সুমঙ্গলবিলাসিনী এবং মেগাস্থিনিস বর্ণিত আয়তনের সঙ্গে বর্তমান আয়তনের পার্থক্য থাকাটাও স্বাভাবিক। তবে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে ভৌগোলিক সীমারেখা বিষয়ে প্রদত্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে বলা যায়, প্রাচীন ভারতবর্ষ উত্তরে হিমালয়, উত্তর-পশ্চিমে আফগান-পাকিস্তান সীমান্ত, দক্ষিণ-পূর্বে বঙ্গোপসাগরের তীর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে আবর সাগরের তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এ সীমারেখা মানচিত্রে উপস্থাপন করলে যে ভৌগোলিক অবয়ব বা আকৃতি পাওয়া যায় তা প্রাচীন এবং বর্তমান মানচিত্রের আকৃতির সঙ্গে প্রায়ই মিল পাওয়া যায়।

৪. জনপদ হিসেবে প্রাচীন ভারতবর্ষের বিভাজন

ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি, বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্য পাঠে জানা যায় যে, বুদ্ধ ও মহাবীরের সমসাময়িককালে ভারতবর্ষ ষোলটি জনপদ বা মহাজনপদে বিভক্ত ছিল। কিন্তু জাতকে[৬৯] 'জনপদ' কথাটি উল্লেখ পাওয়া গেলেও জনপদসমূহের ধারাবাহিক নামোল্লেখ এবং ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে জাতকে জনপদসমূহ রাষ্ট্র (রট্‌ঠ) বা রাজ্য হিসেবে বিক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ আছে। ত্রিপিটকের অন্তর্গত অঙ্গুত্তর নিকায়[৭০] নামক গ্রন্থে ষোড়শ জনপদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা পাওয়া যায়। এ ছাড়া, জৈন ভাগবতী সূত্র, চূল্লনিদ্দেস এবং মহাবস্তু গ্রন্থেও ষোড়শ জনপদের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। ললিতবিস্তর[৭১] গ্রন্থেও প্রাচীন ভারতবর্ষ ষোড়শ মহাজনপদে বিভক্ত ছিল বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু এ গ্রন্থে জনপদগুলোর নামোল্লেখ নেই। জৈন বসভসূত্রেও একটি অসম্পূর্ণ নামের তালিকা পাওয়া যায়। দীঘনিকায়ে[৭২] বারটি জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়। তুলনামূলক পর্যালোচনার সুবিধার্থে অঙ্গুত্তর নিকায়, চূল্লনিদ্দেস, মহাবস্তু এবং জৈন ভাগবতী সূত্রে প্রাপ্ত ষোড়শ জনপদের নামের তালিকা নিম্নে পাশাপাশি উপস্থাপন করা হলো :

বৌদ্ধ সাহিত্য (পালি এবং বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্য)[৭৩]			
অঙ্গুত্তর নিকায়	চূল্লনিদ্দেস	মহাবস্তু	জৈন ভাগবতী সূত্র
১। অঙ্গ	১। অঙ্গ	১। অঙ্গ	১। অঙ্গ
২। মগধ	২। মগধ	২। মগধ	২। বঙ্গ (ভঙ্গ)
৩। কাসি (কাশি)	৩। কাশি	৩। কাশী	৩। মগহ (মগধ)
৪। কোসল (কোশল)	৪। কোশল	৪। কোশল	৪। মলয়
৫। বজ্জি (বৃজ্জি)	৫। বজ্জি	৫। বজ্জি	৫। মালব (মালবক)
৬। মল্ল	৬। মল্ল	৬।। মল্ল	৬। অচ্ছ
৭। চেতি (চেদি)	৭। চেদি	৭। চেদি	৭। বচ্ছ (বৎস)
৮। বংস (বংশ)	৮। বংস	৮। বৎস	৮। কোচ্ছ (কচ্ছ?)
৯। কুরু	৯। কুরু	৯। কুরু	৯। পাঢ় (পাণ্ড্য বা পৌণ্ড্র
১০। পঞ্চাল	১০। পঞ্চাল	১০। পঞ্চাল	১০। লাঢ় (লাট বা রাঢ়)
১১। মচ্চ (মৎস)	১১।মচ্চ (মৎস)	১১। মৎস	১১। বজ্জি (ভজ্জি)
১২। সূরসেন (শূরসেন)	১২। সূরসেন	১২। সূরসেন	১২। মোলি (মল্ল)
১৩। অস্‌সক (অশ্মক)	১৩। অস্‌সক	১৩। অস্‌সক	১৩। কাসি (কাশি)
১৪। অবন্তি	১৪। অবন্তি	১৪। অবন্তি	১৪। কোসল (কোশল)
১৫। গান্ধার	১৫। কম্বোজ	১৫। শিবি	১৫। অবাহ
১৬। কম্বোজ	১৬। যোন	১৬। দর্শান	১৬। শম্ভুত্তর (শুম্ভত্তর)
	১৭। কলিঙ্গ		

Dhaka University Institutional Repository

উপরের সারণীতে সন্নিবেশিত তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, গ্রন্থসমূহে বর্ণিত ষোড়শ জনপদের নামের মধ্যে মিল এবং অমিল উভয়ই লক্ষ্য করা যায়। পণ্ডিত টি. ডব্লিউ. রীস ডেবিড্‌স, এ. জে. থমাস, জি. পি. মালালাসেকেরা, বি. সি. ল্য, সুনীল চট্টোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী প্রমুখ গবেষকগণ জৈন ভাগবতী সূত্র এবং অন্যান্য উৎসের তথ্য অপেক্ষা অঙ্গুত্তর নিকায়ের তথ্য প্রাচীন, ইতিহাস স্পর্শী এবং অধিক গ্রহণযোগ্য মনে করেন।[৭৪] এ কারণে অঙ্গুত্তর নিকায় গ্রন্থে বর্ণিত নামের তালিকা প্রামাণিক হিসেবে গ্রহণ করা যায়। বৌদ্ধ সাহিত্য তথা অঙ্গুত্তর নিকায়, চূল্লনিদ্দেস এবং মহাবস্তু গ্রন্থে বর্ণিত জনপদের নামের তালিকা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, দু'য়েকটি ব্যতিক্রম ব্যতীত অধিকাংশ জনপদ নামের ক্ষেত্রে মিল রক্ষা করেছে। তবে চূল্লনিদ্দেস গ্রন্থে জনপদের সংখ্যা ১৭টি। অর্থাৎ অঙ্গুত্তর নিকায়, মহাবস্তু এবং জৈন ভাগবতী সূত্র অপেক্ষা ১টি বেশি। এ গ্রন্থে কলিঙ্গকেও মহাজনপদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে এবং গান্ধারের পরিবর্তে যোন রাজ্যের নামোল্লেখ করা হয়েছে। অপর দিকে, মহাবস্তু গ্রন্থের তালিকা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এ গ্রন্থে গান্ধার এবং কম্বোজের পরিবর্তে শিবি এবং দশার্ণ নামক জনপদ দু'টি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। পুনারায়, বৌদ্ধ সাহিত্য (অঙ্গুত্তর নিকায়, চূল্লনিদ্দেস এবং মহাবস্তু) এবং জৈন ভাগবতী সূত্রের নামের তালিকা তুলনামূলক পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, উভয়ের মধ্যে কেবল অঙ্গ, মগধ, কাশি, কোশল, বজ্জি, বৎস - এ ৬টি জনপদের মিল পাওয়া যায়। বাকীগুলোর ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। ঐতিহাসিক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী জৈন ভাগবতী সূত্রে উল্লেখিত মালব জনপদকে অবন্তি জনপদ হিসেবে অভিহিত করেছেন। এছাড়া, তিনি মোলি 'মল্ল' শব্দের অপভ্রংশ মনে করেন।[৭৫] জৈন ভাগবতী সূত্রে বর্ণিত অন্যান্য নামগুলো পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে অবস্থিত। এ নামগুলো বিশিষ্ট গবেষক এ. জে. থমাস[৭৬] পরবর্তীকালের সংযোজন বলে মনে করেন। তিনি অভিমত পোষণ করেছেন যে, 'জৈন লেখক উত্তর ভারতের কম্বোজ ও গান্ধারের কথা উল্লেখ করেন নি। তিনি কেবল দক্ষিণ ভারতের জাতিগোষ্ঠিকে তালিকা ভুক্ত করেছেন।' কিন্তু জাতকে কলিঙ্গ, শিবি, দশার্ন, মলয়, মালব প্রভৃতি রাজ্য বা রাষ্ট্র হিসেবে উল্লেখ আছে (দ্রষ্টব্য, ৫.২ নং অনুচ্ছেদ)। এ ছাড়াও, জাতকে সুম্ম বা সুম্ভ,[৭৭] দমিল, কংসভোগ, দক্ষিণগিরি, বিদেহ, একবল, কাশ্মির, ককেয়, কোকালিক, মেজ্ঝরাষ্ট্র বা মেজ্ঝদেশ, কোটুম্বর, মল প্রভৃতি রাজ্য হিসেবে উল্লেখ আছে। তবে জৈন ভাগবতী সূত্রে উল্লেখিত বঙ্গ (ভঙ্গ), কোচ্ছ, পাঢ় বা পাণ্ড্য, অবাহ, শম্ভুত্তর প্রভৃতি জাতকে উল্লেখ পাওয়া যায় না। অবশ্য মহাবংস[৭৮] গ্রন্থে বঙ্গ রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। ফলে ধারণা করা যায় যে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অঞ্চল জনপদ বা

Dhaka University Institutional Repository

রাজ্যের মর্যাদা লাভ করেছিল এবং লেখকগণ তাদের জ্ঞাত জনপদগুলোই কেবল লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এ কারণে গ্রন্থগুলোতে বর্ণিত জনপদের নামের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

ষোড়শ জনপদের মধ্যে গান্ধার এবং কম্বোজ ছাড়া বাকী ১৪টি জনপদকে একত্রে মজ্ঝিম বা মধ্যদেশ বলা হয়।[৭৯] দীঘনিকায়[৮০] গ্রন্থে অস্সক, অবন্তি, গান্ধার এবং কম্বোজ ছাড়া অঙ্গুত্তর নিকায়ে বর্ণিত বাকী ১২টি জনপদ মজ্ঝিমদেশের অর্ন্তভূক্ত ছিল বলে উল্লেখ আছে। কিন্তু সরভঙ্গজাতক (V, p. 135) অবন্তি জনপদ দক্ষিণাপথের অন্তর্গত ছিল বলে সাক্ষ্য দেয়। বি. সি. ল্য[৮১] গান্ধার এবং কম্বোজকে উত্তরাপথের এবং অস্সক ও অবন্তিকে দক্ষিণাপথের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। ইন্দ্রিয়জাতকে (vol. III, p. 403) সৌরাষ্ট্র (সৌরট্‌ঠ), লম্বচূলক, অবন্তি, দক্ষিণাপথ, দণ্ডক অরণ্য, কুম্ভবতিনগর, অরঞ্জগিরি প্রভৃতি মজ্ঝিমদেশের জনপদ হিসেবে উল্লেখ আছে।

উপর্যুক্ত বর্ণনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, জনপদের সংখ্যা ষোলটির অধিক ছিল। মূলত ষোল সংখ্যাটি দিয়ে কেবল তাদের মধ্যে বৃহত্তম ও সবচেয়ে শক্তিশালী জনপদ বা রাষ্ট্রগুলোকেই বোঝানো হয়েছে। উত্তর ভারতের সকল রাজ্য বা জনপদ ষোড়শ মহাজনপদের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি।[৮২] তাছাড়া, ষোড়শ জনপদের অধিকাংশই গাঙ্গেয় উপত্যকায় অবস্থিত ছিল। এতে বোঝা যায়, ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রে গঙ্গা-উপত্যকায় অবস্থিত জনপদগুলোর ভূমিকাই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়টি সাক্ষ্য দেয় যে, ভারতের ঐ অঞ্চলে তখন রাষ্ট্র-কাঠামো দ্রুত বিকাশ লাভ করছিল।

সমীক্ষায় দেখা যায়, জনপদগুলো বসবাসরত জাতিগোষ্ঠির নামানুসারে পরিচিতি লাভ করে। এ প্রসঙ্গে রীস ডেবিড্স বলেন, "It is interesting to notice that the names are names, not of countries, but of peoples, as we might say Italians or Turks."[৮৩]

(অর্থাৎ মজার বিষয় যে, নামগুলো জাতির বা জনগোষ্ঠির নাম, দেশের নাম নয়, যেমন, তুর্কী, ইতালিয়ান ইত্যাদি।)

অতএব, বলা যায়, প্রাচীন ভারতবর্ষ প্রথমে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠির বসবাসের ভৌগোলিক অবস্থান অনুসারে বিভাজিত ছিল, যা পরে রাজ্য বা জনপদ হিসেবে অভিধা লাভ করেছিল।

Dhaka University Institutional Repository

৫. জাতকে[৮৪] জনপদসমূহে উল্লেখ

জাতক গ্রন্থে জনপদসমূহ রাষ্ট্র (রট্ঠ) বা রাজ্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। জাতক গ্রন্থ সমীক্ষাপূর্বক নিম্নে কোন্ কোন্ জাতকে জনপদগুলো রাষ্ট্র হিসেবে উল্লেখ আছে তা তুলে ধরা হলো। বোঝার সুবিধার্থে বন্ধনীতে লণ্ডনের পালি টেক্সট সোসাইটি হতে প্রকাশিত জাতক গ্রন্থের খণ্ড সংখ্যা এবং পৃষ্ঠা নম্বর প্রদত্ত হলো।

৫.১. জাতকে অঙ্গুত্তরনিকায়ে বর্ণিত জনপদ

অঙ্গুত্তর নিকায়ে বর্ণিত জনপদগুলো কোন্ কোন্ জাতকে পাওয়া যায়, তা জাতক গ্রন্থ সমীক্ষার মাধ্যমে নিম্নে তুলে ধরা হলো :

অঙ্গ : চম্পেয্য জাতক (IV. p. 454), সোননন্দ জাতক (V. p. 316), বিদূরপণ্ডিত জাতক (VI. p. 271), ভূরিদত্ত জাতক (VI. p. 203), গূথপাণজাতক (II. p. 211) ।

মগধ : লক্খণ জাতক (I. p. 143), কণ্ডিনজাতক (I. p. 154), তিপলত্থমিগজাতক (I. p. 162), কুলাবক জাতক (I. p. 199), মঙ্গলজাতক (I. p. 373), দুম্মেধজাতক (I. p. 444), সালিকেদারজাতক (IV. p. 276), চম্পেয্যজাতক (IV. p. 454), সোননন্দ জাতক (V. p. 316), মহানারদকস্সপ জাতক (VI. p. 220)।

কাশী : ভোজাজানিয় জাতক (I. p. 178ff), অপন্নক জাতক (I. p. 98), বণ্ণুপথ জাতক (I. p.107), চূল্লকসেট্ঠি জাতক (I. p.120), তণ্ডুলনালি জাতক (I. p.124), দেবধম্ম জাতক (I. p. 127), বেলুকজাতক (I. p. 245), মহাসীলবজাতক (I. p. 262), মুদুলক্খণজাতক (I. p. 303), ভীমসেনজাতক (I. p. 357), বব্বুজাতক (I. p. 478), গগ্গজাতক (II. P.15), দূভিয়মক্কটজাতক (II. p.70), দধিবাহনজাতক (II. p. 101), মিত্তামিত্তজাতক (II. p. 131), গহপতিজাতক (II. p. 134), খন্ধবত্তজাতক (II. p. 145), অস্সকজাতক (II. p. 155), উচ্ছিট্ঠভত্তজাতক (II. p. 167), সুনখজাতক (II. p. 246), বীতিচ্ছজাতক (II. p. 257), কপিজাতক (II. p. 269), তিরীটবচ্ছজাতক (II. p. 314), কচ্ছপজাতক (II. p. 359), সিরিজাতক (II. p. 411), খন্তিবাদজাতক (III. p. 42), অননুসোচিয়জাতক (III. p. 93), কেসবজাতক (III. p. 142), মিগপোতকজাতক (III. p. 213), ধম্মদ্ধজজাতক (III. p. 267), সূচিজাতক

Dhaka University Institutional Repository

(III. p. 281), তুণ্ডিলজাতক (III. p. 292), ধজবিহেটজাতক (III. p. 304), সূসীমজাতক (III. p. 391), কুম্মাসপিণ্ডজাতক (III. p. 406), সমুগ্গজাতক (III. p. 527), কণ্‌হদীপায়নজাতক (IV. p. 28), মহাধম্মপালজাতক (IV. p. 50), পানীয়জাতক (IV. p. 114), চূল্লনারদজাতক (IV. p. 220), ভিক্‌খাপরম্পরাজাতক (IV. p. 370), মাতঙ্গজাতক (IV. p. 377), হত্থিপালজাতক (IV. p. 476), ছদ্দন্তজাতক (V. p. 41), অলম্বুসজাতক (V. p. 152), নলিনিজাতক (V. p. 193), মহাবোধিজাতক (V. p. 227), মুগপক্‌খজাতক (VI. p. 3), ভূরিদত্তজাতক (VI. p. 160)।

কোশল : লোসক জাতক (I. p. 234), উচ্ছঙ্গজাতক (I. p. 306), মচ্ছজাতক (I. p. 329), বৃহাচ্ছত্তজাতক (III. p. 116), নন্দিয়মিগজাতক (I. p. 270), ভিসপুপ্‌ফজাতক (I. p. 307), সংবরজাতক (IV. p. 130), সোননন্দজাতক (V. p. 315), কুণালজাতক (IV. p. 425)।

বজ্জি : মহানারদকস্‌সপজাতক (VI. p. 239)।

মল্ল : কুসজাতক (V. p. 278)।

চেদি বা চেতিয় : বেদব্বজাতক (I. p. 253), চেতিয়জাতক (III. p. 454), সংকিচ্চিজাতক (V. pp. 267, 273)।

বংশ বা বংস : কণ্‌হদীপায়নজাতক (IV. p. 28), মহানারদকস্‌সপজাতক (VI. pp. 236, 237)।

কুরু : কামনীতজাতক (II. p. 214), ধূমকারিজাতক (III. p. 400), দসব্রাহ্মণজাতক (IV. p. 361), সোমনস্‌সজাতক (IV. p. 444), সম্ভবজাতক (V. p. 57), মহাসুতসোমজাতক (V. pp. 457, 474, 484), বিদূরপণ্ডিতজাতক (VI. p. 255)।

পঞ্চাল : ব্রহ্মদত্তজাতক (III. p. 81)।

মচ্চ বা মৎস : বিদূরপণ্ডিতজাতক (VI. p. 280)।

সূরসেন বা শূরসেন : বিদূরপণ্ডিতজাতক (VI. p. 280)।

অস্‌সক : অস্‌সকজাতক (II. p. 155), চূল্লকালিঙ্গজাতক (III. p. 3)।

অবন্তি : ইন্দ্রিয়জাতক (III. p. 463), চিত্তসম্ভূতজাতক (IV. p. 390), সরভঙ্গজাতক (V. p. 133)।

গান্ধার : নন্দিবিসালজাতক (I, p. 191), অসাতমন্তজাতক (I. p. 285), বরণজাতক (I. p. 317), সরম্ভজাতক (I. p. 375), তেলপত্তজাতক (I. p. 395), সুসীমজাতক (II. p. 47), দুতিয়পলায়িজাতক (II, p. 219), পলায়িজাতক (II. p. 217), গন্ধারজাতক (III. p. 364),

Dhaka University Institutional Repository

জুণ্হজাতক (IV. p. 98), বেস্সন্তরজাতক (VI. p. 501)।

কম্বোজ : চম্পেয্যজাতক (IV. p. 465), কুণালজাতক জাতক (V. p. 446), ভূরিদত্তজাতকে (VI. p. 208)।

৫.২. জাতকে উল্লেখিত অন্যান্য জনপদ

উপরে বর্ণিত জনপদগুলো ছাড়াও জাতকে আরো কিছু জনপদ রাজ্য (রট্ঠ) বা দেশ হিসেবে উল্লেখ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে কতিপয় জনপদ চূল্লনিদ্দেস, মহাবস্তু এবং জৈন ভাগবতী সূত্রে বর্ণিত জনপদের সঙ্গে মিল পাওয়া যায়। নিম্নে জাতক গ্রন্থ সমীক্ষপূর্বক তা তুলে ধরা হলো :

সুম্ম বা সুম্ভ : তেলপত্ত জাতকে (I. p. 393)।

কংসভোগ (**কংশভোগ**) **:** ঘটজাতক (IV. p. 79)।

দক্ষিণগিরি : নন্দজাতক (I. p. 224) এবং আরমদূসকজাতকে (II. P. 345)।

বিদেহ/বেদেহ : মখাদেব জাতক (I. p. 137), বিনীলকজাতক (II. p. 39), গন্ধারজাতক (III. p. 363), কুম্ভকারজাতক (III. p. 378), সাধীনজাতক (IV. p. 355), সংখপালজাতক (V. p. 164) এবং মহাজনকজাতক (VI. p. 30)।

উত্তরপঞ্চাল : কুম্ভকারজাতক (III. p.379)।

একবল : মহাউম্মগ্গজাতক (VI. p. 390)।

কাশ্মির : গান্ধারজাতকে (III. p. 365)।

কলিঙ্গ : কুরুধম্মজাতক (II. p. 367), চূল্লকালিঙ্গজাতক (III. p. 3), কুম্ভকারজাতক (III. p. 376), তিত্তিরজাতক (III. p. 540), কালিঙ্গবোধিজাতক (IV. p. 230), সরভঙ্গজাতক (V. p. 144), বেস্সন্তরজাতক (VI. p. 487)।

ককেয় : কামনীজাতক (II. p. 214) ককেয় নামক লাষ্ট্রের উল্লেখ আছে।

কোকালিক : ব্যগ্ঘজাতক (II. 356), তক্কারিয়জাতক (IV. p. 242)।

কোটুম্বর : মহাজনকজাতক (VI. p. 51)।

ভরুদেশ : ভরুজাতক (II. p. 171)।

মেজ্ঝদেশ বা মেজ্ঝরট্ঠ : মাতঙ্গজাতক (IV. p. 388)।

শিবি : ইন্দ্রিয়জাতক (III. p. 467), শিবিজাতক (IV. p. 401), উম্মদন্তীজাতক (V. p. 218),

Dhaka University Institutional Repository

মহাউম্মগ্গজাতক (VI. p. 419)।

দমিল : অকীত্তিজাতক (IV. p. 238) এবং পেতবত্থু গ্রন্থের অট্‌ঠকথা পরমত্থদীপনী (IV. p. 133)।

দর্শান : মহানারদজাতক (VI, p. 239)।

মলয় বা মল : পঞ্চুপোসথজাতক (IV. p. 327)।

ভগ্গ জনপদ : ধোনসাখজাতক (III. p. 157)।

সুবীর : আদিত্তজাতক (III. 470)।

জাতক সমীক্ষায় দেখা যায়, ষোড়শ জনপদ ছাড়াও ভারতবর্ষে আরো অনেক জনপদ ছিল, যেগুলো জাতকে দেশ বা রাষ্ট্র হিসেবে উল্লেখ আছে। ফলে প্রাচীন ভারতবর্ষ ষোড়শ জনপদের চেয়ে অধিক সংখ্যক জনপদে যে বিভক্ত ছিল তা অনুমান করা যায়। সমীক্ষায় দেখা যায়, জাতকে কাশী রাজ্যের নাম সবচেয়ে বেশি উল্লেখ আছে। তৎপর, অঙ্গ, মগধ, কোশল, কুরু, গান্ধার, বিদেহ প্রভৃতি রাজ্যের বা জনপদের নাম অধিক উল্লেখ পাওয়া যায়। ফলে জাতকগুলো রচনাকালীন সময়ে কাশী, কোশল, অঙ্গ, মগধ, কুরু, গান্ধার প্রভৃতি জনপদগুলো যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা সহজে ধারণা করা যায়। ফলে, বলা যায়, ষোড়শ জনপদে কেবল শক্তিশালী রাজ্য বা জনপদসমূহই নির্দেশ করা হয়েছে।

৬. জনপদসমূহের বিভাজন : প্রধান নগর বা অঞ্চলসমূহ

পালি এবং বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্য সাক্ষ্য দেয় যে, ষোড়শ জনপদের অধিকাংশই বুদ্ধ এবং তাঁর শিষ্যগণ ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে পরিভ্রমণ করেছিলেন। এসব জনপদের কোনো কোনো নগর বা স্থান বুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত হওয়ায় ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে।[৮৫] বুদ্ধের বা তাঁর শিষ্যগণের বিচরণক্ষেত্র হিসেবে জাতকে বিক্ষিপ্তভাবে জনপদসমূহের বিভিন্ন নগর বা স্থানের নামোল্লেখ থাকলেও জনপদসমূহের বিভাজন সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ পাওয়া যায় না। জাতক ছাড়াও, অন্যান্য পালি গ্রন্থে এবং বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যে বুদ্ধের জীবন ও ধর্মীয় কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত বহু নগর বা স্থানের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। এসব নগর বা স্থান কোন্ জনপদের অন্তর্গত ছিল তা নির্ণয়ের মাধ্যমে জনপদসমূহের বিভাজন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যেতে পারে। প্রথমে পালি এবং বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যে প্রাপ্ত তথ্য সমীক্ষা করা হবে। তৎপর কোন্ জাতকে এসব নগর বা স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায় তা চিহ্নিত করা হবে। অতপর, নগর বা স্থানসমূহ কোন্ জনপদের অন্তর্গত তা নির্ধারণ ও বিন্যস্ত করে প্রাচীন ভারতবর্ষের জনপদ বা রাষ্ট্রসমূহের বিভাজন নির্দেশ করা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষত, পালি সুত্তপিটক এবং বিনয় পিটকে বুদ্ধ কোথায় হতে কোথায় গিয়েছিলেন এ সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। নিম্নে এসব তথ্য বিচার-বিশ্লেষণপূর্বক জনপদসমূহের নগর বা অঞ্চলসমূহ চিহ্নিত করা হবে।

৬.১. বিনয়পিটকের তথ্য সমীক্ষা

মহাবর্গের[৮৬] ২৪তম অধ্যায়ে বুদ্ধের ধর্ম প্রচার জীবনের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ অধ্যায় মতে, বুদ্ধ উরুবেলাগ্রামের নৈরঞ্জনা নদীর তীরে বোধিবৃক্ষের নীচে বুদ্ধত্ব লাভ করেন। তৎপর তিনি বারাণসীতে গিয়ে পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের নিকট ধর্মপ্রচার করেন এবং সেখানে যশ ও তাঁর বন্ধুদের দীক্ষা দান করেন। সেখান থেকে তিনি উরুবেলা গিয়ে কশ্যপ ভ্রাতৃদ্বয়কে দীক্ষা দান করে। তৎপর গয়াশীর্ষ হয়ে রাজগৃহে গিয়ে রাজা বিম্বিসার, সারিপুত্র এবং মৌদ্‌গল্যায়নকে দীক্ষা দান করেন। তবে মহাবর্গের প্রথম হতে দশম অধ্যায়েও বুদ্ধ কোথায় হতে কোথায় গিয়েছিলেন তার উল্লেখ পাওয়া যায়। নিম্নে এসব অধ্যায়ে বর্ণিত তথ্য পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, বুদ্ধ রাজগৃহ, দক্ষিণগিরি, কপিলাবস্তু, শ্রাবস্তী, (রাজগৃহের) গিজ্ঝকূট, চোদনাবত্থু, বারাণসী, ভদ্দিয় অন্ধকবিন্ধ, পাটলীগ্রাম, কোটিগ্রাম, ঞাতিক, বৈশালী, অঙ্গুত্তরাপ, আপন, কুশিনারা, আতুমা, চম্পা, কোশাম্বী, বালকলোণকারগ্রাম, প্রাচীনবংসদায়, পারিল্যেক প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করেন এবং তথায় অবস্থানপূর্বক ধর্ম দেশনা করেন।

চূল্লবর্গের [৮৭] পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও দশম অধ্যায়ে বুদ্ধের বিচরণকৃত স্থানসূহের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ গ্রন্থ মতে, বুদ্ধ রাজগৃহ, বৈশালী, ভগ্‌গ, সুংসুমারগিরি, শ্রাবস্তী, কিটাগিরি, আলবী, অনুপ্রিয় (মল্ল), কোশাম্বী, কপিলাবস্তু প্রভৃতি স্থানে অবস্থানপূর্বক ধর্ম দেশনা করেন।

সুত্তবিভঙ্গ[৮৮] নামক গ্রন্থে বুদ্ধ বেরঞ্জ, সোরেয়্য, সাংকশ্য, কর্ণকুব্জ, প্রয়াগ, বারাণসী, আলবী, কোসাম্বী, চেতি প্রভৃতি স্থানে গমনের কথা উল্লেখ আছে।

৬.২. সুত্তপিটকের তথ্য সমীক্ষা

সুত্তপিটকের অন্তর্গত গ্রন্থসমূহেও বুদ্ধের বিচরণ ক্ষেত্র ও ধর্ম দেশনার স্থানসমূহের নামোল্লেখ পাওয়া যায়, যা সমীক্ষাপূর্বক নিম্নে তুলে ধরা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

মহাপরিনির্বাণ সূত্রে[৮৯] বুদ্ধ রাজগৃহ, নালন্দা, পাটলীগ্রাম, কোটিগ্রাম, নাদিক, বৈশালী, বেলুব, ভণ্ডগ্রাম, হস্তিগ্রাম, অম্বগ্রাম, জম্বুগ্রাম, ভোগনগর, পাবা, কুশিনারা প্রভৃতি স্থানে গমন করেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাপরিনির্বাণ সূত্রে বর্ণিত পথপরিক্রমার সঙ্গে মহাবর্গের বর্ণনার মিল পাওয়া যায়।

সংযুক্তনিকায়ে[৯০] বুদ্ধ শ্রাবস্তী, কোসল, মল্ল, বজ্জি, কাসী, মগধ প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণের কথা বর্ণিত আছে।

সুত্তনিপাতের পরায়নবর্গের[৯১] ভূমিকায় বুদ্ধ পট্ঠান (অলক এর রাজধানী), মহিস্মতি (মহিস্সতি), উজ্জেনী, গোনদ্ধ, বেদিশা, বনস, কোশাম্বী, সাকেত এবং শ্রাবস্তী গমন কথা উল্লেখ আছে।

এগুলো ছাড়াও নিকায় গ্রন্থে [৯২] বিক্ষিপ্তভাবে আরো অনেক স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়, যেখানে অবস্থান পূর্বক বুদ্ধ ধর্ম দেশনা করেছিলেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : কজঙ্গল, অস্সপুর, গয়া, চালিক, কিম্বিল, উক্কাচেলা, কোলিয়, ইচ্ছানঙ্গল, কম্মাসদম্ম, ভদ্দবর্তিকা, উত্তর কুরু, দক্ষিণ কুরু।

বিনয়পিটক এবং সুত্তপিটকে বর্ণিত বুদ্ধের বিচরণ ক্ষেত্রের নামগুলো সাজালে নিম্নরূপ দাঁড়ায় :
চম্পা, কজঙ্গল, অস্সপুর, ভদ্দিয়, কোটিগ্রাম, অঙ্গুত্তরাপ, আপন, রাজগৃহ, দক্ষিণগিরি, চোদনবত্থু, অন্দকবিন্দ, চালিক, উক্কাচেলা, বিদেহ, পাটালীগ্রাম, নালন্দা, উরুবেলা, গয়াশীর্ষ, কিম্বিল, বৈশালী, ঞাতিক, বেলুব, ভণ্ডগ্রাম, হস্তিগ্রাম, অম্বগ্রাম, জম্বুগ্রাম, ভোগনগর, পাবা, অনুপ্রিয়, কুশিনারা, শ্রাবস্তী, ইচ্ছানঙ্গল, সাকেত, কপিলাবস্তু, আতুমা, বেরঞ্জা, বারাণসী, কিটাগিরি, আলবী, কোশাম্বী, বালকলোনকারাগ্রাম, পারিলেয়্যক, ভগ্গ (সুংসুমারগিরি), কম্মাসদম্ম, প্রয়াগ, প্রাচীনবংসদায়, ভদ্দবর্তিকা, সোরেয়্য, সংকাশ্য, কর্ণকুব্জ, উত্তর কুরু, দক্ষিণ কুরু।

৬.৩. জাতকের তথ্য পর্যালোচনা

ইতোপূর্বে অঙ্গুত্তর নিকায়, চূল্লনিদ্দেস, মহাবস্তু এবং জৈন ভাগবতী সূত্রে বর্ণিত জনপদসমূহ কোন্ কোন্ জাতকে পাওয়া যায় তা সমীক্ষা করেছি এবং সেগুলো ছাড়াও জাতকে আর কি কি জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায় তাও চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছি। এখন জাতকে জনপদসমূহের অন্তর্গত কোন্ কোন্ নগর বা স্থানের নামোল্লেখ আছে তা সমীক্ষাপূর্বক নিম্নে উপস্থাপন করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

চম্পা নগর : চম্পেয্যজাতক (IV. p. 454); মহাজনকজাতক (VI, p. 32)।

ভদ্দিয় নগর : মহাপনাদজাতক (II. p. 331); খণ্ডহালজাতক (VI. p. 135)।

কোটিগ্রাম : মহাপনাদজাতক (II. 332)।

অস্‌সপুর নগর : চেতিয়জাতক (III. 460)।

রাজগৃহ নগর : অপণ্নকজাতক (I. p. 96), চূল্লকসেট্‌ঠিজাতক (I. p. 114), লক্‌খণজাতক (I. p. 142), নিগ্রোধমিগজাতক (I. p. 145), বাতমিগজাতক (I. p. 155), তিপল্লত্থমিগজাতক (I. p. 162), মহিলামুখ জাতক (I. p. 186) তিত্থিরজাতক (I. p. 217), ইল্লীসজাতক (I. p.345), মঙ্গলজাতক (I. p. 372), মহাসুদস্‌সনজাতক (I. p. 391), দুম্মেধজাতক (I. p. 444), অসম্পাদন জাতক (I, p. 466), সিগালজাতক (I. p. 489), সঞ্জীবজাতক (I. p. 508), উপসাল্‌হজাতক (II. p. 55), সমিদ্ধিজাতক (II. p. 56), কাসাবজাতক (II. p. 196), সতপত্থজাতক (II. p. 387), পুচিমন্দজাতক (III. p. 33), কুটিদূসকজাতক (III. p. 71), দরীমুখজাতক (III. p. 238), সুবণ্নকক্কটক জাতক (III. p. 293), গন্ধারজাতক (III. p.363), দীপিজাতক (III. p. 479), নিগ্রোধজাতক (IV. p. 37), মহামঙ্গলজাতক (IV. p. 72), ভদ্দসালজাতক (IV. p. 152), সালিকেদারজাতক (IV. p. 276), সরভঙ্গজাতক (V. p. 125), সঙ্খপালজাতক (V. p. 161), সোনকজাতক (V. p. 247), চূল্লহংসজাতক (V. p. 234), মহানারদজাতক (VI. p. 236), বিদূরপণ্ডিতজাতক (VI. p. 271), বেস্‌সন্তরজাতক (VI. p. 479)।

বৈশালী নগর : তিত্থিরজাতক (I. p. 217), লোমহংসজাতক (I. p. 389), বাহিযজাতক (I. p. 120), একপণ্নকজাতক (I. p. 504), সিগালজাতক (II. p. 5), মূলপরিযাযজাতক (II. p. 259), তেলোবাদ জাতক (II. p. 262), অব্‌ভন্তরজাতক (II. p. 392), চূল্লকালিঙ্গজাতক (III. p.1), ভদ্দসালজাতক (IV. p. 148)।

অন্দকবিন্দ : সেরিবানিজজাতক (I. p. 111), ঘটজাতক (IV. p. 81), কুম্ভজাতক (V. p. 19), সংকিচ্ছজাতক (V. p. 267)।

গয়াশীর্ষে : লক্‌খণজাতক (I. p. 142), বিনীলকজাতক (II. p. 38), কাসাবজাতক (II. p. 196), মহাকণ্‌হজাতক (IV. p. 180)।

দক্ষিণগিরি : নন্দজাতক (1. 224), আরমদূসকজাতক (II. 345)।

হস্তিনগর : চেতিয়জাতক (III. 460)।

পাবা : কুণালজাতক (V. p. 443)।

অনুপ্রিয় নগর : সুখবিহারীজাতক (I. p. 140)।

কুশিনারা নগর : মহাসুদস্‌সনজাতক (I. p. 391), ভদ্দসালজাতক (IV. p. 148)।

উরুবেলা নগর : মহাকণ্‌হজাতক (IV. p. 180)।

শ্রাবস্তী নগর : অপণ্নকজাতক (I. p. 95), বণ্ণুপথজাতক (I. 106), মকসজাতক (I. p. 246), নক্‌খত্তজাতক (I. p. 257), পুণ্নপাতিজাতক (I. p. 268), কণ্ডনক্‌খন্ধজাতক (I. p. 276),

Dhaka University Institutional Repository

মুদুলক্খণজাতক (I. p. 303), কুদ্দালজাতক (I. p. 311), মচ্ছজাতক (I. 330), অসংকিযজাতক (I. p. 333), ইল্লীসজাতক (I. 349), অথস্সদ্বারজাতক (I. p. 336), কিম্পক্কজাতক (I. p. 367), সারম্ভজাতক (I. p. 374), অকতঞ্ঞুজাতক (I. p. 377), কূটবাণিজজাতক (I. p. 404), ভেরীজাতক (I. 412), কুণ্ডকপূবজাতক (I. p. 422), বট্টকজাতক (I. p. 432), কুসিযজাতক (I. p. 463), চণ্ডালভজাতক (I. p. 474), কাকজাতক (I. p. 497), সিগালজাতক (I. p. 501); উরগজাতক (II. p. 12), সুসীমজাতক (II. p. 45), কল্যাণধম্মজাতক (II. p. 63), তিণ্ডুকজাতক (II. p. 76), কচ্ছপজাতক (II. p. 79), দুদ্দদজাতক (II. p. 85), সংগামাবচরজাতক (II. p. 92), অনভিরতিজাতক (II. p. 99), মিত্তামিত্তজাতক (II. p. 130), কাসাবজাতক (II. p. 197), পলাযিজাতক (II. p. 216), বীণাথূণজাতক (II. p. 224), অসিতাভূজাতক (II. p. 229), বীতিচ্ছজাতক (II. p. 257), সংকপ্পজাতক (II. p. 271), কুণ্ডককুচ্ছিসিন্ধবজাতক (II. p. 286), অরুন্দপানজাতক (II. 295), মন্ধাতুজাতক (II. p. 310), মহাপনাধজাতক (II. p. 331), বাতগ্গসিন্ধবজাতক (II. p. 337), কক্কাটজাতক (II. p. 341), মহিসজাতক (II. 385), সতপত্থজাতক (II. p. 387), পুটদূসকজাতক (II. p. 390), অব্ভন্তরজাতক (II. p. 292), কাযবিচ্ছিন্দজাতক (II. p. 436); চূল্লকালিঙ্গজাতক (III. p. 2), সুজাতজাতক (III. p. 20), সয্হজাতক (III. p. 30), কস্সপমন্দিযজাতক (III. p. 36), লোহকুম্ভিজাতক (III. p. 43), মংসজাতক (III. p. 48), সসজাতক (III. p. 51), সুচ্চজজাতক (III. p. 66), কুটিদূসকজাতক (III. p. 72), চম্মসাটকজাতক (III. p. 82), ব্রহাচ্ছত্তজাতক (III. p. 115), সুজাতজাতক (III. p. 155), ঘটজাতক (III. 168), সুবণ্নমিগজাতক (III. p. 182), অহিগুণ্ডিকজাতক (III. p. 299), কুম্ভকারজাতক (III. p. 375), ধূমকারিজাতক (III. p. 400), জাগরজাতক (III. 403), কুম্মাসপিণ্ডজাতক (III. p. 405), পরন্তপজাতক (III. p. 424), ইন্দ্রিয়জাতক (III. p. 461), মহাসুখজাতক (III. p. 490), পদকুসলমাণবজাতক (III. p. 501); সংখজাতক (IV. p. 15), মট্টকুণ্ডলিজাতক (IV. p. 59), দসরথজাতক (IV. p. 123), ভদ্দসালজাতক (IV. p. 144), সমুদ্দবাণিজজাতক (IV. p. 158), কামজাতক (IV. p. 167), মহাপদুমজাতক (IV. 187), অম্বজাতক (IV. 200), সরভমিগজাতক (IV. p. 264), মহাউক্কুসজাতক (IV. p. 288), সুরুচিজাতক (IV. p. 314), মহাবাণিজজাতক (IV. p. 351), ভল্লাটিয়জাতক (IV. p. 437); কুম্ভজাতক (V. p. 11), ছদ্দন্তজাতক (V.p. 36), উম্মদন্তীজাতক (V. p. 209), সংকিচ্ছজাতক (V. p. 262), কুসজাতক (V. p. 278), সুধাভোজনজাতক (V. p. 382), কুণালজাতক (V. p. 413) ; সামজাতক (VI. p. 68), ভূরিদত্তজাতক (VI. p.; 157)।

কপিলাবস্তু নগর : সম্মোদমানজাতক (I. p. 208), কণ্হজাতক (IV. p. 6), মহাধম্মপালজাতক (IV. p. 50), ভদ্দসালজাতক (IV. p. 145), চন্দকিন্নরজাতক (IV. p. 282), কুণালজাতক (V. p. 415), বেস্সন্তরজাতক (VI. p. 479)।

Dhaka University Institutional Repository

বারাণসী নগর : অপণ্নকজাতক (I. p. 98), বণ্ণুপথজাতক (I. p. 107), চূল্লকসেট্ঠিজাতক (I. p. 120), তণ্ডুলনালীজাতক (I. p. 124), দেবধম্মজাতক (I. p. 127), সুখবিহারিজাতক (I. p. 140), নিগ্রোধমিগজাতক (I. p. 149), বাতমিগজাতক (I. p. 157), খরাদিয়জাতক (I. p. 159), মতকভত্তজাতক (I. p. 166), কুরুঙ্গমিগজাতক (I. p. 173), কুক্কুরজাতক (I. p. 175), ভোজাজানিয়জাতক (I. p. 178), অজঞ্ঞজাতক (I. p. 181), তিত্থিরজাতক (I. p. 184), মহিলামুখজাতক (I. p. 186), অভিণ্হজাতক (I. p. 189), কণ্হজাতক (I. p. 194), মুণিকজাতক (I. p. 196), কুলাবকজাতক (I. p. 205), সম্মোদমানজাতক (I. p. 208), মচ্ছজাতক (I. p. 210), সকুণজাতক (I. p. 216), নন্দজাতক (I. p. 224), খদিরঙ্গারজাতক (I. p. 231), লোসকজাতক (I. p. 239), কপোতজাতক (I. p. 242), বেলুকজাতক (I. p. 245), মকসজাতক (I. p. 247), আরামদূসকজাতক (I. p. 250), বারুণিজাতক (I. p. 252), নক্খত্তজাতক (I. p. 257), দুম্মেধজাতক (I. p. 259), মহাসীলবজাতক (I. p. 261), পুণ্নপাতিজাতক (I. p. 269), পঞ্চবুধজাতক (I. p. 272), তযোধম্মজাতক (I. p. 280), ভেরিবাদজাতক (I. p. 283), অন্ধভূতজাতক (I. p. 289), তক্কজাতক (I. p. 295), দুরাজানজাতক (I. p. 299), মুদুলক্খণজাতক (I. p. 303), বিসবন্তজাতক (I. p. 310), সীলবনাগজাতক (I. p. 319), সচ্চংকিরজাতক (I. p. 323), অসংখিযজাতক (I. p. 333), খরস্সরজাতক (I. p. 354), সুরাপাণজাতক (I. p. 361), কিমপক্কজাতক (I. p. 368), সীলবিমংসনজাতক (I. p. 370), কুহকজাতক (I. p. 375), অকতঞ্ঞূজাতক (I. p. 378), মহাস্সরজাতক (I. p. 383), বিস্সাসভোজনজাতক (I. p. 387), তেলপত্তজাতক (I. p. 395), কূটবাণিজজাতক (I. p. 404), অস্সতরুপজাতক (I. p. 407), পণ্ণিকজাতক (I. p. 411), দুব্বলকট্ঠজাতক (I. p. 415), সালিত্তকজাতক (I. p. 418), বাহিয়জাতক (I. p. 421), সীগালজাতক (I. p. 425), মিতচিন্তিজাতক (I. p. 427), দুব্বচজাতক (I. p. 430), অকালরাবিজাতক (I. p. 436), দুম্মেধজাতক (I. p. 445), অসিলক্খণজাতক (I. p. 455), কোসিয়জাতক (I. p. 463), ঝানসোধনজাতক (I. p. 473), বব্বুজাতক (I. p. 478), নঙ্গুট্ঠজাতক (I. p. 493), একপণ্নজাতক (I. p. 504); রাজোবাদজাতক (II. p. 3), সীগালজাতক (II. p. 6), সূকরজাতক (II. p. 10), উরগজাতক (II. p. 13), গগ্গজাতক (II. p. 15), অলীনচিত্তজাতক (II. p. 18), গুণজাতক (II. p. 26), সুহনুজাতক (II. p. 30), মোরজাতক (II. p. 33), ইন্দসমানগোত্তজাতক (II. p. 41), সুসীমজাতক (II. p. 46), গিজ্ঝজাতক (II. p. 50), নকুলজাতক (II. p. 52), সমিদ্ধিজাতক (II. p. 57), সুকণগ্গিজাতক (II. p. 59), কল্যাণধম্মজাতক (II. p. 64), মক্কটজাতক (II. p. 68), দূভিয়মক্কটজাতক (II. p. 70), অধিচ্চুপট্ঠানজাতক (II. p. 72), কলাযমুট্ঠিজাতক (II. p. 74), তিণ্ডুকজাতক (II. p. 76), কচ্ছপজাতক (II. p. 79), সতধম্মজাতক (II. p. 82), দুদ্দদজাতক (II. p. 85), অসদিসজাতক (II. p. 90), অনভিরতিজাতক (II. p. 100), দধিবাহনজাতক (II. p. 104), চতুমট্টজাতক (II. p. 107), সীলানিসংসজাতক

Dhaka University Institutional Repository

(II. p. 112), চূল্লপদুমজাতক (II. p. 118), মণিচোরজাতক (II. p. 121), পব্বতূপত্থরজাতক (II. p. 125), মিত্তামিত্তজাতক (II. p. 131), রাধজাতক (II. p. 134), সাধুসীলজাতক (II. p. 137), কেলিসীলজাতক (II. p. 142), খন্ধবত্তজাতক (II. p. 145), বীরকজাতক (II. p. 149), কুরুঙ্গমিগজাতক (II. p. 153), সুংসুমারজাতক (II. p. 158), কক্কারজাতক (II. p. 161), সোমদত্তজাতক (II. p. 165), কচ্ছপজাতক (II. p. 175), গরহিতজাতক (II. p. 184), পুটভত্তজাতক (II. p. 203), পলায়িজাতক (II. p. 217), তিলমুট্ঠিজাতক (II. p. 277), আরামদূসকজাতক (II. p. 345), সুপত্তজাতক (II. p. 433), অন্তজাতক (II. p. 440), বকজাতক (II. p. 450); দদ্দরজাতক (III. p. 16), সীলবীমংসজাতক (III. p. 18), পলাসজাতক (III. p. 23), রাজোবাদজাতক (III. p. 110), বানরজাতক (III. p. 133), সিরিকালকণ্নিজাতক (III. p. 257), ধজবিহেঠজাতক (III. p. 303), অট্ঠিসেনজাতক (III. p. 352), অট্ঠসদ্দজাতক (III. p. 428), পদকুসলমাণবজাতক (III. p. 501); চতুদ্বারজাতক (IV. p. 1), চূল্লবোধিজাতক (IV. p. 22), বিলরিকোসিয়জাতক (IV. p. 62), চক্কবাকজাতক (IV. p. 70), কামজাতক (IV. p. 168); মহাকপিজাতক (V. p. 68), সোনকজাতক (V. p. 261), মহাহংসজাতক (V. p. 380), কুণালজাতক (V. p. 426), মহাসুতসোমজাতক (V. p. 465); মূগপক্খজাতক (VI. p. 17), নিমিজাতক (VI. p. 99), ভূরিদত্তজাতক (VI. p. 165), মহানারদকস্সপজাতক (VI. p. 227)।

বিদেহ নগর : গন্ধারজাতক (III. p. 366), মাতিপোসকজাতক (IV. p. 94), ছদ্দন্তজাতক (V. p. 47), গণ্ডতিন্দুজাতক (V. p. 102), মহাউম্মগ্গজাতক (VI. p. 330)।

কিটাগিরি : সতপত্থজাতক (II. p. 387)।

বেরঞ্জা নগর : চূল্লসুখজাতক (III. p. 494)।

আলবী নগর : তিপল্লত্থমিগজাতক (I. p. 160), মণিকণ্ঠজাতক (II. p. 282), ব্রহ্মদত্তজাতক (III. p. 78), অট্ঠিসেনজাতক (III. p. 350)।

কোশাম্বী নগর : তিপল্লত্থমিগজাতক (I. p. 160), সুরাপানজাতক (I. p. 360), তিত্থিরজাতক (III. p. 64), দল্হধম্মজাতক (III. 384), কোসাম্বীজাতক (III. 486), মহাসুখজাতক (III. p. 490), কণ্হদীপায়নজাতক (IV. p. 28), কুক্কুটজাতক (IV. p. 56), মাতঙ্গজাতক (IV. 375), চিত্তসম্ভূতজাতক (IV. p. 392), মহানারদকস্সপজাতক (VI. p. 237), মহাউম্মগ্গজাতক (VI. p. 375)।

বালকলোনকারাগ্রাম : কোসাম্বীজাতক (III. p. 489)।

পারিলেয়্যক : কাসাম্বীজাতক (III. p. 489), সুরুচিজাতক (IV. p. 314)।

ভগ্গ ও সুংসুমারগিরি : ধোনসাখজাতক (III. p. 157)।

কম্মাসদম্ম : মহাসুতসোমজাতক (V. p. 511)।

প্রয়াগ :নিমিজাতক (VI. p. 128)।

ভদ্দবতিকা : সুরাপানজাতক (I. p. 360)।

Dhaka University Institutional Repository

সংকাশ্য নগর : কণ্হজাতক (I. p. 193), জনাসোধনজাতক (I. p. 473), চন্দাভজাত (I. p. 174), সরভমিগজাতক (IV. p. 265)।

উত্তর কুরু : সোনন্দজাতক (V. p. 316), নিমিজাতক (VI. p. 100), বিদূরপণ্ডিতজাতক (VI. p. 279)।

মিথিলা : মহাজনপদ জাতক (VI. p. 32)।

উজ্জেনিনগর : সম্ভূতজাতক (IV. p. 39)।

অসিতঞ্জননগর : ঘটজাতক (VI. p. 79)

জাতক সমীক্ষায় দেখা যায়, সুত্তপিটক ও বিনয়পিটকে বর্ণিত অধিকাংশ নগর বা অঞ্চলের নাম জাতক গ্রন্থে উল্লেখ পাওয়া যায়, যেসব নগরে বা স্থানে বুদ্ধ পরিভ্রমণ, ধর্মদেশনা এবং বর্ষাবাস পালন করেছিলেন। তবে সুত্তপিটক ও বিনয়পিটকে বর্ণিত কিছু নগর জাতকে উল্লেখ পাওয়া যায় না, আবার জাতকে বর্ণিত কিছু নগর সুত্ত ও বিনয়পিটকে উল্লেখ পাওয়া যায় না। যাহোক, জাতক, সুত্তপিটকের অন্যান্য গ্রন্থে এবং বিনয়পিটকে বর্ণিত নগরসমূহ জনপদ বা রাষ্ট্র অনুযায়ী বিন্যাস করলে জনপদসমূহের নিম্নরূপ বিভাজন পাওয়া যায় :

জনপদ	জনপদসমূহের বিভাজন
অঙ্গ	চম্পা, ভদ্দিয়, কোটিগ্রাম, অঙ্গুত্তরাপ, আপণ।
মগধ	রাজগৃহ, দক্ষিণগিরি, চোদনবত্থু, অন্দকবিন্দ, পাটালীগ্রাম, নালন্দা, উরুবেলা, গয়াশীর্ষ।
বজ্জি	বৈশালী, ঞাতিক, বেলুব, ভণ্ডগ্রাম, হস্তিগ্রাম, অম্বগ্রাম, জম্বুগ্রাম, ভোগনগর।
মল	পাবা, অনুপ্রিয়, কুশিনারা।
কোশল	শ্রাবস্তী, কপিলাবস্তু, আতুমা, বেরঞ্জা।
কাশী	বারাণসী, কিটাগিরি, আলবী।
বংস	কোশাম্বী, বালকলোনকারাগ্রাম, পারিলেয়্যক, ভগ্গ, সুংসুমারগিরি, প্রয়াগ
চেতি	প্রাচীনবংসদায়, ভদ্দবতিকা।
পঞ্চাল	সোরেয়্য, সংকাশ্য, কর্ণকুব্জ।
কুরু	উত্তর কুরু, দক্ষিণ কুরু, কম্মাসদম্ম

উপরের সারণী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, জনপদসমূহ নগর, [৯৩] গ্রাম প্রভৃতি নিয়ে গঠিত ছিল। ফলে ধারণা করা যায়, প্রাচীন জনপদসমূহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে বিভক্ত ছিল। পরবর্তী অনুচ্ছেদে (৭ নং) জনপদসমূহ (লাল কালিতে লেখা) মানচিত্রে প্রদর্শনপূর্বক প্রাচীন ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অবস্থান প্রদর্শন করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

৭. মানচিত্রে [১৪] ষোড়শ জনপদের ভৌগোলিক অবস্থান

৮. ভারতের বর্তমান মানচিত্র [১৫]

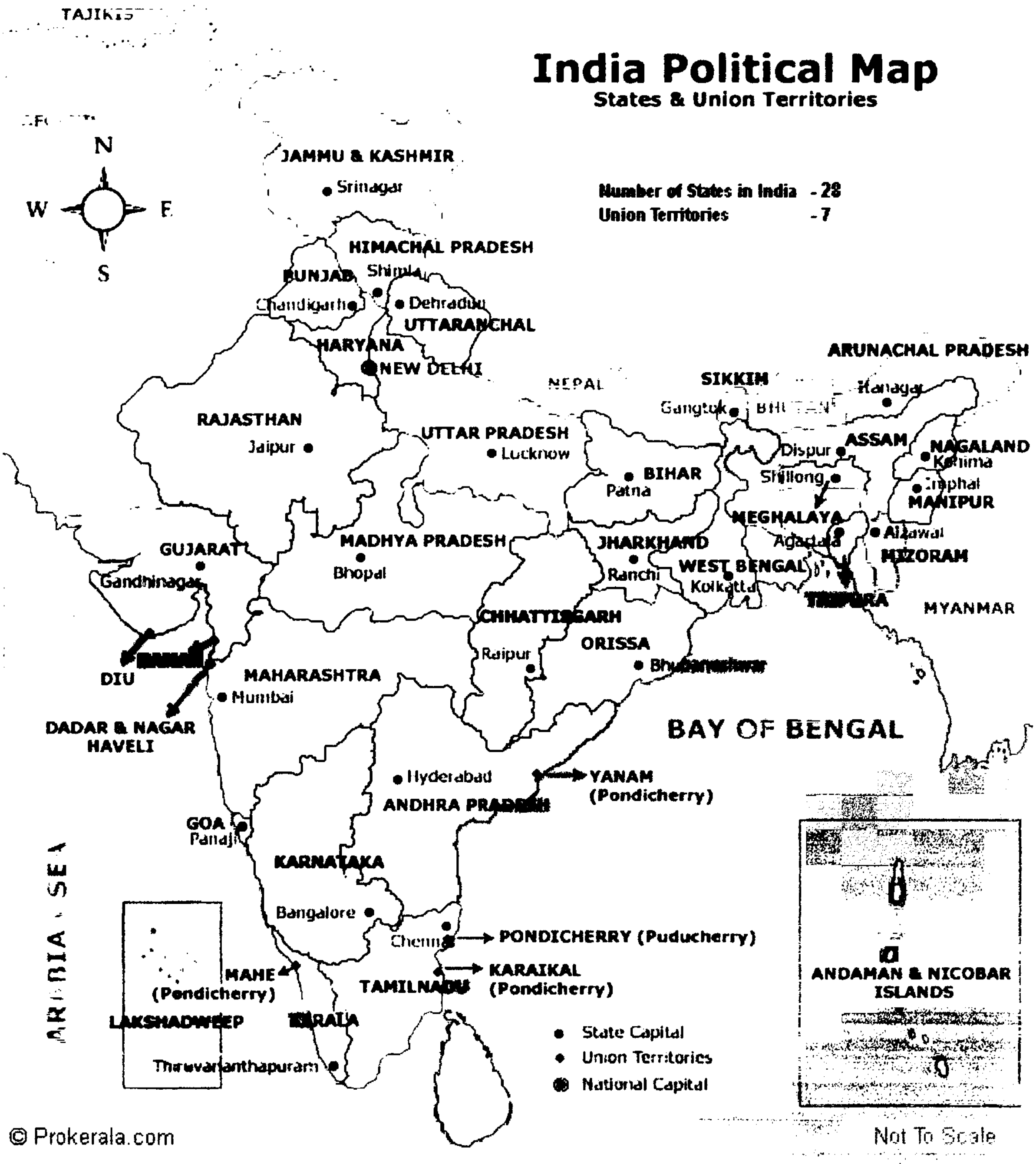

Dhaka University Institutional Repository

৯. উসংহার

উপরে বর্ণিত তথ্য পর্যালোচনা করে বলা যায়, বর্তমান ভারতবর্ষ প্রাচীনকালে জম্বুদ্বীপ, জম্বুসণ্ড, সুদর্শনদ্বীপ, সিন্ধু, সপ্ত-সিন্ধব প্রভৃতি নামে অভিহিত ছিল। কিন্তু জাতক, অন্যান্য পালি গ্রন্থ, বৌদ্ধ সংস্কৃত এবং অধিকাংশ ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে দেশটি জম্বুদ্বীপ নামেই অধিক উল্লেখিত হয়েছে। ফলে প্রাচীনকালে দেশটি যে জম্বুদ্বীপ নামে পরিচিত ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সিন্ধু নদী বা ইন্দাস নদীর তীরে অবস্থিত হওয়া দেশটি 'ইণ্ডিয়া' নামে পরিচিতি লাভ করে। রামায়ণের উল্লিখিত রাজা ভরতের নামানুসারে দেশটি ভারতবর্ষ নামে পরিচিতি লাভ করে। অঙ্গুত্তরনিকায়, চূল্লনিদ্দেস, মহাবস্তু, জৈনভাগবতী সূত্র প্রভৃতি গ্রন্থে প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ ষোলটি মহাজনপদে বিভক্ত ছিল বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু জাতকে ষোলটির অধিক জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়। এতে প্রতীয়মান হয় যে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী এবং আয়তনে বৃহৎ রাজ্য বা জনপদগুলোই ষোড়শ মহাজনপদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছিল। কারণ, উত্তর ভারতের বহু জনপদ এতে অন্তর্ভূক্ত হয়নি এবং গাঙ্গেয় উপত্যকায় অবস্থিত অধিকাংশ রাজ্য বা জনপদই ষোড়শ মহাজনপদে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এতে বোঝা যায়, ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রে গঙ্গা-উপত্যকায় অবস্থিত রাষ্ট্র বা জনপদগুলোর ভূমিকা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যেগুলোকে কেন্দ্র করে ভারতে রাষ্ট্র-কাঠামো বিকাশ লাভ করেছিল। ষোড়শ মহাজনপদসমূহ মানচিত্রে প্রদর্শন করলে প্রাচীন ভারতবর্ষের যে ভৌগোলিক অবয়ব পাওয়া যায় তা বর্তমান ভারতবর্ষের মানচিত্রের সঙ্গে মিল পাওয়া যায়। ফলে, বলা যায়, প্রাচীন ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমারেখা নানা কারণে বিভিন্ন সময় পরিবর্তিত হলেও ভৌগোলিক অবয়বের তেমন একটা পরিবর্তন সাধিত হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

[১] T. W. Rhys Davids and J. Estin Carpenter (ed), *Dīgha Nikāya*, P. T. S. London, 1911, Vol. III, p. 75.

[২] R. Morris (ed.), *Aṅguttara Nikāya*, P. T. S. London, 1885, vol. I, p. 227.

[৩] Herman Oldenberg (ed), *Vinaya Pitaka*, P. T. S. London, 1977, vol. I, p. 30.

[৪] A. C. Taylor (ed.), *Kathāvatthu*, P. T. S. London, 1894, p. 99.

[৫] J. Takakusu and M. Nagai (ed.), *Samantapāsādikā, Buddhaghosa's Commentary on the Vinaya Pitaka*, P. T. S. London, 1924, vol. I, p. 197.

[৬] J.H. Woods and D.Kosambi(ed.), *Papañcasūdanī: Majjhimanikāyaṭṭhakathā of Buddhaghosācariya*, P. T. S. Lobdon, 1922, vol. II, p. 123.

[৭] F. L. Woodward (ed.), *Sāratthappakāsinī : Buddhaghosa's Commentary on the Saṃyutta-Nikāya*, P. T. S. London, 1929, vol. I, p. 248.

[৮] I. B. Horner (ed.), *Madhuratthavilāsinī nama Buddhavaāsaṭṭhalathā*, P. T. S. London, 1946, p.48.

[৯] H. C. Norman (ed.), *The Commentary on the Dhammapada*, P. T. S. London, 1906, vol. III, p. 368.

[১০] E. Muller (ed.), *Paramatthadīpanī, Dhammapāla's Commentary on the Therīgāthā*, P. T. S. London, 1893, p. 87.

[১১] সুমঙ্গল বড়ুয়া এবং বেলু রানী বড়ুয়া (অনু.), *দীপবংস*, বাংলাদেশ রিসার্স সেন্টার ফর বুড্ডিস্ট স্টাডিজ, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৩৬।

[১২] দিলীপ কুমার বড়ুয়া ও মৈত্রী তালুকদার (অনু.), *মহাবংস*, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ১৫৭।

[১৩] পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির (অনু.), *মিলিন্দ প্রশ্ন*, ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ৩।

[১৪] Wilhelm Geiger (ed.), *Cūllavaṃsa*, P. T. S. London, 1980, vol. I, p. 36.

[১৫] ঈশানচন্দ্র ঘোষ (অনু.), জাতক, করুণা প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৩৮৫ বাংলা (পুনর্মুদ্রন), তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৫৫;V. Fausboll (ed.), *Jātaka*, Luzak & Company Ltd., vol. 3, p. 91.

[১৬] E. Senart (ed.), *Mahāvastu*, p. 67.

[১৭] R. L. Mitra (trans.), *The Lalita Vistara*, Sri Satguru Publications, Delhi, 1998, p. 24.

Dhaka University Institutional Repository

[১৮] রায় শ্রীশরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর (অনু.), *বোধিসত্ত্বাবধান-কল্পলতা*, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলিকাতা, ২০০০ (দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃ. ৯-১২।

[১৯] R.K. Mookerjee, *Asoka*, London, 1928, p. 110.

[২০] *Aṅguttara Nikāya*, op. cit., vol. I, p. 35.

[২১] Henry Clarke Warren and Dharmanada Kosambi, *Visuddhimagga of Buddhaghosācariya*, Massachuestts, 1950, pp. 205-206.

[২২] Edward Muller (ed.), *The Atthasālinī, Buddhaghosa's Commentary on the Dhammasaṅganī*, P. T. S. London, 1897, p. 298.

[২৩] *Vinaya Pitaka*, op. cit., vol. I, p. 127.

[২৪] জম্বুবৃক্ষকে নাগবৃক্ষও বলা হয়।

[২৫] D. Andersen and H. Smith (ed.), *Sutta-Nipāta*, P. T. S. London 1913, vv. 552; Helmer Smith (ed.), *Sutta-Nipāta Commentary being Paramatthajotikā*, P. T. S. London, 1916, vol. I, p. 121.

[২৬] *Brahmandapurana*, 37, 28-34; cf. B. C, Law, *Historical Geography of Ancient India*, Society of Asiatique De Paris, France, 1954, p. 9.

[২৭] R. C. Childers, *A Dictionary of the Pali Language*, Rinsen Book Company, Tokyo, 1987, p.165.

[২৮] Thomas Watters, *On Yuan Chwang's Travel in India*, Minshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd., New Delhi, 1996 (3rd ed.), pp. 33.

[২৯] Avestan Vendidad, *Cambridge History of India*, London, 1918, vol. 1, p. 324.

[৩০] *Historical Geography of Ancient India*, op. cit., p. 10.

[৩১] এখানে জাতকের নামের পাশে বন্ধনীতে লণ্ডনের পালি টেক্সট সোসাইটি হতে প্রকাশিত জাতক গ্রন্থের খণ্ড সংখ্যা এবং পৃষ্ঠা নম্বর প্রদান করা হয়েছে।

[৩২] *Vinaya Pitaka*, op. cit., vol. I, p. 197; vol. III, p. 6.

[৩৩] T. W. Rhys Davids & J. Estlin Carpenter (ed.), *The Summaṅgalavilāsinī, Buddhaghosa's Commentary on the Dīgha-Nikāya*, P. T. S. London, 1886, vol. I, p. 165.

[৩৪] *The Commentary on the Dhammapada*, op. cit., vol. III, p. 173.

[৩৫] *Sutta-Nipāta*, op. cit., vv. 976; *Sutta-Nipāta Commentary being Paramatthajotikā*, op. cit., vol. I, p. 197.

Dhaka University Institutional Repository

[৩৬] Max Walleser (ed.), *Manorathapūranī, Buddhaghosa's Commentary on the Aṅguttara Nikāya*, vol. I, P. T. S. London, 1924, p. 165.

[৩৭] A. P. Buddhadatta (ed.), *Sammoha-vinodanī, Abhidhamma-pitake Vibhaṅgaṭṭhakathā*, P. T. S. London, 1923, p. 10.

[৩৮] E. Hardy (ed.), *Dhammapāla's Paramatthadāpanā, being the Commentary on the Peta-vatthu*, P. T. S. London, 1894, pp. 100, 103.

[৩৯] *The Atthasālinī, Buddhaghosa's Commentary on the Dhammasaṅganī*, op. cit., p. 141.

[৪০] *Saddhammapajjotikā, the Commentary on the Mahāniddesa and Cūllaniddesa*, 2 vols., vol. I, P. T. S. London, 1940, p. 16.

[৪১] *Mahāvastu*, op. cit., vol. II, p. 166.

[৪২] G. P. Malalasekera, *Dictionary of Pali Proper Names*, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd, New Delhi, 1998 (3rd ed.), vol. 2, pp. 418-419.

[৪৩] *The Summaṅgalavilāsinī, Buddhaghosa's Commentary on the Dīgha-Nikāya*, op. cit., vol. I, p. 173.

[৪৪] P. L. Baidya (ed.), *Divyāvadāna*, Mithila Institue, Dharbung, 1956, pp. 21-22.

[৪৫] *Vinaya Pitaka*, op. cit., vol. I, p. 197.

[৪৬] *Dictionary of Pali Proper Names*, op. cit., vol. I, p. 363.

[৪৭] *The Summaṅgalavilāsinī, Buddhaghosa's Commentary on the Dīgha-Nikāya*, op. cit., vol. I, p. 265 (গঙ্গায় দক্খিণাতো পাকটজনপদং).

[৪৮] *Dictionary of Pali Proper Names*, op. cit., vol. I, pp. 1050-1051.

[৪৯] W. Stede (ed.), *The Summaṅgalavilāsinī, Buddhaghosa's Commentary on the Dīgha-Nikāya*, P.T. S. London, vol. II, p. 49.

[৫০] cf. *Historical Geography of Ancient India*, op. cit., pp. 11-12; McCrindle, *Ancient India as described by Megasthenes and Arri*an, p. 8.

[৫১] *Dīgha-Nikāya*, op.cit., vol. II, p. 235.

[৫২] E. Hardy, *Manual of Buddhism*, ZDMG 53, p. 4.

[৫৩] *Samantapāsādikā*, op. cit., vol. I, p. 197.

[৫৪] T.W. and C. A. F. Rhys Davids (trans.), *Dīgha-Nikāya*, Motilal Banarsidas, Delhi, 2000

Dhaka University Institutional Repository

(1st ed.), vol. III, p. 33.

[৫৫] *Aṅguttara Nikāya*, op. cit., vol. I, p. 35.

[৫৬] *Papañcasūdanī : Majjhimanikāyaṭṭhakathā of Buddhaghosācariya*, op. cit., vol. II, pp. 123, 423.

[৫৭] *Mahāvastu*, op. cit., p. 128.

[৫৮] N. Majumdar (ed.), *Cunningham's Ancient Geography of India*, Indological Book House, Varanasi, pp. 2-3.

[৫৯] cf. Bimala Churn Law, *Geography of Early Buddhism*, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd, New Delhi, 1979 (2nd ed.), p. xviii.

[৬০] cf. *Cunningham's Ancient Geography of India*, op. cit., pp. 6-7.

[৬১] cf. *Historical Geography of Ancient India*, op. cit., p. 10.

[৬২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২ (*কাব্যমীমাংসা* মতে, দেবসভার পশ্চিমে অপরান্ত অবস্থিত ছিল। পালি সাসনবংস গ্রন্থ মতে, ইরাবতী পশ্চিমে অপরান্ত প্রদেশ অবস্থিত ছিল। আর. জি. ভাণ্ডরকরের (R. G. Bhandarkar) মতে, উত্তর কঙ্কনই ছিল অপরান্ত, যার রাজধানী ছিল সুপ্পারক। মার্কেণ্ডেয় পুরাণ মতে, সিন্ধ-সৌবীর এর উত্তরে অপরান্ত অবস্থিত ছিল)।

(তত্র বারাণস্যা পরতং পুর্বদেশং
মজ্ঝিম্মত্যা পরতং দক্ষিণপথং
দেবসভায়া পরতং পশ্চাতদেশং
প্রিথুদকাত পরতং উত্তরাপথং
বিনসনপ্রয়াগয়োং গঙ্গা-যমুনাযোশ্চ অন্তরং অন্তবেদী) ।

[৬৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২-১৫।

[৬৪] *Cunningham's Ancient Geography of India*, op. cit., pp. 10-11.

[৬৫] S. Beal, *Si-Yu-Ki, Buddhist Records of the Western World*, Motilala Baranasidas, Delhi, 19181, p. 36 (note), *Cunningham's Ancient Geography of India,* op. cit., p. 9.

[৬৬] *On Yuan Chwang's Travel in India*, op. cit., p. 33.

[৬৭] ইন্টারনেটের Wikipedia হতে সংগৃহীত।

[৬৮] ইন্টারনেটের Wikipedia হতে সংগৃহীত। তবে কানিংহাম এর মতে, ১০,০০০=১১৪৯ ব্রিটিশ মাইল। দৈর্ঘ্য ২২,৩০০ স্তদিয়া = ২২৩০০ X ৬০০= ১৩৩৮০০০০ ফুট=৪৪৬০০০০ গজ= ২৫৩৪.০৯ মাইল। প্রস্থ ১৬,০০০ স্তদিয়া=১৬,০০০ X ৬০০=৯৬,০০০০০ফুট=৩২০০০০০ গজ=১৮১৮.১৯ মাইল। সুতরাং আয়তন = ২৫৩৪.০৯ X ১৮১৮.১৯=৪৬,০৭, ৪৫৪.১০ বর্গ মাইল। তাছাড়া, দক্ষিণ সাগর হতে ককেসাস পর্যন্ত ভারতবর্ষ ছিল ২০,০০০ স্তদিয়া= ২০,০০০ X ৬০০=১২,০০০০০০ ফুট=৪০০০০০০ গজ=২২৭২.৭৩ মাইল)।

Dhaka University Institutional Repository

[৬৯] নক্খত্তজাতক (নক্ষত্রজাতক) দ্রষ্টব্য।

[৭০] *Aṅguttara Nikāya*, op. cit., vol. I, p. 213.

[৭১] উক্ত গ্রন্থে (পৃ. ২২) এরূপ উল্লেখ আছে : 'সর্বস্মিং জম্বুদ্বীপে সোড়স জনপদেসু'। এর থেকে বোঝা যায় জম্বুদ্বীপ ষোলটি জনপদে বিভক্ত ছিল।

[৭২] *Dīgha-Nikāya*, op.cit., vol. II, pp. 202-203; এ গ্রন্থে উল্লেখিত জনপদসমূহ হলো : অঙ্গ, মগধ, কাশী, কোসল, বজ্জি, মল্ল, চেতি, বংস, কুরু, পঞ্চাল, মচ্চ এবং সূরসেন।

[৭৩] W. Stede, *Cullaniddesa*, P. T. S. London 1918, p. 37; *Mahāvastu*, vol. I, op. cit., p. 34; cf. *Historical Geography of Ancient India*, op. cit., p. 42 ; হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, *প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস*, পশ্চিবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, পৃ. ৮৮।

[৭৪] T. W. Rhys Davids, *Buddhist India*, Motilal Banarsidas Puvlishers Pvt. Lrd., Delhi, 1993 (4th ed.), p. 22-33; E. J. Thomas, *History of Indian Thought,* p. 6; *Dictionary of Pali Proper Names*, vol. II, op. cit., p. 496; *Geography of Early Buddhism*, op. cit., pp. 1-2; সুনীল চট্টোপাধ্যায়, *প্রাচীন ভারতের ইতিহাস*, পশ্চিবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, পৃ. ১২৩; *প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬-৮৭।

[৭৫] *প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮।

[৭৬] *History of Buddhist Thought*, op. cit., p. 6.

[৭৭] (তেলপত্তজাতকে সুম্ভ রাজ্যের দেসক নগরে বুদ্ধ 'জনপদকল্যাণী সূত্র' দেশনা করেছিলেন বলে বর্ণিত আছে। সুম্ম বা সুম্ভ রাজ্যকে আর. সি. মজুমদার সুম্ভরাজ্য গৌড় বা রাঢ় অঞ্চল হিসেবে অভিহিত করেছেন); রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৩৭৩ (বাংলা সন), পৃ. ১০-১৩।

[৭৮] *মহাবংস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩।

[৭৯] *Dictionary of Pali Proper Names*, vol. II, op. cit., pp. 418-419.

[৮০] *Dīgha-Nikāya*, op.cit., vol. II, p. 203.

[৮১] *Geography of Early Buddhism*, op. cit., pp. 49, 50, 61.

[৮২] কোকা আন্তোনভা, গ্রিগোরি বোন্‌গার্দ-লেভিন এবং গ্রিগোরি কতোভস্কি, *ভারতবর্ষের ইতিহাস*, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, পুনমুদ্রন ১৯৮৬, পৃ. ৭৮।

[৮৩] *Buddhist India*, op. cit., p. 23.

Dhaka University Institutional Repository

[৮৪] লণ্ডনের পালি টেক্সট সোসাইটি হতে প্রকাশিত গ্রন্থে জাতকসমূহের নাম যেভাবে উল্লেখ আছে এখানে ঠিক সেভাবে জাতকসমূহের নামোল্লেখ করা হয়েছে। জাতকের পাশে বন্ধনীতে খণ্ড সংখ্যা ও পৃষ্ঠা নম্বর দেয়া হয়েছে, ফলে রেফারেন্স উল্লেখ করা হয়নি।

[৮৫] তন্মধ্যে লুম্বনী, বুদ্ধগয়া, সারনাথ এবং কুশনারা চারি মহাতীর্থস্থান হিসেবে খ্যাত।

[৮৬] *Vinaya Pitaka*, op. cit., vol. I, pp. 79, 80, 82, 83; প্রজ্ঞানন্দ স্থবির (অনু.), মহাবর্গ, শ্রী অধরলাল বড়ুয়া কর্তৃক প্রকশিত,কলিকাতা, ১৯৩৭, এ গ্রন্থ পাঠে আলোচ্য বিষয়ে সহজে ধারণা লাভ করা যায়।

[৮৭] *Vinaya Pitaka*, op. cit., vol. II, pp. 18ff; *Dictionary of Pali Proper Names*, vol. II, op. cit., p. 345; বিনয়াচার্য ভদন্ত সত্যপ্রিয় থের (অনু.), *চূল্লবর্গ*, রাজবন বিহার রাঙ্গামাটি, ২০০৮ (দ্বিতীয় সংস্করণ), গ্রন্থটি পাঠ করে আলোচ্য বিষয়ে সহজ ধারণা লাভ করা যেতে পারে।

[৮৮] *Vinaya Pitaka*, op. cit., vol. IV, pp. 16, 108.

[৮৯] রাজগুরু শ্রীধর্মরত্ন মহাস্থবির (সংকলিত ও অনূদিত), *মহাপরিনিব্বান সুত্তং*, শ্রী অন্নপূর্ণ বড়ুয়া, চট্টগ্রাম, ১৯৪১, পৃ. ১-১৭৬।

[৯০] Leon Feer and C. A. F. Rhys Davids, *Saṃyutta Nikāya*, P. T. S. London, 1977, vol. I, p. 349.

[৯১] V. Fausboll, *The Sutta-Nipāta*, SBE, Oxford, 1881, vol. x, p. 1013, vv. 977.

[৯২] *Dīgha-Nikāya*, op.cit., vol. IV, p. 34; V. Trenckner and R. Chalmers, P. T. S. London, 1887, vol. I, p. 51; *Saṃyutta Nikāya*, op. cit., vol. I, p. 195; *Aṅguttara Nikāya*, op. cit., vol. IV, p. 59.

[৯৩] করুণানন্দ ভিক্ষু পালি সাহিত্য সমীক্ষার মাধ্যমে প্রাচীন ভারতের জনপদসমূহের ১৩৭টি প্রধান নগর তালিকাভূক্ত করেছেন এবং এগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণী লিপিবদ্ধ করেছেন। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : করুণানন্দ ভিক্ষু, *পালি সাহিত্যে নগরবিন্যাস ও নগরজীবন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ৮০-১১৬।

[৯৪] বি. সি. ল্য এবং এগাকু মায়েদা কৃর্তক প্রদশিত প্রাচীন ভারতবর্ষের মানচিত্র এখানে কিছুটা পরিবর্তন করে উপস্থাপন করা হয়েছে, *Historical Geography of Ancient India*, op. cit., (গ্রন্থের প্রথমে সংযুক্ত); Egaku Mayeda, *Genshi Bukkhyono Seiten No Seiritsu Kenkyo*, Sankibo, Tokyo, 1964, p. 174-175.

[৯৫] Internet (www.googleimage.com) থেকে মানচিত্রটি নেয়া হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা

১. ভূমিকা

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে প্রাচীন ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অবস্থা আলোচনা করেছি। এতে দেখা যায় যে, প্রাচীন ভারতবর্ষ ষোলটির অধিক জনপদ বা রাজ্যে বিভক্ত ছিল, কিন্তু তন্মধ্যে ষোলটি জনপদ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ এবং আয়তনে বৃহৎ ছিল। এগুলো হলো : অঙ্গ, মগধ, কাশী (কাসি), কোশল (কোসল), বৃজ্জি (বজ্জি), মল্ল, চেতি (চেদি), বংশ (বংস), কুরু, পঞ্চাল, মৎস (মচ্চ), শূরসেন (সূরসেন), অস্‌সক বা অশ্মক, অবন্তি, গান্ধার এবং কম্বোজ। মূলত এসব জনপদকে কেন্দ্র করেই ভারতের রাজনৈতিক আবহাওয়া আবর্তিত হতো এবং এসব জনপদকে ঘিরেই ভারতে রাষ্ট্র-কাঠামো ও সমাজ জীবন বিকাশ লাভ করছিল। এ কারণে এসব জনপদের রাজনৈতিক কার্যক্রম প্রাচীন ভারতের রাজনীতির মূল ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়।

রাজনীতি এবং ধর্মীয় কার্যক্রম সমাজ জীবনের অনন্য উপাদান। বৈদিক সাহিত্যে প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক বিবরণ তেমন একটা পাওয়া যায় না। তবে পালি সাহিত্য, বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্য এবং জৈন শাস্ত্রে এ সম্পর্কে বিক্ষিপ্তভাবে প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়। পালি সাহিত্যের মধ্যে, বিশেষত জাতক গ্রন্থে এসব জনপদের রাজনৈতিক অবস্থা এবং বৌদ্ধ ধর্মীয় কার্যক্রম সম্পর্কে বিক্ষিপ্তভাবে প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়। অন্যান্য পালি গ্রন্থ এবং ঐতিহাসিক আকর গ্রন্থের তথ্যের সঙ্গে জাতক গ্রন্থের তথ্যের সমন্বয় সাধন করে এ অধ্যায়ে ষোড়শ জনপদের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে। মূলত বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারের ইতিহাস বর্ণনার সময় প্রসঙ্গক্রমে রাজনৈতিক বিষয়সমূহ আলোচিত হয়েছে। তাই এ অধ্যায়ে রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে বৌদ্ধধর্মীয় কার্যক্রমও উপস্থাপন করা হবে।

২. প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা : প্রেক্ষিত ষোড়শ জনপদ

২.১. অঙ্গ

অঙ্গ রাজ্যের রাজবংশীয় ইতিবৃত্ত তেমন একটা জানা যায় না। রামায়ণে অঙ্গ রাজ্যের উৎপত্তি সম্পর্কে এক অলীক কাহিনি পাওয়া যায়। এ কাহিনি অনুসারে প্রেমের দেবতা মদন বা অনঙ্গ ভগবান শিবের রোষাগ্নি থেকে মুক্তি পাবার জন্য পালিয়ে এক অঞ্চলের আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেই অঞ্চলে প্রেমের দেবতা

Dhaka University Institutional Repository

মদন 'দেহ বা অঙ্গ' রাখেন বলে ঐ অঞ্চলের নাম হয় অঙ্গ।[১] মহাভারত এবং পুরাণ অনুসারে অঙ্গ নামক এক রাজকুমার এই রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[২] তাই এ রাজ্যের নাম হয় অঙ্গ। মূলত অঙ্গ নামক জাতি বসবাস করতো বলে ঐ অঞ্চলের নাম হয় অঙ্গ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে 'অঙ্গ বৈরোচন' নামক এক রাজার উল্লেখ আছে। এ কারণে মহাভারতের আখ্যানটি প্রাচীন বলে ধারণা করা হয়। বোধায়ন ধর্মসূত্রে অঙ্গদের শঙ্করজাত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। মৎসপুরানে 'দানবর্ষভঃ' অর্থাৎ 'দৈত্যাধিপতি' অভিধায় ভূষিত বীরের নামানুসারে অঙ্গজাতির নামকরণ হয় বলে উল্লেখ আছে। এসব কথা ও কাহিনি কতটুকু সত্যস্পর্শী তা নির্ধারণ করা দুষ্কর এবং এ বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। যাহোক, দীর্ঘনিকায়ের মহাগোবিন্দ সূত্রে[৩] অঙ্গরাজ ধতরট্ঠহের কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। সুমঙ্গলবিলাসিনী গ্রন্থে গগ্গরা নাম্নী রানীর কথা উল্লেখ আছে। শ্রীহর্ষ দৃঢ়বর্মন নামক একজন অঙ্গরাজের কথা উল্লেখ করেছেন। মহাজনকজাতক হতে জানা যায় যে, বুদ্ধের সময় মগধরাজ ব্রহ্মদত্ত নামক এক রাজা অঙ্গরাজকে পরাজিত করে অঙ্গ রাজ্য দখল করেন। জাতক বুদ্ধের সমকালীন হওয়ায় এ তথ্যটি গ্রহণযোগ্য মনে হয়। তবে জাতকে[৪] 'ব্রহ্মদত্ত' শব্দটি রাজাদের উপাধি হিসেবেও উল্লেখ পাওয়া যায়। ফলে মহাজনকজাতকে উল্লেখিত 'ব্রহ্মদত্ত' শব্দটি দ্বারা রাজার নাম নাকি উপাধি নির্দেশ করছে তা স্পষ্ট করে বলা দুষ্কর। যাহোক, উপরের বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, অঙ্গ রাজ্যের রাজবংশীয় ইতিহাস অস্পষ্ট।

চম্পা নগরী ছিল অঙ্গ রাজ্যের রাজধানী, যা চম্পা এবং গঙ্গা নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত ছিল। চম্পা নদীর বর্তমান নাম ছানন্দ।[৫] মহাজনক জাতক (Vol. VI. pp. 30-34) পাঠে জানা যায় যে, চম্পা নগরী মিথিলা রাজ্যের রাজধানী বিদেহ হতে ৬০ যোজন দূরে অবস্থিত ছিল। চম্পেয্যজাতক (IV. p. 454) সাক্ষ্য দেয় যে, চম্পানদী অঙ্গ এবং মগধ রাজ্যকে বিভক্ত করে রেখেছিল। এই জাতক উল্লেখ আছে যে, অঙ্গ একটি শক্তিশালী রাজ্য ছিল। অঙ্গ ও মগধের মধ্যে প্রায় সময় বিবাদ লেগে থাকত। কখনো অঙ্গ রাজা মগধ দখল করত, আবার কখনো মগধ রাজা অঙ্গ দখল করত। যুদ্ধের সময় একবার মগধরাজ অঙ্গরাজের নিকট পরাজিত হয়ে অশ্বারোহনপূর্বক পলায়ন করলেন এবং শত্রুর হাতে জীবন দান অপেক্ষা আত্মহত্যা শ্রেয় মনে করে চম্পা নদীতে ঝাপ দেন। এ জাতক হতে আরো জানা যায় যে, বুদ্ধের সময়কালে মগধরাজ বিম্বিসার অঙ্গরাজ ব্রহ্মদত্তকে পরাজিত করে হত্যা করেন এবং উভয় রাজ্য একত্রিত করে রাজত্ব করতেন। এরপর থেকে অঙ্গ মগধ রাজ্যের অধিভুক্ত হয়ে যায়।[৬] বিদূরপণ্ডিতজাতকে (Vol.VI.,p.256) রাজগৃহ অঙ্গরাজ্যের অন্যতম নগর হিসেবে উল্লেখ আছে। বুদ্ধের সময় মগধের রাজধানী ছিল রাজগৃহ। ফলে ধারণা করা যায়, পূর্বে রাজগৃহ অঙ্গরাজ্যের অধিভুক্ত ছিল। দীর্ঘনিকায়[৭] হতে জানা যায় যে, বুদ্ধের

সময়কালে মগধরাজ বিম্বিসার সোনদণ্ড নামক ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করেন এবং তাঁকে কর হতে অব্যাহতি দান করেন। মজ্ঝিমনিকায়ের অট্ঠকথা পপঞ্চসূদনী[৮] গ্রন্থ হতে জানা যায়, অঙ্গের লোকেরা রাজা বিম্বিসারকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। গৃথপাণজাতক (Vol. II. p. 211) সাক্ষ্য দেয় যে, উভয় রাজ্যের লোকেরা উভয় রাজ্যে স্বাধীনভাবে যাতায়াত করতে পারতো। ফলে ধারণা করা হয়, বুদ্ধের সমসাময়িককালে মগধরাজ বিম্বিসার অঙ্গরাজ্য দখল করেছিলেন। সোননন্দজাতক (Vol. V. pp. 312-316) পাঠে জানা যায় যে, কোশলরাজ অঙ্গ জয় করার পর মগধরাজ্য জয় করেন এবং ক্রমে জম্বুদ্বীপের সমস্ত রাজাকে বশীভূত করেন। বিদূরপণ্ডিতজাতক (Vol. VI. pp. 225-266) হতে জানা যায় যে, চারজন মহাশ্বৈর্যশালী ব্রাহ্মণ অঙ্গ রাজ্যের কালচম্পনগরে প্রবেশ করে সেখানকার চারজন ভূস্বামীর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন এবং তাঁদের রান্না করা সুস্বাদু খাবার উপভোগ করেন। মহাজনকজাতক (Vol. VI. po. 31-34) মতে, অঙ্গরাজ্যের চম্পানগরীর প্রবেশ পথ অট্টালক বা প্রহরী স্তম্ভ ও প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। বিনয় পিটক হতে জানা যায় যে, অঙ্গ রাজ্যে আশি হাজার গ্রাম ছিল। দীর্ঘনিকায়ের মহাপরিনির্বাণ সূত্র[৯] সাক্ষ্য দেয় যে, গৌতম বুদ্ধের পরিনির্বাণের সময় ভারতবর্ষে রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী ও বড় ছয়টি নগরের মধ্যে অঙ্গের রাজধানী চম্পা ছিল অন্যতম একটি। বাকী পাঁচটি নগর হচ্ছে : রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, সাকেত, কোশাম্বী এবং বারাণসী। চম্পা নগরী ধনসম্পদ ও বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। চম্পার বণিকেরা গঙ্গার অববাহিকা থেকে সূর্বণ ভূমিতে বাণিজ্যে যাতায়াত করত।

বিনয়পিটক, দীর্ঘনিকায়, সংযুক্ত নিকায় এবং অঙ্গুত্তরনিকায় হতে জানা যায় যে, গগ্গরা নামক রানি চম্পা নগরীতে গগ্গরাপুষ্করণী নামক একটি পুকুর খনন করেছিলেন এবং বুদ্ধ বহুসংখ্যক ভিক্ষুসহ চম্পানগরের ঐ পুকুরের পারে অবস্থান করেন এবং উক্ত স্থানের অধিবাসীদের ধর্মদেশনা করেন।[১০] মহাভারত, পুরাণ এবং হরিবংশ নামক গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, চম্পার প্রাচীন নাম ছিল মালিনী।[১১] বিনয়পিটকে [১২] উল্লেখ আছে যে, বুদ্ধ অঙ্গরাজ্যের চম্পা, ভদ্দিয়, কোটিগ্রাম, অঙ্গুত্তরাপ এবং আপন প্রভৃতি নগরে অবস্থান করে ধর্মদেশনা করেন এবং অঙ্গরাজ্যে অবস্থান করার সময়ই ভিক্ষুদের জুতা পরিধান করার অনুমতি প্রদান করেছিলেন। মজ্ঝিমনিকায় হতে জানা যায় যে, বুদ্ধ অঙ্গরাজ্যের অস্‌সপুর নগরে অবস্থান করে ঐ স্থানের অধিবাসীদের মহা অস্‌সপুর ও চূল্ল অস্‌সপুর সূত্র দেশনা করেছিলেন। মালালাসেকেরা [১৩] অস্‌সপুর এবং ভদ্দিয় বা ভদ্রিক নামক নগরদ্বয় অঙ্গ রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। জাতকের সন্তিকেনিদান (Vol. 1. p. 87) হতে জানা যায় যে, বুদ্ধ কপিলাবস্তু যাবার সময় অঙ্গ ও মগধ রাজ্যের বহু গৃহীর পুত্র সঙ্গে নিয়ে যান। নিকায় গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, বুদ্ধ অঙ্গ রাজ্যে ৮ বার ধর্মদেশনা করেন।[১৫]

বিমানবত্থু অট্‌ঠকথায় উল্লেখ আছে যে, অঙ্গ খুবই সমৃদ্ধ রাজ্য ছিল।[১৫] সেখানে বহু ধনী বণিক বসবাস করতেন এবং বণিকগণ অনেক সঙ্গীসহ সিন্ধসোবীরদেশে বাণিজ্যের জন্য যাতায়াত করতেন। ললিতবিস্তর[১৬] গ্রন্থে অঙ্গরাজ্যের বর্ণমালার উল্লেখ পাওয়া যায়।

মহাভারতের [১৭] সভাপর্বে অঙ্গ ও বঙ্গ এ দুটি প্রদেশ নিয়ে একটি রাজ্য গঠিত হয়েছিল বলে উল্লেখ আছে। কথাসরিৎসাগর (পৃ. ২৫) হতে জানা যায় যে, বিটঙ্কপুর বা বিক্রমপুর নামক অঙ্গের এক নগর সমুদ্রতীরে অবস্থিত ছিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (পৃ. ২২) অঙ্গের রাজকীয় প্রতিপত্তির কথা উল্লেখ আছে। এতে আরো উল্লেখ আছে যে, অঙ্গের এক রাজা দিগ্বিজয় করে সম্ভ্রান্তবংশীয় রমণীদের বলপূর্বক তাঁর রাজ্যে নিয়ে যান।

উপরের বর্ণনা হতে ধারণা করা যায় যে, মগধ রাজ্যের নিকটে অঙ্গ রাজ্য অবস্থিত ছিল। অঙ্গের বর্তমান ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে টি. ডব্লিউ. রীস ডেবিড্‌স [১৮] বলেন, অঙ্গ রাজ্য মগধের পূর্বে বর্তমান ভাগলপুরের নিকটে অবস্থিত ছিল। তবে তিনি এর কোনো ভৌগোলিক সীমারেখা উল্লেখ করেন নি। বি. সি. ল্য এবং পরজিতের মতে, বর্তমান ভাগলপুর ও মুঙ্গের জেলা অঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। উত্তর দিকে কৌশিকী বা কোশী নদী পর্যন্ত, পশ্চিমে পূর্ণিয়া জেলা পর্যন্ত অঙ্গ রাজ্য বিস্তৃত ছিল। বর্তমান ভারতের বিহার রাজ্যের ভাগলপুরের নিকটবর্তী চম্পাপুর এবং চম্পানগর গ্রামদ্বয় কানিংহাম প্রাচীন অঙ্গরাজ্যের রাজধানী চম্পানগরী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাছাড়া, চম্পা নদী বর্তমান কালের ছান্দন নদী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ফলে ধারণা করা যায় যে, মগধের পূর্বে এবং রাজমহল পবর্তের পশ্চিমে অঙ্গ রাজ্য অবস্থিত ছিল।[১৯]

২.২. মগধ

বর্তমান পাটনা এবং বিহার রাজ্যের গয়া জেলা নিয়ে প্রাচীন মগধ রাজ্য গঠিত ছিল। টি. ডব্লিউ. রীস ডেবিড্‌স [২০] এর মতে, উত্তরে গঙ্গা নদী, পূর্বে চম্পা নদী, দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত এবং পশ্চিমে সোননদী পর্যন্ত মগধের সীমানা বিস্তৃত ছিল। বুদ্ধের সময়ে এ জনপদটি তিনশত লিগ বা তেইশশত মাইল বিস্তৃত ছিল। মগধের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় অর্থববেদে। এ গ্রন্থে গান্ধার, মূজবত, অঙ্গ ও মগধের মধ্যে নিরতিশয় উত্তেজনাকে অমঙ্গলকর বলা হয়েছে।[২১] ফলে ধারণা করা যায়, প্রাচীনকালে রাজ্যসমূহে যুদ্ধ বিগ্রহ লেগে থাকতো। কণ্ডিনজাতক, তিপল্লত্থমিগজাতক, কুলাবকজাতক, মঙ্গলজাতক, দুম্মেধজাতক সাক্ষ্য দেয় যে,

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীনকালে মগধের অধিপতিরা রাজগৃহে বসবাস করে রাজ্য শাসন করতেন। এর থেকে ধারণা করা যায়, প্রাচীনকালে রাজগৃহ মগধের রাজধানী ছিল। বুদ্ধের সময়কালেও রাজগৃহ মগধের রাজধানী ছিল। রাজা বিম্বিসারের রাজপ্রাসাদ রাজগৃহে অবস্থিত ছিল, যা পাথরের প্রাচীর দ্বারা ঘেরা ছিল। দীর্ঘনিকায়ে[২২] উল্লেখ আছে যে, বুদ্ধের সময়ে ছয়টি অন্যতম নগরীর মধ্যে রাজগৃহ ছিল অন্যতম একটি এবং তক্ষশিলা হতে রাজগৃহ পর্যন্ত একশত বিরানব্বই লিগ দীর্ঘ একটি রাস্তা ছিল, যা যাতায়াত ও ব্যবসা-বাণিজ্যের অন্যতম রুট বা পথ হিসেবে ব্যবহৃত হত এবং অন্যান্য রাজ্যগুলোর সঙ্গেও সংযুক্ত ছিল। মহাপরিনির্বাণ সূত্রে[২৩] বুদ্ধ রাজগৃহ হতে মল্লদের শালবনে যাবার প্রাক্কালে যেসব স্থানে যাত্রা বিরতি করেছিলেন তার উল্লেখ আছে। যেমন : অম্বলট্‌ঠিকা, নালন্দা, পাটলীগ্রাম, হস্তিগাম, অম্বগ্রাম, জম্বুগ্রাম, ভোগনগর এবং পাবা। পাবার ককুত্থ নদী পার হয়ে বুদ্ধ মল্লদের শালবনে পৌঁছেন, যেখানে তিনি মহাপরিনির্বাণ লাভ করেছিলেন। উপর্যুক্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা রাজগৃহকে সমৃদ্ধ নগরী হিসেবে প্রতিপন্ন করে। মগধের রাজধানী রাজগৃহকে গিরিব্রজও বলা হত। গিরি বা পর্বত দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল বলে একে গিরিব্রজ বলা হত। মহাভারত এবং পালি সাহিত্যে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা করলে এ দাবী সত্য বলে প্রতীয়মান হয়। কারণ মহাভারত, সংযুক্ত নিকায় এবং বিমানবত্থু হতে জানা যায় যে, গিরিব্রজ বা রাজগৃহ পাঁচটি পর্বত, যথা : ইসিগিলি, বেপুল্ল (বঙ্কক এবং সুপন), বেভার, পণ্ডব এবং গিজ্ঝকূট দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল।[২৪] সংযুক্তনিকায়ে[২৫] ইন্দকূট নামক রাজগৃহের আরো একটি পর্বতের উল্লেখ পাওয়া যায়। বিমানবত্থু অট্‌ঠকথা এবং দীর্ঘনিকায় হতে জানা যায় যে, স্থপতি মহাগোবিন্দ নগরটি নির্মাণ করেন।[২৬] প্রাচীনকালে রাজগৃহ বা গিরিব্রজ বসুমতি (রামায়ণ), বার্‌হদ্রথপুর (মহাভারতে), মাগধপুর, বরাহ, বৃষভ, ঋষিগিরি, চৈত্যক, বিম্বিসারপুরী এবং কুশাগারপুর প্রভৃতি নামেও পরিচিত ছিল। বিনয়পিটকে[২৭] উল্লেখ আছে, রাজগৃহের পাশ দিয়ে তপোদা নদী প্রবাহিত হত।

জৈনসূত্র[২৮] মতে, রাজা অজাতশত্রুর পুত্র উদায়ী রাজগৃহ থেকে পাটলীপুত্রে রাজধানী স্থানান্তর করেন। অঙ্গুত্তর নিকায়ে[২৯] এ দাবীর সমর্থন পাওয়া যায়। তবে হিউয়েন সাং এর মতে রাজা কালাশোক রাজগৃহ থেকে পাটলীপুত্রে রাজধানী স্থানান্তর করেন।[৩০] অবশ্য সম্রাট অশোকের সময়ই মূলত পাটলীপুত্র গৌরবের শীর্ষে ছিল। ভারতের বর্তমান পাটনা জেলাই ছিল পাটলীপুত্র। দীপবংস এবং মহাবংস মতে, পাটলীপুত্র পুষ্পপুর এবং কুসুমপুর নামেও পরিচিত ছিল।[৩১] সুত্তপিটকের অট্‌ঠকথায় উল্লেখ আছে যে, রাজা মন্ধাতা এবং মহাগোবিন্দ প্রাচীনকালে এখানে রাজত্ব করতেন। সোননন্দজাতক (Vol. V. pp. 315-317) হতে

Dhaka University Institutional Repository

জানা যায় যে, কাশীর রাজা একদা মগধ রাজ্য দখল করেছিল। চম্পেয্যজাতক (Vol. IV. p. 454), মহাজনকজাতক (Vol. VI. p. 32) এবং দীর্ঘনিকায়ের সোনদণ্ড সূত্র[৩২] সাক্ষ্য দেয় যে, একদা অঙ্গরাজ ব্রহ্মদত্ত মগধরাজ্য জয় করেছিল। ফলে ধারণা করা যায় যে, প্রাচীন জনপদসমূহের কর্তৃত্ব নিয়ে রাজন্যবর্গ যুদ্ধে লিপ্ত হতেন। বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব-বিকাশের সঙ্গে মগধের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ কারণে বৌদ্ধ সাহিত্যে মগধ ও রাজগৃহ সম্পর্কে প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়। পৌরাণিক গ্রন্থ হতে জানা যায় যে, মগধের দ্বিতীয় রাজবংশ ছিল শিশুনাগ বংশ। এই বংশের রাজা বিম্বিসার ছিলেন বুদ্ধের সমসাময়িক। বুদ্ধচরিত[৩৩] গ্রন্থে বিম্বিসারকে হর্যঙ্ককুলে সন্তান হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। তিব্বতি তথ্য[৩৪] মতে, বিম্বিসারের পিতার নাম ছিল মহাপদুম এবং মাতার নাম ছিল বিম্ব। তাঁর মাতার নাম হতে এবং তাঁর শরীর জ্যোতি বিম্বের ন্যায় উজ্জ্বল ছিল বলে তাঁর নামকরণ করা হয় বিম্বিসার। মহাবংস সাক্ষ্য দেয় যে, বিম্বিসার ১৫ বছর বয়সে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং বায়ান্ন বছর রাজত্ব করেন। তিনি অঙ্গরাজ ব্রহ্মদত্তকে পরাজিত করে তাঁর পিতার পরাজয়ের প্রতিশোধ নেন এবং মগধকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিতে পরিণত করেন। মজ্ঝিমনিকায় এবং থেরগাথা অট্ঠকথা হতে জানা যায় যে, পণ্ডকেতু ছিল বিম্বিসারের উপাধি।[৩৫] পালি এবং অন্যান্য প্রাচীন সাহিত্যে বিম্বিসারকে 'সেনিয় তথা শ্রেণিয়' নামে অভিহিত করা হয়েছে। এ কারণে পণ্ডিতগণ ধারণা করেন, বিম্বিসার সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে সেনাপতি ছিলেন।[৩৬] কিন্তু ভাষ্যকার বুদ্ধঘোষ[৩৭] 'সেনিয়' উপাধিটি তাঁর ব্যক্তিগত নাম ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। অপর ভাষ্যকার ধর্মপালের[৩৮] মতে 'সেনিয়' ছিল বিম্বিসারের গোত্র নাম। থেরগাথা-অট্ঠকথা[৩৯] হতে জানা যায় যে, তিনি 'পণ্ডরকেতু' নামক অভিধায় ভূষিত ছিলেন, কারণ তিনি 'শ্বেত নিশান যুক্ত' ছিলেন। ঐতিহাসিক আকর গ্রন্থ সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি সুদক্ষ এবং বিচক্ষণ শাসক ছিলেন।[৪০] অঙ্গুত্তর নিকায়[৪১] হতে জানা যায়, তিনি প্রজার মঙ্গলের জন্য বহু জনহিতকর কর্ম করতেন। অজাতশত্রু ছিলেন তাঁর প্রথম সন্তান। থুসজাতকে (Vol. III. p. 121) উল্লেখ আছে যে, অজাতশত্রু ছিলেন বিম্বিসারের প্রথম স্ত্রী কোসলাদেবীর সন্তান। এছাড়াও, বিমলা কৌণ্ডন্য, সীলব এবং জয়সেন নামক বিম্বিসারের আরো তিনিজন পুত্র ছিলেন বলে জানা যায়। অজাতশত্রুও পিতা বিম্বিসারের ন্যায় সুদক্ষ এবং সফল শাসক ছিলেন। আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পলতা গ্রন্থে তাঁর শৌর্য-বীর্য এবং রাজ্যবিস্তারের কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি ভারতের প্রথম নৃপতি যিনি মগধকে ঘিরে ভারতবর্ষে একটি বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন।[৪২]

দিব্যাবদান গ্রন্থে, মগধকে সকল প্রকার ধনরত্নে পরিপূর্ণ এক অপূর্ব সুন্দর নগরী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বৈদিক সাহিত্যে মগধকে আর্য এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি বর্হিভূত অঞ্চল হিসেবে আখ্যায়িত করে হেয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিপন্ন করতে দেখা যায়। মগধ বৌদ্ধধর্মের প্রাণকেন্দ্র মজ্ঝিম বা মধ্যমদেশের অন্তর্গত ছিল। সম্ভবত এ কারণেই ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে মগধকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছিল। বিনয়পিটকের মহাবর্গের চর্মস্কন্ধবর্গ[৪৩] সাক্ষ্য দেয় যে, রাজা বিম্বিসারের সময় মগধে আশি হাজার গ্রাম ছিল। গ্রামের শাসনকর্তাগণ ‘গ্রামিক’ নামে অভিহিত হতেন এবং রাজা বিম্বিসার ঐ আশি হাজার গ্রামের গ্রামিকদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে রাজত্ব করতেন। মজ্ঝিমনিকায়[৪৪] মতে, মগধে সেনানী নামক একটি খুবই সুন্দর গ্রাম ছিল, যাতে একটি অপূর্ব সুন্দর বন ও একটি স্বচ্ছ জলপূর্ণ নদী ছিল। মগধের খনুমত গ্রামে ব্রাহ্মণগণ বসবাস করতেন বলে দীর্ঘনিকায়[৪৫] সাক্ষ্য দেয়। সদ্ধিত্ত নামক গ্রামটিও মগধের অন্তর্গত ছিল বলে জানা যায়।[৪৬] কুলাবকজাতকে (I. p. 199) মগধে মচল নামক এক গ্রামে ত্রিশঘর লোক বাস করতো বলে উল্লেখ আছে। জাতকে মগধের রাজা হিসেবে অরিন্দম এবং দুর্যোধনের নামও উল্লেখ পাওয়া যায়। ললিতবিস্তর গ্রন্থে মাগধী বর্ণমালার কথা উল্লেখ আছে। সমন্তপাসাদিকা[৪৬] হতে জানা যায় যে, মাগধী ভাষায় আর্যগণ কথা বলতেন এবং বুদ্ধের সময়ে মগধে মুদ্রা হিসেবে ‘কাহাপন’ প্রচলিত ছিল।

হিউয়েন সাং সাক্ষ্য দেয় যে, কুশাগারপুর বা কুশাগ্রপুর আগুনে ভস্মিভূত হলে রাজগৃহে নতুন শহর নির্মাণ করা হয়েছিল। ফা-হিয়েনের মতে, বিম্বিসার নয়, অজাশত্রুই নতুন শহরটি নির্মাণ করেছিলেন।[৪৭] বিনয়পিটক[৪৮] উল্লেখ আছে যে, রাজগৃহের প্রবেশ পথে একটি বিশাল দ্বার ছিল যা সন্ধ্যাকালে বন্ধ করে দেয়া হতো এবং দ্বার বন্ধের পর কোনো ব্যক্তি এমনকি রাজন্যবর্গগণও প্রবেশ করতে পারতেন না, অন্য কথায় বলা যায়, দ্বার বন্ধের পর রাজগৃহ নগরে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। দীর্ঘনিকায়[৪৯] হতে জানা যায় যে, রাজা অজাতশত্রু বজ্জিদের আক্রমণ হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য এই দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। রাজগৃহে সর্বমাট ৬৪টি দ্বার ছিল বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।[৫০] সমন্তপাসাদিকা মতে, সম্রাট অশোকের সময় পাটলীপুত্র মগধের রাজধানী ছিল এবং পাটলীপুত্রের চারটি দ্বার হতে তিনি প্রতিদিন চার লক্ষ কাহাপণ কর লাভ করতেন। বিনয়পিটক এবং দীর্ঘনিকায় হতে জানা যায়, গৌতমবুদ্ধ যে দ্বার দিয়ে পাটলীপুত্র হতে বের হতেন তা গৌতমদ্বার নামে এবং যে স্থান হতে নৌকায় আরোহণ করতেন তা গৌতমতিত্থ নামে পরিচিত ছিল।[৫১] মগধ এবং লিচ্ছবী রাজ্যের মধ্যবর্তী সীমারেখা ছিল গঙ্গা নদী। চম্পেয়্য জাতক হতে জানা যায় যে, এ নদীর উপর উভয় রাজ্যের সমান অধিকার ছিল। ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি চম্পা নদী মগধ এবং অঙ্গ রাজ্যেকে বিতক্ত করে রেখেছিল। এ থেকে ধারণা করা যায়, তখন নদীর মাধ্যমেও সীমারেখা নির্ধারণ করা হতো।

Dhaka University Institutional Repository

সকল বৌদ্ধ ঐতিহাসিক ঐতিহ্য এবং অশোক অনুশাসন সাক্ষ্য দেয় যে, বুদ্ধের সময়কাল থেকে সম্রাট অশোকের সময়কাল পর্যন্ত মগধ ছিল বৌদ্ধধর্মের অন্যতম প্রাণ কেন্দ্র। বুদ্ধ জীবনের অধিকাংশ সময় মগধের রাজগৃহেই অতিবাহিত করেন। বুদ্ধের সঙ্গে মগধরাজ বিম্বিসারের গভীর সম্পর্ক ছিল। পালি সাহিত্যের ছত্রে ছত্রে রাজা বিম্বিসার এবং বুদ্ধের সম্পর্কের কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রব্রজ্যা (পব্বজ্জা) সূত্রে[৫২] উল্লেখ আছে যে, বুদ্ধত্ব লাভের সাত বছর পূর্বে রাজগৃহে রাজা বিম্বিসারের সঙ্গে বুদ্ধের সাক্ষাত ঘটেছিল। তখন তিনি সন্ন্যাসব্রত পালনপূর্বক রাজগৃহে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করছিলেন। তাঁর শান্ত, সৌম্য, সুন্দর দেহ-সৌষ্ঠব দেখে রাজা বিম্বিসার তাঁকে সেনাপতির পদ অলংকৃত করার অনুরোধ জানান। তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে রাজাকে বলেন, "মহারাজ ! আমি সুখ প্রার্থী নই। আমি কপিলাবস্তুর রাজা শুদ্ধোধনের পুত্র। বুদ্ধত্ব লাভের আশায় সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেছি।" তখন রাজা তাঁকে বলেন, 'বৎস ! আপনার পিতা আমার পরম মিত্র। আপনার মনোবাসনা পূর্ণ হোক। যদি বুদ্ধত্ব লাভ করেন আমাকে একবার দর্শন দেবেন।' উপরের কথোপকথন হতে ধারণা করা যায়, গৌতম বুদ্ধ এবং বিম্বিসারের মধ্যে সৌহার্দ্য বিদ্যমান ছিল। উল্লেখ্য যে, গৌতম বুদ্ধ রাজা বিম্বিসারের চেয়ে বয়সে পাঁচ বছরের বড় ছিলেন। মহাবর্গের বিম্বিসারের দীক্ষা অনুচ্ছেদ [৫৩] হতে জানা যায় যে, বুদ্ধত্ব লাভের দুই বছর পর বুদ্ধ সহস্রসংখ্যক জটিল সম্প্রদায়ভূক্ত সন্ন্যাসীকে দীক্ষা দান করেন এবং তাঁদের সঙ্গে নিয়ে গয়াশীর্ষ হতে মগধের রাজগৃহের ষষ্টিবনোদ্যানে উপনীত হন। লোকমুখে তাঁর যশখ্যাতির কথা শুনে মগধরাজ বিম্বিসার এক লক্ষ বিশ হাজার মগধবাসী ব্রাহ্মণ-গৃহপতি পরিবৃত হয়ে বুদ্ধের সমীপে উপস্থিত হয়ে ধর্মবাণী ভাষণের জন্য প্রার্থনা করেন। বুদ্ধ তাঁদের দান, শীল, স্বর্গ এবং বৌদ্ধধর্মের সারতত্ত্ব সম্বন্ধে সরলভাবে ধর্মোপদেশ দান করেন। তারপর, চতুরার্য সত্য, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ সম্পর্কে উপদেশ দেন। রাজা বিম্বিসার এবং ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ বুদ্ধের ধর্মবাণী শুনে মুগ্ধ হন। অতপর রাজা বিম্বিসার কতিপয় ব্রাহ্মণসহ বুদ্ধের গৃহীশিষ্য বা উপাসক হিসেব দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং ভিক্ষুসংঘসহ বুদ্ধকে রাজপ্রাসাদে আমন্ত্রণ পূর্বক উত্তম খাদ্যদ্রব্যে আপ্যায়িত করে মনোরম বেলুবনারাম বা বেলুবন বিহার দান করেন। এটি বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে প্রথম বিহার দান। মধুরত্থবিলাসিনী নামক অট্‌ঠকথায় উল্লেখ আছে যে, রাজা বিম্বিসার বুদ্ধের নিকট 'মহানারদকস্‌সপজাতক' (Vol. VI., p. 223) শ্রবণ করে স্রোতাপত্তি ফল (নির্বাণ লাভের চারটি স্তরের মধ্যে প্রথম স্তর) লাভ করেছিলেন। দীর্ঘনিকায়ের 'জনবসভ সূত্র'[৫৪] মতে, তিনি সকৃদাগামী ফল লাভ করেছিলেন। উদানট্‌ঠকথায় উল্লেখ আছে যে, বুদ্ধ সঙ্ঘ পরিচালনার ক্ষেত্রে রাজা বিম্বিসারের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। মহাবর্গ হতে জানা যায় যে, বুদ্ধ রাজা বিম্বিসারের অনুপ্রেরণায় সংঘের কল্যাণার্থে উপোসথব্রত

Dhaka University Institutional Repository

পালন এবং অষ্টমী, চতুর্দশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথিতে সম্মিলিত হয়ে ধর্মালোচনা করার নিয়ম প্রবর্তন করেন। বিম্বিসার ঐ সকল তিথিতে ভিক্ষুদের উপোসথ পালনের ব্যবস্থা করতেন এবং উপোসথ পালনের সুবিধার্থে রাজগৃহে কুটির নির্মাণ করান। পুনরায় বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘের চিকিৎসার জন্য তিনি রাজবৈদ্য জীবককে নিযুক্ত করেছিলেন। এছাড়া, বুদ্ধের শিষ্য পিলিন্দবচ্ছের সম্মানে তিনি বিহার রক্ষকদের বসবাসের জন্য একটি গ্রামও নির্মাণ করে দেন। অঙ্গুত্তরনিকায় এবং ধম্মপদট্‌ঠকথায় উল্লেখ আছে যে, রাজা বিম্বিসারের অপর পত্নি খেমা ছিলেন মদ্দরাজকন্যা।[৫৫] তিনি বৌদ্ধসংঘে প্রবেশ করে অর্হত্ব ফল লাভ করেছিলেন। ভিক্ষুনীদের মধ্যে তিনি বুদ্ধ কর্তৃক 'প্রজ্ঞায় অগ্রগণ্য' উপাধিতে ভূষিত হন। ধম্মপদট্‌ঠকথা [৫৬] হতে জানা যায় যে, বুদ্ধ মগধরাজ বিম্বিসারকে বৈশালী ভ্রমণের ইচ্ছা ব্যক্ত করলে তিনি রাজগৃহ হতে গঙ্গা পর্যন্ত পাঁচ লিগ পরিমাণ মসৃন রাস্তা নির্মাণ করান। বিম্বিসারের এরূপ অসংখ্য কীর্তিকথা পালি সাহিত্যের ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে আছে। তিনি ছিলেন বৌদ্ধধর্মের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। বৌদ্ধধর্মে দীক্ষার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সাইঁত্রিশ বছর বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারে তাঁর ভূমিকা ছিল অনন্য সাধারণ। অসামান্য অবদানের জন্য আজও বৌদ্ধবিশ্বে তাঁকে শ্রদ্ধাচিত্তে স্মরণ করা হয়। সংযুক্তনিকায়ের কোসল সংযুক্ত, দীপবংস, মহাবংস এবং সুমঙ্গলবিলাসিনী প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, অজাতশত্রু পিতা মগধরাজ বিম্বিসারকে কারারুদ্ধপূর্বক হত্যা করে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এ খবর শুনে কোশলরাজ প্রসেনজিত খুবই ব্যথিত এবং ক্ষুব্ধ হন। ফলে তিনি মগধরাজ অজাতশত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। সেই যুদ্ধে লিচ্ছবীদের সহযোগিতায় কোসলরাজ প্রসেনজিত অজাতশত্রুকে পরাজিত করে মগধ দখল করতে সক্ষম হন।[৫৭] উল্লেখ্য যে, মগধরাজ বিম্বিসার ও কোসলরাজ প্রসেনজিত বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। রাজা বিম্বিসার কোসল রাজ প্রসেনজিত পরস্পর পরস্পরের ভগ্নিপতি ছিলেন। রাজা বিম্বিসার কোশল রাজকন্যা কোসলাদেবীকে বিবাহ করেন। এর থেকে ধারণা করা যায় যে, রাজ্যসমূহের মধ্যে পারস্পরিক বৈবাহিক সম্পর্কও প্রচলিত ছিল।

বুদ্ধের সময়ে মগধরাজ অজাতশত্রু বৈশালী এবং বজ্জিদের সঙ্গেও বিবাদে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তবে মগধরাজ বিম্বিসারের সঙ্গে অন্যান্য রাজ্যের রাজাদের সুসম্পর্ক ছিল বলে জানা যায়। রাজা বিম্বিসারের রাজবৈদ্য জীবক মগধের অধিবাসী ছিলেন। তিনি তক্ষশিলা হতে চিকিৎসা শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। মহাবর্গের চীবর-স্কন্ধ[৫৮] হতে জানা যায় যে, একদা অবন্তি রাজ্যের রাজা প্রদ্যেত জটিল পাণ্ডুরোগে আক্রান্ত হন। এ খবর শুনে মগধরাজ বিম্বিসার চিকিৎসক রাজা প্রদ্যেতের চিকিৎসার নিমিত্ত জীবককে অবন্তিরাজ্যে প্রেরণ করেন। তিনি অবন্তিরাজ প্রদ্যোতকে জটিল রোগ হতে সুস্থ করে তোলেন।

Dhaka University Institutional Repository

এতে বোঝা যায়, পাশ্ববর্তী রাজ্যের রাজার সঙ্গে মগধরাজ বিম্বিসারের সুসম্পর্ক ছিল। গান্ধার রাজ্যের রাজা পক্কুসাতির সঙ্গেও মগধরাজ বিম্বিসারের সুসম্পর্ক ছিল বলে জানা যায়।

বৌদ্ধ ঐতিহ্য[৫৯] সাক্ষ্য দেয় যে, রাজা বিম্বিসারের পুত্র রাজা অজাতশত্রু দেবদত্তের প্ররোচনায় প্রথম দিকে বুদ্ধের বিরোধিতা করলেও পরবর্তীতে তিনিও পিতার ন্যায় বৌদ্ধধর্মের অন্যতম পৃষ্ঠপোষককে পরিণত হন। সুমঙ্গলবিলাসিনী এবং ধম্মপদট্ঠকথা হতে জানা যায় যে, তিনি পিতার মৃত্যুর পর অনুশোচনায় দগ্ধ হতে থাকেন। অবশেষে রাজবৈদ্য জীবকের পরামর্শে বুদ্ধের নিকট গমন করে বুদ্ধের ধর্মে শরণ গ্রহণ করেন। দীর্ঘনিকায়[৬০] সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি বুদ্ধের নিকট সামঞ্ঞফল সূত্র শ্রবণ করে অতীব মুগ্ধ হন। ভরহুত স্তম্ভের খোদিত লিপি হতে জানা যায় যে, তিনি বুদ্ধকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। এতে লেখা আছে, 'অজাতসত ভগবতো বন্দতে'। দীর্ঘনিকায়ের অট্ঠকথা সুমঙ্গলবিলাসিনী[৬১] নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, তিনি বুদ্ধের অসম্মান সহ্য করতে পারতেন না। দীপবংস, মহাবংস এবং অন্যান্য বৌদ্ধ ঐতিহ্য সাক্ষ্য দেয় যে, বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর রাজা অজাতশত্রুর পৃষ্ঠপোষকতায় এবং মহাকশ্যপ স্থবিরের নেতৃত্বে রাজগৃহের বেভার পর্বতের সপ্তপর্ণী গুহায় প্রথম মহাসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, এই মহাসঙ্গীতি সাতমাস স্থায়ী হয়েছিল এবং এতে পাঁচশত অর্হৎ ভিক্ষুর উপস্থিতিতে বুদ্ধবাণী ধর্ম-বিনয় আকারে সংকলিত হয়েছিল। দিব্যাবদান গ্রন্থ সাক্ষ্য দেয় যে, বুদ্ধ এবং ভিক্ষুগণ রাজা অজাতশত্রুর বা বৈশালীর লিচ্ছবীগণ কর্তৃক প্রদত্ত নৌকা করে গঙ্গা নদী পার হতেন। বৌদ্ধ সাহিত্য পাঠে জানা যায় যে, বুদ্ধ মগধের অন্তর্গত রাজগৃহে ২৬ বার, উরুবেলায় ১৬ বার, পাটালীগ্রামে ২ বার, নালন্দায় ৯ বার, গয়াশীর্ষে ৫ বার, অন্দকবিন্দে ২ বার, দক্ষিগিরিতে ২ বার ধর্মদেশনা করেন। অর্থাৎ বুদ্ধ মগধে ৬৬ বারের অধিক ধর্মদেশনা করেন। তাছাড়া তিনি রাজগৃহে ৮ বারের অধিক বর্ষাবাস পালন করেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।[৬২] বুদ্ধবংস অট্ঠকথা[৬৩] হতে জানা যায়, বুদ্ধ প্রথম, তৃতীয়, চতুর্থ, সপ্তম এবং বিংশতম বর্ষবাস রাজগৃহে পালন করেন। এখানে তিনি আটানাটিয়, উদুম্বরিক, কস্‌সপসীহনাদ, জীবক, মহাসকুলদায়ী এবং সক্কপঞ্হ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র দেশনা এবং বিনয়ের অধিকাংশ বিধান বুদ্ধ এখানে প্রজ্ঞপ্তি করেন। উপরে বর্ণিত স্থানসমূহ ছাড়াও মগধে বুদ্ধ এবং বুদ্ধের প্রধান শিষ্যদের জীবনের স্মৃতি বিজড়িত আরো অনেক স্থান আছে, যেখানে অবস্থান করে বুদ্ধ ধর্মদেশনা করতেন এবং সাংঘিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : বেলুবন, কলন্দকনিবাপ, শীতবন, জীবকের আম্রবন, পিপ্পলগুহা, উদুম্বরিকারাম, মোরনিবাপ এবং তথাকার পরিব্রাজকারাম, তপোদারাম, বেদেহগিরির ইন্দশালগুহা, সপ্তপর্ণিগুহা, লট্ঠিবন, মদবদকুচ্ছি, সুপ্রতিষ্ঠিত চৈত্য, পাসাণচৈত্য, সপ্পসোণ্ডিকপব্ভার,

সুমাগধা পুষ্করণী, নারদগ্রাম, কুক্কুটারামবিহার, গৃধ্রকূট পর্বত, যষ্টিবন, উরুবিল্বগ্রাম, প্রভাসবন, কীটাগিরি, উপতিষ্যগ্রাম, সক্খার, চোদনাবত্থু এবং কোলিতগ্রাম প্রভৃতি অন্যতম। মূলত এসব গুরুত্বপূর্ণ স্থান রাজগৃহ এবং তাঁর চতুর্দিকে অবস্থিত ছিল।[৬৪] সমন্তপাসাদিকায়[৬৫] উল্লেখ আছে যে, বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের সময় রাজগৃহে আঠারটি বিশাল বিহার ছিল। মজ্ঝিমনিকায় এবং অঙ্গুত্তর নিকায় হতে জানা যায়, বুদ্ধশিষ্য আনন্দ, ভদ্দ এবং নারদ যখনই পাটলীপুত্রে আগমন করতেন তখন তাঁরা কুক্কুটারামে অবস্থান করতেন।[৬৬] সমন্তপাসাদিকা, দীপবংস এবং মহাবংসে উল্লেখ আছে যে, মগধ থেকেই ভারতের অভ্যন্তরে এবং বর্হিভারতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারক প্রেরণ করা হয়েছিল।[৬৭] কথাবত্থু গ্রন্থ[৬৮] মতে, বুদ্ধের অন্যতম শিষ্য সারিপুত্র এবং মৌদগল্যায়ন মগধের রাজগৃহে বুদ্ধের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। সংযুক্ত নিকায়ে[৬৯] উল্লেখ আছে যে, মগধের একনালা গ্রামে ভারদ্বাজ নামক একজন ব্রাহ্মণ বসবাস করতেন, যিনি বুদ্ধের নিকট দীক্ষা নিয়েছিলেন এবং নালক গ্রামে জম্বুখাদক নামক এক পরিব্রাজককে বুদ্ধের অন্যতম শিষ্য সারিপুত্র বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা দিয়েছিলেন। রাজগৃহে রাজা বিম্বিসারের চিকিৎসক জীবকের বিশাল এক আম বাগান ছিল। তিনি এখানে একটি বিহার তৈরি করে বুদ্ধকে দান করেন, যা জীবকারাম নামে পরিচিত ছিল।

ঐতিহাসিক আকর গ্রন্থ এবং বৌদ্ধ সাহিত্য পাঠে ধারণা করা যায় যে, রাজা বিম্বিসার এবং রাজা অজাতশত্রুর সময় থেকে মগধ উত্তর ভারতে রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সংযুক্ত নিকায়[৭০] হতে জানা যায় যে, কোশলরাজকে পরাজিত করার পর অজাতশত্রু সমগ্র উত্তর ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজা হিসেবে মর্যাদা লাভ করেন এবং উত্তর ভারতের রাজনীতি মগধকে ঘিরে আবর্তিত হতে শুরু করে।[৭১] বৌদ্ধধর্মের উদ্ভবকালে মগধ রাজনৈতিক এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র পরিণত হয় এবং সমগ্র ভারতের জনগণ ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য এখানে এসে ভীড় করতো। বহু ব্যবসায়িক মগধে বসবাস করতেন এবং মগধের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন।

উপরিউক্ত আলোচনা হতে ধারণা করা যায় যে, মগধরাজ বিম্বিসার এবং অজাতশত্রু বুদ্ধের সময়কালে ভারতবর্ষের শক্তিশালী রাজা ছিলেন এবং তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম ব্যাপক প্রচার প্রসার লাভ করেছিল।

২.৩. কাশী (কাসী)

অর্থব-বেদে কাশী জনগোষ্ঠির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। বায়ু পুরাণে উল্লেখ আছে যে, কাশি রাজ্য গোমতী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। জাতকে কাশীর সবচেয়ে বেশি উল্লেখ পাওয়া যায়। ফলে বুদ্ধের সময়ে কাশী খুবই সমৃদ্ধ জনপদ ছিল বলে ধারণা করা যায়। মহাবর্গে এ ধারণা সত্যতা পাওয়া যায়। মহাবর্গ[৭২]

Dhaka University Institutional Repository

মতে, প্রাচীন যুগে কাশী উন্নত এবং সম্পদশালী এলাকা ছিল। কাশির প্রাধান্য জৈন সাহিত্যেও স্বীকার করা হয়েছে। ভূরিদত্তজাতক (VI. p. 160) সাক্ষ্য দেয় যে, কাশী রাজ্য বার যোজন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তবে কাশীর রাজবংশীয় ইতিহাস অস্পষ্ট। জৈন সাহিত্য মতে, কাশীর রাজা অশ্বসেন ছিলেন তীর্থঙ্কর পার্শ্বের পিতা। শতপথ ব্রাহ্মণে ধৃতরাষ্ট্র (পালি ধতরট্‌ঠ) নামে কাশীর এক রাজার নামোল্লেখ পাওয়া যায়। মজ্ঝিমনিকায়ে[৭৩] কিকি এবং খন্তিবাদজাতকে (III. p. 39) কলাবু নামক দু'জন কাশীরাজের উল্লেখ পাওয়া যায়। ব্রহাছত্তজাতকে (III. p. 115) উল্লেখ আছে যে, কাশীর একরাজা বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে কোশলরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন এবং কোশলরাজকে বন্দি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মহাসীলবজাতক (I. p. 262) এবং উদানট্‌ঠকথা [৭৪] হতে জানা যায়, কাশীর রাজা মহাসীলব কোসলরাজ কর্তৃক ধৃত হয়েছিল। কোসাম্বীজাতক (III. p. 486), কুণালজাতক (V. p. 417) এবং মহাবর্গ (২৯৪-৯৯) সাক্ষ্য দেয় যে, কাশীর রাজা ব্রহ্মদত্তরা কোশল অধিকার করেছিলেন। ঐতিহ্য অনুসারে প্রাচীন যুগ থেকে কাশীর রাজাগণ ব্রহ্মদত্ত নামে পরিচিত ছিলেন। জাতকেও কখনো ব্রহ্মদত্ত, কখনো কাশীরাজ প্রভৃতি অভিধার উল্লেখ পাওয়া যায়। উপর্যুক্ত বিষয় বিবেচনা করে বলা যায়, উভয় রাজ্যের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধবিগ্রহ লেগে থাকত। অস্‌সকজাতকে (II. p. 155) পোতলি নগরকে কাশীর অধিনস্ত বলা হয়েছে। মূলত পোতলি ছিল অস্‌সক রাজ্যের বা জনপদের রাজধানী। ফলে ধারণা করা যায় যে, অস্‌সক কাশীর সামন্ত রাজ্য ছিল নতুবা কাশীরাজ পোতলি জয় করে নিয়েছিলেন। সোনন্দজাতক (Vol. V. pp. 315-317) পাঠে জানা যায় যে, বারণসীররাজ তথা কাশীরাজ মনোজ কোশল, অঙ্গ ও মগধ জয় করেছিলেন। ভাণ্ডরকরের মতে, জাতকে কাশীর যেসব রাজাদের নামোল্লেখ আছে তাঁদের নাম পুরাণেও উল্লেখ পাওয়া যায়।[৭৫] যেমন, আরামদূসজাতকের (II. p. 345) এ বিশ্বসেন, উদয়জাতকের (IV. p. 104) উদয় এবং ভল্লাটিয়জাতকের (IV. p. 437) ভল্লাটিয় প্রমুখ রাজাগণ পুরাণে বিশ্বসেন, উদকসেন এবং বল্লাট নামে উল্লেখ আছে। মহাভারতে বর্ণিত আছে যে, কাশীরাজ প্রতর্দন বীতহব্য বা হৈহয়দের ধ্বংস করেন। ভদ্দসালজাতক (IV. p. 144) এবং বিদূরপণ্ডিতজাতকে (VI. p. 257) কাশীর রাজাদের সার্বভৌম এবং সমগ্র জম্বুদ্বীপের অধিশ্বর হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

কাশীর রাজধানীর নাম ছিল বারাণসী, যা বর্তমানে বেনারস নামে পরিচিত। সঙ্খজাতক (IV. p. 15), যবঞ্জয়জাতক (IV. p. 119-20), সমুদ্দবানিজজাতক (IV. p. 160) পাঠে জানা যায় যে, বারাণসী সরুন্ধন, সুদর্শন, ব্রহ্মবর্ধন, পুষ্পবতী, রম্য বা রম্ম, মোলিনী প্রভৃতি নামেও পরিচিত ছিল। মহাবস্তু[৭৬] হতে জানা

Dhaka University Institutional Repository

যায় যে, বারাণসী নগরী বরণা (বরণবতী) নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। গুত্তিলজাতকে (II. p. 248) নগরটি সমগ্র জম্বুদ্বীপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল বলে উল্লেখ আছে। দিব্যাবদান[৭৭] গ্রন্থে নগরটি সমৃদ্ধ, বিস্তৃত এবং জনবহুল হিসেবে উল্লেখ আছে। চৈনিক পরিব্রাজকের ভ্রমণবৃত্তান্ত হতে জানা যায় যে, বারাণসী ছিল ৪০০০ লি (চার হাজার) পর্যন্ত বিস্তৃত এক জনবহুল স্থান। এ স্থানের আবহাওয়া ছিল মনোরম এবং এস্থানে প্রচুর ধান-শস্য উৎপন্ন হত।[৭৮] পতঞ্জলির মহাভাষ্যে কাশীর বস্ত্রের সুখ্যাতি কথা বর্ণিত আছে। অঙ্গুত্তরনিকায় এবং উদানট্ঠকথায় কাশির সুগন্ধির সুখ্যাতি সর্বত্র ব্যপ্ত ছিল।[৭৯] মহাস্সারোহজাতক (III. p. 11) এবং মহাসীলবজাতক (I. p. 262) সাক্ষ্য দেয় যে, বুদ্ধের পূর্বে কাশী খুবই শক্তিশালী রাজ্য ছিল। বারাণসীর পর বাসবগ্রাম, মচ্ছিকাসণ্ড, অনাথপিণ্ডিকের কম্মান্তগ্রাম, কীটাগিরি, ধম্মপালগ্রাম, আলবী প্রভৃতি কাশীর গুরুত্বপূর্ণ এলাকা বা নগরী ছিল বলে জানা যায়।[৮০]

সুজাত জাতক (III. p. 155) মতে, বুদ্ধের পূর্বে উত্তর ভারতের মধ্যে কাশী সবচেয়ে শক্তিশালী রাজ্য ছিল। পূর্বে কখনো কাশীর রাজা কোসল দখল করতেন, আবার কখনো কোসলের রাজা কাশী দখল করতেন। কিন্তু বুদ্ধের সময়ে কাশী রাজনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং কখনো কোশলের অধীনে, কখনো বা মগধের অধীনস্ত হয়ে শাসিত হতো। কাশীর অধিকার নিয়ে কোশলরাজ প্রসেনজিত এবং মগধরাজ অজাশত্রুর মধ্যে যুদ্ধ সংগঠিত হলেও শেষ পর্যন্ত কাশী মগধের অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়ে। সম্ভবত এ কারণে অঙ্গুত্তরনিকায়ে[৮১] কাশী-কোশল একত্রে উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাবস্তু[৮২] মতে, বুদ্ধের পূর্ব থেকেই কাশী অন্যতম বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। ধর্মপদ অট্ঠকথা হতে জানা যায় যে, কাশীর সঙ্গে শ্রাবস্তী এবং তক্ষশিলার বাণিজ্য সম্পর্ক ও যোগাযোগ ছিল। ভোজাজানিয় জাতকে (I. p. 178ff) উল্লেখ আছে যে, সকল রাজা বারাণসীর তথা কাশীর প্রতি লোভ ছিল। অসদিসজাতক (II. p. 86) সাক্ষ্য দেয় যে, একসময় কাশীর ধন-সম্পদের প্রতি লোলুপ ছিলেন এরূপ সাতজন রাজা বারাণসী অবরোধ করেছিলেন। সুসীমজাতক (II. p. 47) হতে জানা যায় যে, কাশীর জনগণ শিল্পকলা ও বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য তক্ষশিলা গমন করতেন।

মগধের ন্যায় কাশী রাজ্যও ছিল বুদ্ধের অন্যতম বিচরণ ক্ষেত্র। মহাবর্গ, মজ্ঝিমনিকায়, সংযুক্তনিকায়, কথাবত্থু, ললিতবিস্তর, সৌন্দরনন্দম্ এবং বুদ্ধচরিতম্ কাব্য সাক্ষ্য দেয় যে, কাশীর রাজ্যের রাজধানী বারাণসীর ইসিপতন বা ঋষিপতন মৃগদাবে এক আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে বুদ্ধ প্রথম পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের নিকট তাঁর নবলব্ধ ধর্ম প্রচার করেন, যা বৌদ্ধ সাহিত্যের ইতিহাসে 'ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র' নামে

অবিস্মরণীয় হয়ে আছে।[৮৩] কাশী জনপদের বারণসীর মৃগদাব হতে বৌদ্ধধর্মের যাত্রা শুরু হয়। ফলে বৌদ্ধধর্মের সূচনাস্থল হিসেবে কাশীর মৃগদাব বিশ্ব বৌদ্ধ জনগোষ্ঠির নিকট মহাতীর্থ স্থানে পরিণত হয়। বর্তমানে স্থানটি সারনাথ নামে পরিচিত। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে স্থানটি বৌদ্ধদের চারি মহাতীর্থস্থানের অন্যতম একটি হিসেবে মর্যাদা লাভ করেছে। কাশী জনপদের সঙ্গে বুদ্ধের জীবনের অসংখ্য স্মৃতি বিজড়িত আছে। বিশেষত কাশীর অন্যতম নগরী বারাণসী, কিটাগিরি এবং আলবীতে অবস্থান করে বুদ্ধ বহু গুরুত্বপূর্ণ সূত্র দেশনা করেছেন এবং অসংখ্য মানুষকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেছেন। সুত্তপিটকের অন্তর্গত পঞ্চনিকায় সাক্ষ্য দেয় যে, বুদ্ধ বারাণসীতে ১০ বার, আলবীতে ৬ বার এবং অন্যান্য স্থানে ১৭ বার ধর্ম-দেশনা করেন এবং প্রথম ও ষোলতম বর্ষাবাস পালন করেন যথাক্রমে বারাণসীর মৃগদাবে ও আলবী নগরে।[৮৪]

উপরোক্ত আলোচনা হতে ধারণা করা যায় যে, বুদ্ধের পূর্বে কাশী শক্তিশালী রাজ্য ছিল, কিন্তু বুদ্ধের সময়ে তা ক্রমশ দুর্বল হয়ে মগধের অধীনস্ত হয়ে যায়। তবে বুদ্ধের সময়েও কাশীর সমৃদ্ধি বজায় ছিল।

২.৪. কোশল (কোসল)

বৌদ্ধধর্মের সূচনাকালে কোশল ষোড়শ জনপদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি জনপদ বা রাজ্য ছিল। মগধের উত্তর পশ্চিমে কোশল রাজ্য অবস্থিত ছিল, যা কাশী জনপদেরও সীমানাসংলগ্ন ছিল। কোশল নামক জাতি বসবাস করতো বলে এ জনপদের নাম হয় কোশল। তবে সুত্তনপাতের অট্‌ঠকথা পরমখজ্যোতিকা এবং দীর্ঘনকিয়ের অট্‌ঠকথা সুমঙ্গলবিলাসিনী গ্রন্থে কোশল নামকরণের ভিন্ন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।[৮৫] গ্রন্থদ্বয় হতে জানা যায়, কোনো কিছুই মহাপধান নামক রাজকুমারকে হাসাতে পারছিল না। তখন তাঁর পিতা ঘোষণা করেন যে, যে ব্যক্তি রাজকুমারকে হাসাতে পারবে তাকে পুরস্কৃত করা হবে। ঘোষণা শুনে কোশলের জনগণ কাজকর্ম ত্যাগ করে রাজপ্রাসাদে সমবেত হন। কিন্তু তাঁরা কেউ রাজকুমাকে হাসাতে পারেনি। অবশেষে, দেবরাজ সক্ক এক দিব্য অভিনেতাকে প্রেরণ করে রাজকুমারকে আনন্দ দানপূর্বক মুখে হাসি ফোটান। অতপর, জনগণ ফিরে যাবার পথে এবং অন্যান্য বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে সাক্ষাতকালে পরস্পর পরস্পরকে 'কচ্চি ভো কুসলং, কচ্চি ভো কুসলং' এরূপ জিজ্ঞাসা করতে থাকেন। 'কুসল' শব্দটি বারবার উচ্চারণের কারণে 'কোশলে' পরিণত হয় এবং ঐ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জনপদটির নাম হয় কোশল। এ ঘটনা কতটুকু সত্যস্পর্শী বলা কঠিন। তবে কোশল রাজ্য পশ্চিমে সুমতি, দক্ষিণে সর্পিকা বা স্যন্দিকা বা সই নদী, পূর্বে সদানদী এবং উত্তরে নেপালের পার্বত্য অঞ্চলের মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থিত ছিল বলে জানা যায়।[৮৬] কোশলরাজ্য সরযূ নদী দ্বারা দুইভাগে বিভক্ত ছিল। যথা : উত্তর কোশল এবং দক্ষিণ কোশল। দীর্ঘনিকায়[৮৭] হতে জানা যায়, বুদ্ধের সময়ে কোশলের রাজধানী ছিল শ্রাবস্তী, যা সাকেত হতে ৬ লিগ (বিনয়পিটক মতে), রাজগৃহ হতে ৪৭ লিগ (সারত্থপ্পকাসিনী মতে), সাংকশ্য হতে ৩০ লিগ (সরভমিগজাতক, IV. p. 365) এবং তক্ষশিলা হতে ১৪৭লিগ (পপঞ্চসূদনী মতে) দূরে অবস্থিত ছিল।[৮৮] শ্রাবস্তীর বর্তমান নাম সাহেত-মাহেত, যা বর্তমান ভারতের গোণ্ডা জেলায় অবস্থিত। শ্রাবস্তী নামকরণের নানা তথ্য পাওয়া যায়। যেমন, শ্রাবস্তী (সাবত্থী) নামক এক ঋষি বসবাস করতেন বলে এ স্থানের নাম হয় শ্রাবস্তী (সাবত্থি)।[৮৯] পপঞ্চসূদনী নামক অট্ঠকথায় শ্রাবস্তী নামকরণের ভিন্ন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এ গ্রন্থ মতে, এ নগরীতে জীবন ধারণের উপযোগী 'সবকিছুই ছিল' অর্থাৎ 'সব্বং অত্থি'। এ কারণে নাম হয় সাবত্থী বা শ্রাবস্তী (সব্বং + অত্থি = সাবত্থি)। সমন্তপাসাদিকা মতে, বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীতে ৫৭ হাজার পরিবার বসবাস করত। ধম্মপদট্ঠকথায় উল্লেখ আছে যে, শ্রাবস্তীর নগর তোরণের বিপরীতে অবস্থিত গ্রামে পাঁচশত কৈবত্য পরিবার বসবাস করত।[৯০] কোশলের রাজধানী হিসেবে সাকেতের নামও উল্লেখ পাওয়া যা। মহাভারত এবং কতিপয় বৌদ্ধ সাহিত্য সাক্ষ্য দেয় যে, কোশলের প্রথম রাজধানী ছিল অযোধ্যা, তৎপরে ছিল সাকেত। সম্ভবত কোশল রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত থাকার কারণে রাজধানী হিসেবে শ্রাবস্তীর পাশাপাশি সাকেতেরও নামোল্লেখ পাওয়া যায়। শ্রাবস্তীর পর সাকেত দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ নগরী ছিল। এছাড়া, কোশলের অধীনে অনেক সামন্ত রাজ্য ছিল। সম্ভবত সেসব সামন্ত রাজ্যের প্রধান নগরগুলোও রাজধানীর মর্যাদা লাভ করেছিল। ধারণা করা হয়, শ্রাবস্তীর গুরুত্ব বেড়ে গেলে অন্যান্য রাজধানীগুলো পরিত্যক্ত হয়ে যায় এবং শ্রাবস্তী প্রধান রাজধানী হিসেবে আর্বিভূত হয়। শ্রাবস্তীর অনুকূলে পুরাতন বা অন্যান্য রাজধানীগুলো কখন পরিত্যক্ত হয় তা সঠিকভাবে জানা যায় যা। তবে প্রসেনজিতের সিংহাসন লাভের কিছুকাল পূর্বেই এ ঘটনা ঘটেছিল বলে অনুমান করা হয়। মহাপরিনির্বাণ সূত্র পাঠে প্রতীয়মান হয় যে, বুদ্ধের সময়ে অযোধ্য গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে এবং সাকেত ও শ্রাবস্তী জম্বুদ্বীপের ছয়টি মহানগরীরর মধ্যে অন্যতম নগরী হিসেবে স্থান করে নেয়। কেহ কেহ মনে করেন সাকেত ও অযোধ্য অভিন্ন স্থান। কিন্তু টি. ডব্লিউ. রীস ডেভিড্স[৯১] বুদ্ধের সময়ে উভয় নগরীর অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল বলে অভিমত প্রদান করেছেন। ভদ্দসালজাতক (IV. p. 144), অকিত্তিজাতক (IV. p. 236) এবং মহাকপিজাতকে (V. p. 68) শ্রাবস্তীর সমৃদ্ধি এবং গৌরবগাথা বর্ণিত আছে। বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তী উত্তর ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ জনপদ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

কোশলের রাজবংশের ইতিহাস অস্পষ্ট। রামায়ণ এবং পুরাণ থেকে জানা যায় যে, কোশলের রাজবংশ ইক্ষাকু নামক রাজার বংশধর ছিল। কুসজাতক এবং মহাবস্তু হতে জানা যায় যে, এই বংশের রাজাগণ কুশিনারা, মিথিলা ও বৈশালীতে রাজত্ব করতেন। মহাবর্গে[৯২] উল্লেখ আছে যে, প্রাচীনকালে কোশলে দীঘাতি নামক এক দরিদ্র, নির্ধন, নির্ভোগ, অল্পসৈন্য সম্পন্ন, অল্পবাহন সম্পন্ন, অল্পরাজ্য সম্পন্ন রাজা রাজত্ব করতেন। একরাজজাতকে (III. p. 13) দব্বসেন, ঘটজাতকে (III. p. 169) বঙ্ক, দীঘিতিকোসলজাতকে (III. p. 211-213) দীঘাবু, বড্ঢকিসূকরজাতক (II. p. 493) এবং তেসকুণজাতকে (V. p. 112) কংস নামক প্রমুখ রাজাগণ অতীতে কোশলে রাজত্ব করতেন এবং কাশীরাজ্যের রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ লিপ্ত ছিলেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়া, দীঘাতি, মল্লিক এবং ছত্ত প্রমুখ কোশলরাজগণও কাশীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন বলেন জাতকে উল্লেখ পাওয়া যায়।[৯৩] তবে তাঁদের রাজত্বকাল এবং জীবনী সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। হরিতমাতজাতক (II. p. 237), বড্ঢকিসূকরজাতক (II. p. 403), তচ্ছসূকরজাতক (IV. p. 342 প্রভৃতি জাতকে উল্লেখ আছে যে, রাজা মহাকোশল শ্রাবস্তীতে রাজত্ব করতেন। জাতক, মহাবর্গ এবং নিকায় গ্রন্থসমূহ সাক্ষ্য দেয় যে, রাজা মহাকোশল কোশলরাজ প্রসেনজিতের পিতা ছিলেন। বুদ্ধের সময়ে কোশলের রাজা ছিলেন প্রসেনজিত। ধম্মপদট্ঠকথা[৯৪] হতে জানা যায় যে, রাজকুমার প্রসেনজিত লিচ্ছবী রাজকুমার মহালী এবং মল্লরাজকুমার বন্ধুল-এব সঙ্গে তক্ষশিলায় বিদ্যা শিক্ষা করেন। প্রসেনজিতের বিদ্যায় পারদর্শিতা দেখে পিতা মহাকোশল অতীব সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন। সংযুক্ত নিকায়[৯৫] হতে জানা যায়, রাজপদ গ্রহণ করে প্রসেনজিত দক্ষতার সঙ্গে রাজ্য পরিচালনা করতেন। ফলে তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত হন। তিনি মল্লিকা নামক এক মালাকার কন্যাকে প্রধান মহিষী করেন। ধম্মপদট্ঠকথায়[৯৬] মগধরাজ বিম্বিসারের বোন এবং উব্বিরী নামক তাঁর আরো দুই পত্নির কথা উল্লেখ আছে। সোমা এবং সকুলা নামক দুই বোনও রাজা প্রসেনজিতের পত্নি ছিলেন বলে মজ্ঝিমনিকায়ে[৯৭] উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রসেনজিতের পর পুত্র বিড়ূড়ভ কোশলের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

কোশলের সঙ্গে মগধ এবং অন্যান্য পাশ্ববর্তী রাজ্যের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক প্রচলিত ছিল। ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি মগধরাজা বিম্বিসার ছিলেন কোশলরাজ প্রসেনজিতের ভগ্নিপতি। সংযুক্তনিকায় এবং তচ্ছসূকরজাতক (IV. p. 342-344) মতে, রাজা বিম্বিসার কোশল রাজকন্যা কোশলাদেবীকে বিবাহ করে কাশী জনপদ উপঢৌকন লাভ করেন।[৯৮] চুল্লধনুগ্গহজাতক (III. p. 219) সাক্ষ্য দেয় যে, কোশলের এক

Dhaka University Institutional Repository

রাজপুত্র বারণসী তথা কাশীর রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। তবে জাতকে সেই রাজপুত্রের নামোল্লেখ নেই। মজ্ঝিমনিকায়ে [৯৯] কোশল ও বৈশালীর মধ্যে মধুর সম্পর্কের কথা উল্লেখ আছে। সুসম্পর্কের পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহের সঙ্গে কোশলের যুদ্ধবিগ্রহও প্রচলিত ছিল। সংযুক্তনিকায় [১০০] এবং চূল্লহংসজাতক (V. p. 342) হতে জানা যায় যে, কাশী এবং কোশলরাজ্যের মধ্যে কয়েকবার যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল। দীর্ঘনিকায়ের লোহিচ্ছ সূত্র[১০১] পাঠে জানা যায় কোশলরাজ প্রসেনজিত কাশী রাজ্য তাঁর অধিনস্ত করেছিলেন। মহাবর্গ হতে জানা যায়, রাজা প্রসেনজিতের ভাই রাজপ্রতিনিধি হিসেবে কাশী রাজ্য শাসন করতেন। অজাতশত্রু পিতা বিম্বিসারকে হত্যা করে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করলে রাজা প্রসেনজিত ক্ষুব্ধ হয়ে মগধরাজ অজাতশত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কাশী পুনরায় কোশলের অধিভুক্ত করে নেন। অবশেষে মগধরাজ অজাতশত্রু কোশল রাজকন্যা বজিরাকে বিবাহ করে কোশল রাজ্য পুনরায় উপঢৌকন হিসেবে লাভ করেন। তখন থেকে কাশী মগধের অধিনস্ত হয়ে যায়। দীঘনিকায়ে[১০২] উল্লেখ আছে যে, কোশলরাজ প্রসেনজিত শাক্য রাজ্য কপিলাবস্তুকে কোশলের অধিনস্ত করেছিলেন। এখানে উল্লেখ্য যে, বুদ্ধ ছিলেন কপিলাবস্তুর রাজা শুদ্ধোধনের পুত্র। ফলে বুদ্ধের সময়ে কপিলাবস্তু কোশলে অধিনস্ত সামন্ত রাজ্য ছিল বলে ধারণা করা যায়। দীর্ঘনিকায়ের অগ্গপন্ন সুত্তন্ত[১০৩] এবং ভদ্দসাল জাতকের (IV. p. 145) ভূমিকাতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তছাড়া, মজ্ঝিমনিকায়ে[১০৪] বুদ্ধকে একজন কোশলবাসী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন : 'ভগবা পি কোসলকো অহমপি কোসলকো' অর্থাৎ ভগবানও কোশল আমিও কোশল। সুত্তপিটকের অন্তর্গত পঞ্চনিকায় হতে জানা যায়, সাকেত এবং শ্রাবস্তী ছাড়াও ইচ্ছাঙ্গল (*Aṅguttara Nikāya*, vol. III. pp. 30, 341), উক্কট্ঠ (*Dīgha Nikāya*, vol. I. p. 87), একসালা (*Saṃyutta Nikāya*, vol. I. p. 111), ওপসাদ (*Majjhima Nikāya*, vol. II. p. 290), কেসপুত্ত (*Aṅguttara Nikāya*, vol. I. p. 188), চণ্ডলকপ্প (*Majjhima Nikāya*, vol. II, p. 290), তোরণবত্থু (*Saṃyutta Nikāya*, vol. IV. p. 374), দণ্ডকপ্প (*Aṅguttara Nikāya*, vol. III. p. 402), নগরবিন্দ (*Majjhima Nikāya*, vol. III. p. 290), নলকপান (*Aṅguttara Nikāya*, vol. V. p. 122), নালন্দা (*Saṃyutta Nikāya*, vol. IV. p. 322), পঙ্কধা (*Saṃyutta Nikāya*, vol. I. p. 236), বেনাগপুর (*Aṅguttara Nikāya*, vol. I, p. 180), বেলুদ্বার (*Saṃyutta Nikāya*, vol. V. p. 352), সালা (*Majjhima Nikāya*, vol. I. p. 285; *Saṃyutta Nikāya*, vol. V. p. 227), সালাবতিকা (*Dīgha Nikāya*, vol. I. p. 288) এবং সেতব্য (*Dīgha Nikāya*, vol. II. p. 316) প্রমুখ কোশলের গুরুত্বপূর্ণ জনবসতিপূর্ণ এলাকা বা নগরী ছিল।[১০৫] দীর্ঘনিকায় (*Dīgha Nikāya*, vol. I. p. 103) এবং

Dhaka University Institutional Repository

সুমঙ্গলবিলাসিনী (*Sumaṃgalavīlāsīnī*, vol. I. pp. 244-45) হতে জানা যায়, কোশলরাজ প্রসেনজিত উক্কট্‌ঠনগরটি ব্রাহ্মণপুরোহিত পুক্করসাতিকে দান করেছিলেন। বিনয়পিটকে উল্লেখ আছে যে, সাকেত হতে শ্রাবস্তী যাওয়ার পথে ডাকাতের খুব উপদ্রব ছিল। সরযূ নদী ছাড়াও দীর্ঘনিকায়ে (১, ২৩৫) অচিরাবতী এবং সংযুক্তনিকায় (*Saṃyutta Nikāya*, vol. IV. p. 167) ও সুত্তনিপাত (পৃ. ৯৭) গ্রন্থে সুন্দরিকা নামক কোশলের আরো দুইট নদীর নাম উল্লেখ পাওয়া যায়।[১০৬]

পালি সাহিত্য সাক্ষ্য দেয় যে, বুদ্ধের সময়ে প্রসেনজিত ছিলেন কোশলের রাজা। মগধরাজ বিম্বিসার এবং অজাতশত্রুর ন্যায় তিনিও বৌদ্ধধর্মের প্রচার প্রসারে অনেক অবদান রাখেন। এ কারণে পালি সাহিত্যের ছত্রে ছত্রে কোশলরাজ প্রসেনজিতের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। সংযুক্ত নিকায়ের 'কোসল সংযুক্ত' নামক একটি অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে কোশলরাজ প্রসেনজিত ও বুদ্ধের মধ্যে সম্পর্কের নানা কাহিনি ও কর্মাবলী বর্ণিত আছে। মজ্ঝিমনিকায়, সংযুক্ত নিকায়, মহাসুপিনজাতক (I. p. 335), যবসকুণজাতক (III. p. 26), ভল্লাটিয়জাতক (IV. p. 437), সম্বুলজাতক (V. p. 88) এবং গণ্ডতিন্দুজাতক (V. p. 98) প্রভৃতি পাঠে জানা যায় যে, রাজা প্রসেনজিত রানি মল্লিকাদেবীর অনুরোধে রাজাকারাম বিহার নির্মাণ করে বুদ্ধকে দান করেন। রাজা প্রসেনজিত এবং রানি মল্লিকাদেবী বৌদ্ধধর্মের অনুসারী ছিলেন। তাঁরা এতই বুদ্ধ ভক্ত ছিলেন যে, প্রায় সময় বুদ্ধের নিকট গমন করতেন এবং রাজকার্য পরিচালনা বিষয়ে বুদ্ধের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। জনশ্রুতি আছে যে, রাজা প্রসেনজিত প্রথম বুদ্ধের মূর্তি নির্মাণ করেছিলেন। সুত্তপিটকের পঞ্চনিকায়, বিশেষত জাতক, সুত্তনিপাত, অঙ্গুত্তনিকায়, সংযুক্তনিকায় এবং বিনয়পিটক সাক্ষ্য দেয় যে, বুদ্ধ সবচেয়ে বেশি সময় অতিবাহিত করেন শ্রাবস্তীতে। সুত্তপিটকের পঞ্চনিকায় সমীক্ষায় দেখা যায়, বুদ্ধ কোশলের অন্তর্গত শ্রাবস্তীতে ৯১০ বার, নালকপনতে ৩ বার, বেরঞ্জাতে ৩ বার, সাকেতে ৫ বার ধর্ম দেশনা করেন।[১০৭] এছাড়া, বুদ্ধ শ্রাবস্তী এবং কপিলাবস্তুতে বর্ষাবাস পালন করেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। উল্লেখ্য যে, বর্ষাবাসের সময় ভিক্ষুদের একই স্থানে একত্রে তিনমাস সময় অতিবাহিত করতে হয়। ফলে বুদ্ধ উক্ত স্থানে বর্ষাবাস পালনকালে অসংখ্যবার ধর্মদেশনা করেছিলেন বলে অনুমান করা যায়। মহাবর্গ[১০৮] মতে, বুদ্ধ রাজগৃহ এবং শ্রাবস্তীতেই অধিক বসবাস করতেন এবং এ দু'টি স্থান হতেই তিনি অন্যান্য স্থানে যাতায়াত করতেন। মজ্ঝিমনিকায়ে[১০৯] উল্লেখ আছে যে, বুদ্ধ 'সালা' নামক এক ব্রাহ্মণ গ্রামে কয়েকদিন ব্যাপী ধর্মদেশনা করেন এবং ঐ গ্রামের ব্রাহ্মণদের সদ্ধর্মে দীক্ষা দান করেন। এ গ্রন্থ আরো সাক্ষ্য দেয় যে, নগরবিন্দ নামক ব্রাহ্মণ গ্রামের অধিবাসীদেরও বুদ্ধ দীক্ষা দান করেছিলেন। অঙ্গুত্তর নিকায়[১১০] হতে জানা যায়, বেনাগপুর ব্রাহ্মণ গ্রামের অধিবাসীরাও বুদ্ধের ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

সুত্তনিপাতে[১১১] উল্লেখ আছে যে, বুদ্ধ শ্রাবস্তীতে পরাভব সূত্র, মঙ্গল সূত্র, ব্রাহ্মণ ধনিক সূত্র, ধম্মিক সূত্র, সুভাসিত সূত্র প্রভৃতি দেশনা করেছিলেন। এ গ্রন্থ আরো সাক্ষ্য যে, বুদ্ধ শ্রাবস্তীতে অগ্নিক ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণকে বসল সূত্র দেশনা করে জাতিচ্যূতি বা বষল সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেন এবং বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা দান করেন। এছাড়া কোশলের সুন্দরিকা নদীরতীরে অবস্থানকালে বুদ্ধ সুন্দরিক ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণকে 'জাতি এবং প্রকৃত যজ্ঞ' সম্পর্কে শিক্ষা দানপূর্বক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা দান করেন। সুত্তনিপাতের পরায়নবর্গ হতে জানা যায়, বুদ্ধ কোশলে অবস্থানকালে ব্রাহ্মণ পুরোহিত ভারবী এবং অপর এক ব্রাহ্মণের দ্বন্দ্ব মীমাংসা করেন। মজ্ঝিমনিকায়[১১২] সাক্ষ্য দেয় যে, বুদ্ধ শ্রাবস্তীতে অবস্থানকালে মহিলাদের সংঘভূক্ত হবার আদেশ দিয়েছিলেন। ধম্মপদট্ঠকথা[১১৩] মতে, বিশিষ্ট ধনী ব্যবসায়ী সুদত্ত, মিগারমাতা বিশাখা এবং সুপ্পবাসা শ্রাবস্তীর অধিবাসী ছিলেন, যাঁরা বুদ্ধের পৃষ্ঠপোষক এবং সেবক ছিলেন। অনাথপিণ্ডিক নামে খ্যাত শ্রেষ্ঠী সুদত্ত বুদ্ধকে জেতবনারাম বিহার দান করেন। উল্লেখ্য যে, এ বিহারটি নির্মাণের জন্য জায়গাটি বুদ্ধের অগ্রশ্রাবক সারিপুত্র মনোনীত করেছিলেন। মূলত এটি ছিল 'জেত' নামক এক রাজকুমারের উদ্যান। তিনি এটি বিক্রয় করতে রাজি না হলে বুদ্ধভক্ত শ্রেষ্ঠী সুদত্ত জমির আয়তনের সমপরিমাণ স্বর্ণমূদ্রা ছড়িয়ে দিয়ে স্থানটি ক্রয় করেন এবং সেখানে জেতবন বিহার নির্মাণ করান। এই বিহারে ভিক্ষুদের বসবাসের জন্য শয়নকক্ষ, প্রার্থনা কক্ষ, রান্নাঘর, স্নানঘর, শৌচাগার, পুকুর, কুপ ও অন্যান্য ব্যবস্থাদি ছিল। জেত রাজকুমার এ বিহারের তোরণ নির্মাণ করে দেন। শ্রেষ্ঠী সুদত্ত ছিলেন দানবীর। সমগ্র জম্বুদ্বীপে তাঁর দানকর্মের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। অনাথদের পিণ্ড দান তথা ভরণ পোষণ করতেন বিধায় তিনি অনাথপিণ্ডিক নামে পরিচিতি লাভ করেন। বুদ্ধ এ বিহারে বসবাস করে অনেক ধর্মোপদেশ দান করেছিলেন। মজ্ঝিনিকায়ের অঙ্গুলীমাল সূত্র[১১৪] পাঠে জানা যায় যে, বুদ্ধ দস্যু অঙ্গুলীমালকে শ্রাবস্তীর এই জেতবন বিহারে দীক্ষা দান করেছিলেন। রানি মল্লিকা দেবীর অনুরোধে নির্মাণ করায় বিহারটি 'মল্লিকারাম' নামেও খ্যাত। মহাবস্তু [১১৫] হতে জানা যায়, বুদ্ধ জেতবনারামে বসবাস করে জনসাধারণকে ধর্মোপদেশ দান করতেন। সংযুক্তনিকায় গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদক ও সম্পাদক উডওয়ার্ড (F. L. Woodward) এর মতে, 'চতুনিকায়ের সূত্রগুলোর মধ্যে বুদ্ধ ৮৭১টি সূত্র শ্রাবস্তীতে, ৮৪৪টি সূত্র জেতবনে, ২৩টি পূর্বরামে এবং ৪টি গ্রামে ভাষণ বা দেশনা করেছিলেন।[১১৬] তন্মধ্যে দীর্ঘনকায়ে ৬টি, মজ্ঝিমনিকায়ে ৭৫টি, ৭৩৬টি সংযুক্ত নিকায়ে এবং অঙ্গুত্তর নিকায়ে ৫৪টি সূত্র সন্নিবেশিত করা আছে।' ধর্মপদট্ঠকথা এবং থের-থেরীগাথ পাঠে জানা যায় যে, বহু খ্যাতিমান ভিক্ষুণী শ্রাবস্তীর অধিবাসী ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন পটাচারা, কীসা গৌতমী, মহাপ্রজাপ্রতি গৌতমীপুত্র নন্দ, ধ্যানী কঙ্খারেবত এবং রাজা মহাকোশলের বোন থেরী সুম্মা।[১১৭]

২.৫. বৃজ্জি (বজ্জি)

আটটি জাতি বা কুলের সমন্বয়ে বৃজি বা বজ্জি রাজ্য গঠিত ছিল। আটটি জাতি বা কুলের সমন্বয়ে গঠিত মৈত্রীসংঘ অট্ঠকুলিকা নামে পরিচিত ছিল, যা দ্বারা বৃজ্জি রাজ্য পরিচালিত হতো। এই জাতিসমূহের মধ্যে বিদেহ, লিচ্ছবী এবং বজ্জিগণ ছিলেন প্রখ্যাত। অন্যান্য জাতিগুলো ছিল সম্ভবত এঞাত্রিক, উগ্র, ভোজ, ঐক্বাক। একটি জাতির নাম জানা যায় না। পাণিনির বিখ্যাত গ্রন্থ অষ্টাধ্যায়ীতে (৪র্থ পরিচ্ছেদ, ২. ১৩১) বজ্জি জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। অনেকে বজ্জি এবং লিচ্ছবীদের অভিন্ন জাতি মনে করেন। কিন্তু কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে বজ্জি এবং লিচ্ছবীদের পৃথক জাতি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। জাতিসমূহের মধ্যে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে লিচ্ছবীরা শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। বৈশালী লিচ্ছবীদের এবং মিথিলা বিদেহদের রাজধানী ছিল। বুদ্ধের সময়ে বৈশালী এবং মিথিলায় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। বুদ্ধের সময়ে বজ্জিরা খুবই সমৃদ্ধ জাতি ছিল। বুদ্ধ তাঁদের সাতটি অমূল্য উপদেশ প্রদান করেন, যা 'সপ্ত অপরিহানিয়' ধর্ম নামে পরিচিত। যতদিন তাঁরা এই উপদেশসমূহ মেনে চলেছেন ততদিন তাঁদের পরাজয় ঘটেনি। এই সাতটি উপদেশ তাঁরা মেনে চলতেন বলে রাজা অজাতশত্রু তাঁদের ধ্বংস করতে পারেন নি। সেই সাতটি অমূল্য উপদেশ হলো :

১. যতদিন বজ্জিগণ জনসাধারণের অবাধ সম্মেলনের আয়োজন করবে, ততদিন তাদের পতন না হয়ে উত্থান হবে।
২. যতদিন বজ্জিগণ নির্ধারিত কর্মসূচী একত্রে সম্পাদন করবে, ততদিন তাদের পতন না হয়ে উত্থান হবে।
৩. যতদিন বজ্জিগণ বয়োঃজ্যেষ্ঠদের সৎকার, পূজা, ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করবে, ততদিন তাদের পতন না হয়ে উত্থান হবে।
৪. যতদিন বজ্জিগণ কুলস্ত্রী ও কুল কুমারীদের বলপূর্বক ধৃত করে রক্ষিতায় পরিণত না করবে, ততদিন তাদের পতন না হয়ে উত্থান হবে।
৫. যতদিন বজ্জিগণ নগর এবং জনপদস্থ চৈত্যসমূহের সংস্কার করবে, ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করবে, পূজা করবে, ততদিন তাদের পতন না হয়ে উত্থান হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৬. যতদিন বজ্জিগণ অর্হৎগণের ধর্ম রক্ষা ও পালন করবে, ততদিন তাদের পতন না হয়ে উত্থান হবে।

৭. যতদিন বজ্জিগণ একত্রিত থাকবে, একত্রে উত্থান করবে, একত্রিত হয়ে করণীয়কার্য সম্পাদন করবে, ততদিন তাদের পতন না হয়ে উত্থান হবে।

বৈশালী আটটি জাতির প্রধান শহর হিসেবে গণ্য হতো। পালি অট্ঠকথা পপঞ্চসূদনী[১১৮] মতে, এ নগরী বিশাল ছিল বিধায় বৈশালী নামকরণ করা হয়। বৌদ্ধ ঐতিহ্য[১১৯] মতে, তিনটি জেলার সমন্বয়ে বৈশালী গঠিত ছিল। বর্তমান বিহার রাজ্যের মোজাফ্ফরপুর জেলার বেসার অঞ্চলে ছিল বৈশালীর ভৌগোলিক অবস্থান। বুদ্ধের সময়ে বৈশালী তিনটি প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল এবং একটি প্রাচীর থেকে আরেকটি প্রাচীরের দূরত্ব ছিল এক গাবুত। তাছাড়া তিনস্থানে পর্যবেক্ষণ স্তম্ভ (ওয়াচ টাওয়ার) এবং অট্ঠালিকাসহ তিনটি প্রবেশ দ্বার ছিল। লিচ্ছবীদের দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে বুদ্ধ বৈশালীতে আগমন করেছিলেন। এই শহরটি জনবহুল, প্রাচুর্যে ভরপুর, মনোরম এবং প্রসাদনীয় ছিল। বিনয়পিটক[১২০] হতে জানা যায়, এই শহরে ৭৭০৭টি বহুতল ইমারত, ৭৭০৭টি সুউচ্চ চূড়া সংযুক্ত ইমারত, ৭৭০৭টি আরাম, ৭৭০৭টি পদ্মপুকুর, বিজয় তোরণ এবং খেলাধূলার মাঠ ছিল। ললিতবিস্তর[১২১] গ্রন্থে অভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। মহাবস্তু[১২২] মতে, সৌন্দর্যে এ শহর ছিল অতুলনীয়। শস্য পূর্ণ হওয়ায় ভিক্ষা ছিল সহজ লভ্য। বিনয়পিটক[১২৩] সাক্ষ্য দেয় যে, বৈশালী ছিল জীবন ধারণের উপযোগী। যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল উন্নত। বৈশালী থেকে রাজগৃহ এবং বৈশালী থেকে কপিলাবস্তু যাওয়ার জন্য সুন্দর রাস্তা ছিল। বিনয়পিটক মতে, বুদ্ধ বৈশালীর মহাবনে অবস্থানকালে বহু শাক্য নারী বৈশালী এসে সংঘভূত হয়েছিলেন। এই গ্রন্থে আরো উল্লেখ আছে যে, বৈশালীর বালুকারামে রাজা কালাশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় দ্বিতীয় মহাসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বৈশালীর লিচ্ছবীরা বহু চৈত্য ও বিহার নির্মাণ করে বুদ্ধকে দান করেছিলেন। মহাবস্তু হতে জানা যায়, বৈশালীর বিখ্যাত গণিকা আম্রপালি বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘের বসবাসের জন্য বিশাল আম্রবাগান দান করেছিলেন। মগধ এবং কোশলের ন্যায় বৈশালীর আম্রবাগানে বা মহাবনের কূটাগার শালায় বুদ্ধ বহু গুরুত্বপূর্ণ সূত্র দেশনা করেন এবং এ নগরের সঙ্গেও বুদ্ধের জীবনের বহু গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতি বিজড়িত আছে।

দীর্ঘনিকায়ের মহাপরিনির্বাণ সূত্র[১২৪] হতে জানা যায়, লিচ্ছবীদের মধ্যে সৌহার্দ্য এবং সম্প্রীতি ছিল। সংযুক্তনিকায়ে [১২৫] পাঠে জানা যায় যে, বুদ্ধ লিচ্ছবীদের অপ্রমাদ পরায়ণ, উদ্যমী, পরিশ্রমী বলে অভিহিত করেছিলেন। তিনি আরো বলেন যে, লিচ্ছবীগণ আরাম আয়েশে জীবন যাপন করলে মগধরাজ

Dhaka University Institutional Repository

অজাতশত্রু তাঁদের পরাভূত করবে। বজ্জিরা যতদিন পর্যন্ত এই সৌহার্দ্য ধরে রাখতে পারবে ততদিন পর্যন্ত তাঁদের সমৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে। বৈশালীর সঙ্গে মগধের বন্ধুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল। সংযুক্ত নিকায় এবং সুমঙ্গলবিলাসিনী হতে আরো জানা যায় যে, অজাতশত্রু বিদেহপুত্র নামে খ্যাত ছিল।[১২৬] এর থেকে ধারণা করা যায় যে, রাজা বিম্বিসার বৃজ্জি রাজ্যের বিদেহীদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। মজ্ঝিমনিকায়[১২৭] সাক্ষ্য দেয় যে, লিচ্ছবীদের সঙ্গেও কোশলরাজ প্রসেনজিতের সুসম্পর্ক ছিল। তৎসত্ত্বেও মগধরাজ অজাতশত্রু লিচ্ছবীদের ধ্বংস করার পরিকল্পনা করেন। ফলে উভয়ের মধ্যে এক যুদ্ধ সূচনা হয়। অজাতশত্রু লক্ষ্য করলেন যে, লিচ্ছবীগণ এতই শক্তিশালী যে, সহজে তাঁদের ধ্বংস করা যাবে না। তখন তিনি বজ্জিরাজ্যে বসবাসরত জাতিদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করার জন্য বস্‌সাকার ও সুনীধ নামক মন্ত্রিদ্বয়কে প্রেরণ করেন। এ ক্ষেত্রে তাঁরা সাফল্য লাভ করলে অজাতশত্রু লিচ্ছবীদের পরাভূত করে বজ্জিরাজ্য দখল করেন।

বৈশালীর অন্যান্য যেসব স্থানে বুদ্ধ পরিভ্রমন করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলো : উক্কাচেলা, কোটিগ্রাম, নাদিক, বেলুবগ্রাম, ভণ্ডগ্রাম, ভোগগ্রাম, হত্থি বা হস্তিগ্রাম, পূব্ববিজ্ঝান (ছন্নের জন্মস্থান)। বজ্জিরাজ্যের মধ্যে বগ্গুমুদা নদী প্রবাহিত ছিল।[১২৮] মহানারদকস্‌সপজাতকে (VI. pp. 219-255) বজ্জিদের উল্লেখ আছে। এখানে উল্লেখ্য যে, বৌদ্ধসংঘে প্রথম বিভক্তি সৃষ্টি করে বজ্জি রাজ্যের ভিক্ষুগণ। হিউয়েন সাং[১২৯] এর মতে, বজ্জিরাজ্য পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত, কিন্তু উত্তর-দক্ষিণে সরু ছিল।

মজ্ঝিমনিকায়[১৩০] হতে জানা যায় যে, বজ্জিরা 'অট্‌ঠকুলিকার বা অষ্টকুলিকা' মাধ্যমে বিচার ও শাসন কার্য পরিচালনা করতেন। অট্‌ঠকুলিকা হচ্ছে আটজন প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত আইন পরিষদ। দীর্ঘনিকায়ের অট্‌ঠকথা সুমঙ্গলবিলাসিনী গ্রন্থে 'পুরানো বজ্জিধম্ম' নামক একটি অনুচ্ছেদ পাওয়া যায়। তাতে বজ্জিগণের তৎকালীন বিচার বিভাগীয় সংবিধানের বর্ণনা পাওয়া যায়। এই অনুচ্ছেদ হতে জানা যায় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রথমে বিচারের জন্য মন্ত্রির নিকট প্রেরণ করা হত। তাঁর নিকট সেই ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হলে মন্ত্রি তার দোষসমূহ পুনরায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে দেখতেন, যাতে নির্দোষ ব্যক্তি দণ্ডের শিকার না হয়। নিরপরাধ মনে করলে মন্ত্রি তাকে মুক্তি দিতেন। অপরাধী মনে হলে তিনি আইন বিষয়ে উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন বিচারক বোহারিকের নিকট মোকদ্দমা পুনঃ বিচারের জন্য প্রেরণ করতেন। বিনয় পিটকে উল্লেখ আছে রাজা বিম্বিসারও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কঠোর শাস্তি প্রদানের পূর্বে বোহারিকের সাথে পরামর্শ করতেন। মন্ত্রি এরং বোহারিকগণ স্বাধীনভাবে বিচার কার্য পরিচালনা করতেন। এ বিষয়ে

তাঁরা রাজার বাধ্যগত ছিলেন না। বোহারিকের নিকট দোষী সাব্যস্ত হলে তিনি বিষয়টি আইন তত্ত্বাবধায়ক সূত্রধরের নিকট প্রেরণ করতেন। বিচারের সময় সূত্রধরেরা স্বাধীনভাবে আইনগত ব্যবস্থা নিতেন। তাঁরা যদি পূর্ববর্তী বিচারকদের বিরুদ্ধে মত পোষণ করেন তা হলে সেই মোকদ্দমা পুনঃ বিচারের জন্য অট্‌ঠকুলিকা বা অষ্টকুলিকাদের নিকট প্রেরণ করতেন। অট্‌ঠকুলিকা'র প্রতিনিধিগণ অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ সম্বন্ধে নিশ্চিত হলে তাঁরা আবার বিচার বিভাগীয় বিধান সভার প্রধান সেনাপতির নিকট প্রেরণ করতেন। এভাবে সেনাপতি উপরাজের নিকট, উপরাজ রাজার নিকট প্রেরণ করে ফৌজদারী আইন বিধি অনুসারে সেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান করতেন।

উপর্যুক্ত আলোচনা হতে ধারণা করা যায় যে, বুদ্ধের সময়েও ফৌজদারী আইন-বিধি প্রচলিত ছিল। বিচার-বিভাগীয় এই প্রক্রিয়ার জন্য বজ্জিগণ প্রভূত যশ-খ্যাতি অর্জন করেন। বজ্জিদের বিচার পদ্ধতি ব্রিটিশ আইনের সাথে বেশ মিল লক্ষ্য করা যায়। ধারণা করা হয়, 'ব্রিটিশ জুরির বিচার' বা 'অ্যাসেসর' বিধিবদ্ধ করণে বজ্জিদের বিচার পদ্ধতির প্রভাব রয়েছে।

২.৬. মল্ল

এই রাজ্যটিও মল্ল জাতির নামানুসারে নামকৃত। বুদ্ধের সময়ে রাজ্যটি দুইভাগে বিভক্ত ছিল এবং রাজধানীও ছিল দু'টি। যথা : পাবা এবং কুশিনারা। পাবার মল্লগণ 'পাবেয্যক-মল্ল' এবং কুশিনারার মল্লগণ 'কুসিনারকা' নামে পরিচিত ছিল। দীর্ঘনিকায়ে[১৩১] কুশিনারা মল্লদের শহর হিসেবে উল্লেখ আছে। বুদ্ধ এবং আনন্দের কথোপকথন থেকে ধারণা করা যায় যে, কুশিনারা রাজগৃহ, বৈশালী এবং শ্রাবস্তীর মতো প্রথম সারির মর্যাদা সম্পন্ন শহর ছিল না। কুশিনারায় মহাপরিনির্বাণের ইচ্ছা পোষণ করলে আনন্দ বুদ্ধকে কুশিনারা সম্পর্কে বলেন, 'জঙ্গলের ভেতর অবস্থিত কদমাক্ত ক্ষুদ্র শহর কুশিনগরে ভগবান তথাগতের মহাপরিনির্বাণ লাভ না হোক। চম্পা, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, সাকেত, কোশাম্বী এবং বারাণসী প্রভৃতি নগরে বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণ লাভ করুক।' কুশিনগরে অল্প সংখ্যক মানুষ বসবাস করতেন এবং স্থানটি ছিল মরুভূমি এবং নোংরা।[১৩১] কানিংহাম আধুনিক গোরক্ষপুর জেলার পূর্বে অবস্থিত 'কাশিয়া' নামক স্থানকে কুশিনারা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আবিষ্কৃত শিলালেখ হতে কানিংহামের ধারণা সত্য বলে প্রতিপন্ন হয়। এ স্থানে একটি তাম্র-অনুশাসন আবিষ্কৃত হয়, তাতে 'পরিনির্বাণ-চৈত্য-তম্রপট্ট-ইতি' এরূপ উল্লেখ আছে।[১৩২] ভি. এ. স্মিথ (V. A. Smith) নেপালের পর্বত শ্রেণি পর্যন্ত কুশিনারা বিস্তৃত ছিল বলে মনে করেন।[১৩৩] এ সম্পর্কে টি. ডব্লিউ. রীস্ ডেবিড্‌স[১৩৪] বলেন, 'চৈনিক ভ্রমণবিদ্‌দের বর্ণনা পর্যালোচনা করে

Dhaka University Institutional Repository

বলা যায়, শাক্যরাজ্যের পূর্বে এবং বজ্জিদের উত্তরে পর্বতের পাদদেশে কুশিনারা অবস্থিত ছিল।' কিন্তু কিছু গবেষক মনে করেন, শাক্য রাজ্যের দক্ষিণে এবং বজ্জিদের পূর্বে মল্লদের কুশিনারা অবস্থিত ছিল। দীর্ঘনিকায় হতে জানা যায়, কুশিনারার নিকটে হিরণ্যবতী নদী বা ছোট গণ্ডক নদী প্রবাহিত হতো, যার তীরে মল্লদের শালবন অবস্থিত ছিল, যেখানে বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণ লাভ করেছিলেন। এ স্থানটি বর্তমান গোরক্ষপুর জেলার আট মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। সুমঙ্গলবিলাসিনী [১৩৫] মতে, কুশিনারা রাজগৃহ থেকে ২৫ যোজন দূরে অবস্থিত ছিল। কুসজাতক (II. p. 278-280), মহাপরিনির্বাণ সূত্র এবং মহাসুদর্শন সূত্র পাঠে জানা যায় যে, মল্লদের প্রথম রাজধানী ছিল কুশাবতী। দীর্ঘনিকায়[১৩৬] সাক্ষ্য দেয় যে, কুশাবতী সমৃদ্ধ, জনবহুল এবং ধনী রাষ্ট্র ছিল। সেখানে ভিক্ষা সহজ লভ্য ছিল। কুশিনারার মল্লদের সভাকক্ষ ছিল, যেখানে সকল প্রকার রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় বিষয় আলোচনা করা হত। অপরদিকে, গোরক্ষপুর জেলার পূর্বে অবস্থিত গণ্ডক নদীর তীরের স্থান কাশিয়াকে পাবা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। কানিংহাম[১৩৭] পদরুনা নামক গ্রামকে পাবা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, যেখানে প্রচুর প্রত্নিদর্শন রয়েছে। জৈনধর্মের প্রবর্তক মহাবীর পাবার রাজা স্বস্তিপাল নির্মিত প্রাসাদে বসবাস করতেন বলে জানা যায়।[১৩৮] যাহোক, উপরের আলোচনা হতে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, কুশিনারা এবং পাবা মিলে মল্ল রাজ্য গঠিত ছিল।

মল্ল রাজ্যের রাজনৈতিক ইতিহাস তেমন একটা জানা যায় না। কুসজাতক (কুশজাতক) (II. p. 278-280), মহাপরিনির্বাণ সূত্র এবং মহাসুদর্শন সূত্র সাক্ষ্য দেয় যে, মল্ল রাজ্যে প্রথমে রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। মজ্ঝিমনিকায়ে[১৩৯] মল্ল রাজ্যকে সংঘরাজ্য বা গণরাজ্য হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। ফলে ধারণা করা যায় যে, পরবর্তীতে অর্থাৎ বুদ্ধের সময়ে মল্লগণ রাজতন্ত্রের পরিবর্তে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। মহাপরিনির্বাণ সূত্রে [১৪০] 'পুরিস' নামক মল্ল রাজ্যের রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তার উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁদের কার্য ও কর্তব্য সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ পাওয়া যায় না। ধর্মপদের[১৪১] ভণ্ডুল কাহিনি হতে জানা যায় যে, মল্ল এবং লিচ্ছবীদের মধ্যে রাজনৈতিক সুসম্পর্ক ছিল, যদিও কখনো কখনো উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত দেখা দিত। ভদ্দসালজাতকে মল্ল এবং লিচ্ছবীদের মধ্যে সংঘর্ষের কথা উল্লেখ আছে। মনু[১৪২] লিচ্ছবীদের ন্যায় মল্লদেরও ক্ষত্রিয় হিসেবে অভিহিত করেন। কুশজাতকে ওক্কাক বা ইক্ষাকু নামক এক মল্ল রাজার নামোল্লেখ পাওয়া যায়। এর থেকে ধারণা করা যায় যে, শাক্যদের ন্যায় মল্লগণও ইক্ষাকু বংশ-উদ্ভুত হিসেবে পরিচয় দিতেন। মহাপরিনির্বাণ সূত্রে মল্লগণ বাসেট্ঠ গোত্রের অন্তর্গত ছিল বলে উল্লেখ আছে। মহাসুদর্শন সূত্রে মহাসুদর্শন নামক এক মল্ল রাজার কথা বর্ণিত আছে। জৈনকল্প সূত্রে [১৪৩] উল্লেখ আছে যে, নয়জন মল্ল রাজা লিচ্ছবী, কাশী-কোশল এবং মগধরাজ অজাতশত্রুর বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ

Dhaka University Institutional Repository

হয়ে সংগ্রামে লিপ্ত হন। কিন্তু পরবর্তীতে মল্ল রাজ্য মগধের অন্তর্গত হয়ে যায়। খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে মল্ল রাজ্য মৌর্যরাজবংশের অধিভূক্ত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়।

দীর্ঘনিকায়[১৪৪] হতে জানা যায়, কুশিনারায় বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণ লাভ করলে সেখানে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা হয় এবং মল্লগণ বুদ্ধের দেহধাতু লাভ করার জন্য কুশিনারায় দূত প্রেরণ করেন। এর থেকে বুঝা যায়, মল্ল এবং পাবা দুটি স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। সঙ্গীতি সূত্রে উল্লেখ আছে যে, বুদ্ধ পাঁচশত ভিক্ষুসংঘসহ পাবার কর্মকার চুন্দের আম্রবনে অবস্থান করে ধর্ম দেশনা করেন। পাবার মল্লগণও উব্‌ভটক নামক এক সভাকক্ষ নির্মাণ করেন এবং সেখানে আতিথেয়তা গ্রহণ ও ধর্মদেশনার জন্য প্রথমে বুদ্ধকে আমন্ত্রণ করেন। জানা যায়, বুদ্ধ সেখানে অবস্থান করে গভীর রাত্রী পর্যন্ত ধর্ম দেশনা করেন। দীর্ঘনিকায়[১৪৫] আরো সাক্ষ্য দেয় যে, বুদ্ধ মল্লের অধিবাসী চুন্দের গৃহে শেষ আহার 'শুকরমদ্দব' গ্রহণ করেন এবং পাবা থেকে কুশিনারায় গমন করে উপবত্তন নামক শালবনে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। তৎপর মকুট-বন্ধন-চৈত্যে তাঁর দেহ সৎকার করা হয়। সৎকারের পর বুদ্ধের দেহধাতু আটভাগে বিভক্ত করে সংরক্ষণ করা হয়। কুশিনারা এবং পাবার মল্লগণ তাঁদের লব্ধ দেহধাতু চৈত্য নির্মাণ করে সংরক্ষণ করেন।

বুদ্ধের সময়কালে মল্লের রাজধানী কুশিনারার গুরুত্ব ছিল সামান্য। বুদ্ধের অন্যতম শিষ্য আনন্দ কুশিনারাকে জঙ্গলের ভেতর মাটির প্রাচীরে ঘেরা ক্ষুদ্র শহর হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পূর্ব অবধি শহরটির তেমন খ্যাতি ছিল না। মজ্ঝিমনিকায়ে[১৪৬] মল্ল গণরাজ্য হিসেবে উল্লেখ আছে। দীর্ঘনিকায়ের অট্‌ঠকথা সুমঙ্গলবিলাসিনী[১৪৭] গ্রন্থ মতে, মল্লগণ দলবেঁধে দূরদূরান্তে বাণিজ্যের জন্য গমন করতেন। মল্ল রাজ্যে নিগণ্ঠনাথপুত্র এবং বুদ্ধের বহু শিষ্য ছিলেন। মল্লের অধিবাসী বুদ্ধ শিষ্যদের মধ্যে দব্বথের, পক্কুস থের, খণ্ডসুমন, ভদ্রগক এবং সীহ থের প্রমুখ ছিলেন অন্যতম। মল্ল রাজ্যের অন্তর্গত বুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত অন্যান্য স্থানসমূহ হলো : ভোগনগর, অনুপিয়া, উরুবেলকপ্প। পালি নিকায় গ্রন্থে বুদ্ধ মল্ল রাজ্যের অন্তর্গত পাবায় ৩ বার, কুশিনারায় ৭ বার, উরুবেলাকপ্পতে ৩ বার এরং অনুপিয়তে ২ বার ধর্ম দেশনা করেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।[১৪৮]

২.৭. চেতি বা চেদী

ভারতের প্রাচীনতম উপজাতিদের মধ্যে চেতি বা চেদিগণ ছিল অন্যতম। এ জাতির বসবাস স্থল চেতি রাজ্য নামে পরিচিতি লাভ করে। সুত্তনিপাতের অট্‌ঠকথা[১৪৯] সাক্ষ্য দেয় যে, চেতি নামক রাজার

নামানুসারে চেতি রাজ্যের নামকরণ হয়েছিল। ঋক্‌বেদে প্রথম চেতি-বাসীদের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু চেতি রাজ্যের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তাছাড়া, রাজ্যটির ভৌগোলিক অবস্থান নিয়েও মতানৈক্য লক্ষ্য করা যায়।

পণ্ডিতগণ, বিশেষত টি. ডব্লিউ. রীস ডেবিড্‌স এবং জি. পি. মালালাসেকেরা ধারণা করেন, চেতিগণ দুই স্তরে বসতি স্থাপন করেছিলেন। প্রথম বসতি স্থাপন করেন বর্তমান নেপালের পার্বত্য অঞ্চলের সন্নিকটে।[১৫০] এ ধারণার সত্যতা পাওয়া যায় বেস্‌সান্তর জাতকে। বেস্‌সান্তর (VI. 514-15) জাতকে উল্লেখ আছে যে, রাজা বেস্‌সান্তর তাঁর জন্মস্থান জেতুত্তনগর হতে ৩০ যোজন দূরে অবস্থিত হিমালয়ে নির্বাসনে গিয়েছিলেন। চেতিয়জাতক (III. p. 454) হতে জানা যায় যে, সোত্থিবতীনগর ছিল প্রথম চেতি রাজ্যের রাজধানী এবং সেখানে 'অপচর' নামক রাজা রাজত্ব করতেন। মহাভারতে (III. 20, 50, XVI. 83) বর্ণিত সুক্তিমতি এবং সোত্থীবতীনগর অভিন্ন বলে ধারণা করা হয়। চেতিয়জাতকে চেতি রাজকুলের বংশ তালিকা পাওয়া যায়। এ তালিকা মতে, চেতিরাজগণ মহাসম্মত ও মান্ধাতার বংশধর। চেতিরাজ উপচরের পাঁচপুত্র ছিল। কথিত আছে তাঁরা হত্থিপুর, অস্সপুর, সীহপুর, উত্তর পাঞ্চাল ও দদ্দপুর নামে পাঁচটি নগর প্রতিষ্ঠা করেন এবং পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন রাজবংশের প্রবর্তন করেন। মহাভারতে চেতিরাজ ধর্মঘোষ, তাঁর পুত্র শিশুপাল সুনীত, শিশুপালের পুত্র ধৃষ্টকেতু ও শরভের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু এসব রাজাগণের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব প্রমাণ করা কঠিন। হাতিগুম্ফ শিলালেখ থেকে জানা যায় যে, পরবর্তীকালে চেতিগণের একটি শাখা কলিঙ্গে একটি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[১৫১]

চেতিগণ পরবর্তীতে বসতি স্থাপন করেন যমুনা নদীর তীরে এবং কুরু রাজ্য সংলগ্ন অঞ্চলে। এ রাজ্যটি বর্তমান বুন্দেলখণ্ড (Bundelkhand) ও তার পার্শ্ববতী অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল। অঙ্গুত্তর নিকায়ে[১৫২] সহজাতি এবং ত্রিপুরী নামক নগরদ্বয় চেতি রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ নগর হিসেবে উল্লেখ আছে। বেদব্‌ভজাতকে (I. p. 253) সাক্ষ্য দেয় যে, চেতি থেকে কুরু রাজ্যে যাওয়ার রাস্তা নিরাপদ ছিল না এবং রাস্তাটিতে ডাকাতদের উপদ্রব ছিল।

অঙ্গুত্তর নিকায়ে[১৫৩] হতে জানা যায়, চেতি বৌদ্ধধর্মের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল এবং বুদ্ধ শিষ্য অনুরুদ্ধ চেতি রাজ্যে বসবাস করার সময় অর্হত্ব ফলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এ গ্রন্থ আরো সাক্ষ্য দেয় যে, ভিক্ষু মহাচুন্দ চেতি রাজ্যের সহজাতি নগরে বসবাস করার সময় বহুবার ধর্মদেশনা করেন। দীর্ঘনিকায়ে[১৫৪] বুদ্ধ

চেতিরাজ্যে গমন করে ধর্মদেশনা করেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। সংযুক্ত নিকায়ে[১৫৫] বর্ণিত আছে যে, চেতিরাজ্যে বসবাসরত ভিক্ষুগণ চতুরার্য সত্য বিষয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করেছিলেন। প্রাচীনবংসদায় এবং ভদ্দবর্তিকা চেতির গুরুত্বপূর্ণ দু'টি নগর ছিল, যেখানে বুদ্ধ অবস্থান করে ধর্মদেশনা করেছিলেন।[১৫৬]

এছাড়া, বুদ্ধের সমকালীন চেতি রাজ্যের রাজন্যবর্গ ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে জাতকে তেমন কোনো তথ্য পাওয়া যায় না।

২.৮. বংশ (বংস/বৎস)

প্রাচীন সাহিত্যে রাজ্যটি বংশ, বংস এবং বৎস নামে উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু বিক্ষিপ্ত কিছু তথ্য ছাড়া বংশ বা বংস রাজ্যের রাজনৈতিক, ভৌগোলিক ও আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। কণ্হদীপায়নজাতক (কৃষ্ণদ্বৈপায়ন) (IV. pp. 28-31) সাক্ষ্য দেয় যে, বংশ রাজ্য কোশলের দক্ষিণে অবস্থিত ছিল এবং এর রাজধানী ছিল কোশাম্বী (কৌশাম্বী), যা যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। সংযুক্তনিকায়ে[১৫৭] কোশাম্বীকে গাঙ্গেয় তীরবর্তী অঞ্চল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু অঙ্গুত্তর নিকায়, পপঞ্চসূদনী এবং পটিসম্ভিদামগ্গ নামক অট্ঠকথায় এ নগরটি যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত ছিল বলে উল্লেখ আছে।[১৫৮] গঙ্গার দক্ষিণ তীরে বর্তমানকালের এল্হাবাদ জেলার নিকটে অবস্থিত 'কোসম' নামক স্থানকে কোশাম্বী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কানিংহামের[১৫৯] মতে, এল্হাবাদের ৩০ মাইল উত্তরপশ্চিমে যমুনানদীর তীরে কোশাম্বীর অবস্থিত ছিল। টি. ডব্লিউ. রীস ডেবিড্স[১৬০] এর মতে, বংশ রাজ্য অবন্তির উত্তরে এবং যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। ধোনসাখ জাতক (III. p. 158-160) এবং মহাভারতে বংশদেরকে বৎস হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। মহাভারত (অধ্যায় ১২, শ্লোক ৪৯, ৮০) এবং হরিবংশ (হরিবংশ, ২৯, ৭৩) গ্রন্থ মতে, চেতির এক রাজকুমার কোশাম্বী নগর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পুরাণে এবং স্বপ্নবাসবদত্তা[১৬০] গ্রন্থে উক্ত আছে যে, হস্তিনাপুর গঙ্গায় বিলীন হয়ে গেলে ঐ রাজ্যের এক রাজপুত্র কোশাম্বীতে রাজধানী স্থানান্তর করেন। কণ্হদীপায়নজাতক এবং কুক্কুটজাতক (IV. p. 56) পাঠে জানা যায় যে, প্রাচীনকালে কৌশাম্বিক নামক এক রাজা কোশাম্বীতে রাজত্ব করতেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, বংশ রাজ্য আর্থিকভাবে খুবই সমৃদ্ধ ছিল এবং এ সমৃদ্ধির মূলে ছিল কার্পাস শিল্প।

দল্হধম্ম বা দৃঢ়ধর্মজাতক (III. p. 284-85) হতে জানা যায় যে, বুদ্ধের সময়কালে উদয়ন ছিলেন বংশ রাজ্যের রাজা। ভাসের স্বপ্নবাসবদত্তা, হর্ষবর্ধনের রত্নাবলী এবং প্রিয়দর্শিকা - এ তিনটি নাটক রাজা

Dhaka University Institutional Repository

উদয়নের জীবন-কাহিনি নিয়ে রচিত অর্থাৎ এ তিনটি নাটকের নায়ক ছিলেন রাজা উদয়ন। এ তিনটি নাটকের মাধ্যমে তিনি বিশ্বে অমর হয়ে আছেন। মহাকবি কালিদাসের সময় অবন্তিতে রাজা উদয়নের কাহিনী বহুল প্রচলিত ছিল।[১৬১] স্বপ্নবাসবদত্তা গ্রন্থ মতে, কোশাম্বীরাজ উদয়ন ভরতকুলের বংশধর ছিলেন। ধোনসাখ জাতক পাঠে ধারণা করা যায় যে, বুদ্ধের সময়কালে ভগ্গ বা সুংসুমারগিরি বংশ রাজ্যের অধিনস্ত ছিল। কারণ উক্ত জাতক সাক্ষ্য দেয় যে, ঐ সময় বংশরাজ উদয়নের পুত্র বোধি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে সেখানে বসবাস করতেন। মহাভারত এবং হরিবংশ গ্রন্থদ্বয়ের তথ্য এ ধারণার সত্যতা প্রতিপন্ন করে। দীর্ঘনিকায়ে[১৬২] কোশাম্বী সমৃদ্ধ নগরী হিসেবে উল্লেখ আছে, যেখানে বুদ্ধশিষ্য আনন্দ বুদ্ধকে মহাপরিনির্বাণ লাভের জন্য অনুরোধ করেছিলেন। থেরগাথা, সংযুক্ত নিকায় এবং মাতঙ্গজাতক (IV. pp. 374-379) হতে জানা যায় যে, কোশাম্বীর রাজা উদয়নের পুরোহিত পুত্র পিণ্ডোল ভারদ্বাজ বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে কোশাম্বীর বিখ্যাত ঘোষিতারাম বিহারে বাস করতেন।[১৬৩] কথিত আছে যে, রাজা উদয়ন প্রথম দিকে বৌদ্ধধর্মের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি পিণ্ডোল ভারদ্বাজের নিকট ধর্মোপদেশ শ্রবণে মুগ্ধ হয়ে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। তৎপর পিণ্ডোল ভারদ্বাজ প্রচেষ্টায় এবং রাজা উদয়নের পৃষ্ঠপোষকতায় বংশ রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম ব্যাপক প্রচার প্রসার লাভ করে এবং কোশাম্বী বৌদ্ধধর্মের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র পরিণত হয়। বুদ্ধ কোশাম্বীর ঘোষিতারামে অবস্থান করে বহুবার ধর্মদেশনা করেন। কোসাম্বীজাতক (III. pp. 486-487) পাঠে জানা যায় যে, বুদ্ধ ঘোষিতারাম বিহারে অবস্থান কালে একদা দু'দল ভিক্ষু বিবাদে জড়িয়ে পড়েন। বুদ্ধ বিবাদ মীমাংসা করতে ব্যর্থ হয়ে এবং বিবাদগ্রস্থ ভিক্ষুদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে তাঁদের ত্যাগ করে পারিল্যেয় বনে চলে যান। সেখানে বনের পশুপাখি বুদ্ধের সেবা করত। তখন ভাদ্রপূর্ণিমা দিবসে এক বানর বুদ্ধকে মধু দান করেন। বুদ্ধকে সেই মধু তৃপ্তিভরে পান করতে দেখে বানর খুশিতে অভিভূত হয়ে এক বৃক্ষ হতে অন্য বৃক্ষে লাফিয়ে আনন্দ প্রকাশ করতে থাকে এবং হঠাৎ নীচে পড়ে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে। বুদ্ধ দিব্য দৃষ্টিতে দেখলেন যে, বানরটি দানের পুণ্যফলে তাবতিংশ স্বর্গে জন্মগ্রহণ করে দিব্যসুখ ভোগ করছে। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসের বানরের মধুদানের ঘটনাটি অবিস্মরণীয় হয়ে আছে এবং বৌদ্ধবিশ্ব প্রতিবছর মধুদানের মাধ্যমে দিবসটি পালন করে। এ কারণে ভাদ্রপূর্ণিমাকে মধুপূর্ণিমাও বলা হয়। উল্লেখ্য যে ভিক্ষুগণ তাঁদের ভুল বুঝতে পেরে পারিল্যেয় বনে গমন করে বুদ্ধের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং বুদ্ধকে পুনারায় কোশাম্বীতে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। বুদ্ধ ঘোষিতারাম বিহারে ভিক্ষুদের প্রতিপালনীয় বহু বিনয় বিধান প্রচলন করেন। বংশ রাজ্যের রাজধানী কোশাম্বিতে বুদ্ধের জীবদ্দশাতেই কয়েকটি বৌদ্ধবিহার নির্মিত হয়েছিল। পালি সাহিত্যে উল্লেখ আছে যে, বিহার গুলোতে অবস্থান করে বুদ্ধ জনসাধারণকে ধর্ম

Dhaka University Institutional Repository

দেশনা করতেন। উপর্যুক্ত কারণে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে রাজগৃহ এবং শ্রাবস্তীর পরেই কোশাম্বীকে স্থান প্রদান করা হয়েছে। কোশাম্বী ছাড়া বালকলোণকারগ্রাম, পারিল্যেয়ক, ভগ্গ (সুংনুসারগিরি) এবং প্রয়াগ প্রভৃতি বংশ রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ নগরী বা স্থান ছিল, যেখানে বুদ্ধের অনেক স্মৃতি বিজড়িত আছে। বুদ্ধ কোশাম্বী, ভগ্‌গ এবং সুংসুমারগিরিতে প্রায় ১৯ বার ধর্ম দেশনা করেন বলে পালি সাহিত্যে উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়াও, বৌদ্ধ সাহিত্যে উল্লেখ আছে যে, বুদ্ধ অষ্টম বর্ষাবাস সুংসুমারগিরিতে, নবম বর্ষাবাস কোশাম্বীতে এবং দশম বর্ষাবাস পারিলেয়্যক বনে পালন করেন।[১৬৪]

২.৯. কুরু

প্রাচীন সাহিত্যে দু'টি কুরু রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা : উত্তর কুরু এবং দক্ষিণ কুরু। ঋগ্‌বেদে যে কুরু রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায় বি.সি. ল্য তা উত্তর কুরু হিসেবে চিহ্নিত করেন।[১৬৫] টি. ডব্লিউ. রীস ডেবিড্‌স [১৬৬] এর মতে, কুরু রাজ্যের পূর্বে পঞ্চাল এবং দক্ষিণে মৎস্য রাজ্য অবস্থিত ছিল। এর রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ নতুন দিল্লীর নিকটে অবস্থিত ছিল। হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর[১৬৭] মতে, বর্তমান থানেশ্বর, দিল্লী এবং গাঙ্গেয় উপত্যকার অধিকাংশ অঞ্চল নিয়ে কুরু রাজ্য গঠিত ছিল। মহাসুতসোম জাতক (V. pp. 456-460) মতে, কুরু রাজ্য তিনশত লিগ বিস্তৃত ছিল এবং এর রাজধানী ইন্দ্রপস্থ (ইন্দপত্ত) সাত লিগ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু সুমঙ্গলবিলাসিনী[১৬৮] গ্রন্থে কুরু রাজ্য আট হাজার যোজন বিস্তৃত ছিল বলে উল্লেখ আছে। বৌদ্ধ সাহিত্যে দক্ষিণ কুরুর প্রচুর উল্লেখ পাওয়া যায়। পালি অট্‌ঠকথা পপঞ্চসূদনী গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে কুরু রাজ্যের রাজারা কুরু নামে অভিহিত হতেন। দীর্ঘনিকায়ের অট্‌ঠকথা সুমঙ্গলবিলাসিনী মতে, রাজা মন্ধতা চারি মহাদ্বীপ পরিভ্রমণ করে জম্বুদ্বীপে ফিরে আসার সময় উত্তর কুরু বা হিমালয়ের পরপারের অঞ্চলের বহু লোক তাঁর সঙ্গে জম্বুদ্বীপে আসে। তারা যেখানে বসবাস করত সেস্থান কুরু রাজ্য নামে পরিচিতি লাভ করে। ধূমকারিজাতক (III. p. 400) এবং দসব্রাহ্মণজাতক (IV. p. 361) সাক্ষ্য দেয় যে, কুরু রাজ্যের রাজারা যুধিষ্ঠিরের বংশধর ছিল। কুরুধর্মজাতক (II, pp. 365-369), ধূমকারীজাতক, সম্ভবজাতক (V. p. 87), বিধুরপণ্ডিতজাতক (VI. p. 255) মতে, এ রাজ্যের রাজা ছিলেন ধনঞ্জয় কৌরব্য। দসধম্মজাতক (IV. p. 361) এবং মহাসুতসোমজাতক (V. p. 457) মতে কৌরব্য এবং সুসোম ছিলেন কুরু রাজ্যের রাজপুত্র। হত্থিনীপুর (যা হস্তিনীপুর বলে ধারণা করা হয়), থুল্লকোট্‌ঠিত, কম্মাসদস্‌স, কুন্দ, বারণাবত প্রভৃতি কুরু রাজ্যের অন্যতম নগরী ছিল। কুরু রাজ্যের মধ্যদিয়ে অরুণা নদী প্রবাহিত হতো। এছাড়া, অংশুমতি, হিরণবতী, আপয়, কৌশিকী, স্বরস্বতী এবং রাখী প্রভৃতি নদীগুলো কুরু রাজ্যের

Dhaka University Institutional Repository

অঞ্চল দিয়ে বয়ে যেত। কুরুদের সঙ্গে পঞ্চালগণের বৈবাহিক সম্বন্ধের কথা জানা যায়। কিন্তু পরবর্তীকালে সে ঐক্য বিনষ্ট হয়ে যায় এবং কুরু রাজ্যে রাজতন্ত্রের পরিবর্তে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

কামনীতজাতক (II. p. 214) হতে জানা যায় যে, অতীতকালে পঞ্চাল, কুরু এবং কেক শক্তিশালী রাজ্য ছিল, কিন্তু বুদ্ধের সময়কালে কুরু রাজ্যের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি তেমন ছিল না। বুদ্ধের সময়কালে কুরু রাজ্যের রাজা ছিলেন কৌরব্য। বুদ্ধশিষ্য রট্‌ঠপাল থের ধর্মদেশনা করে তাঁকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন এবং রট্‌ঠপাল থের সেসময় রাজা কৌরব্যরাজের মিগাচীরা নামক উদ্যানে বসবাস করতেন।[১৬৯] থেরগাথা[১৭০] গ্রন্থে উল্লেখিত রট্‌ঠপাল থের কুরু রাজ্যের থুল্লকোট্‌ঠিত নগরে এক সম্ভ্রান্তবংশে জন্মগ্রহণ করেন বলে জানা যায়। অঙ্গুত্তর নিকায়, সংযুক্তনিকায়, মজ্ঝিমনিকায়, দীর্ঘনিকায় প্রভৃতি গ্রন্থ সাক্ষ্য দেয় যে, বুদ্ধ কুরু রাজ্যে অবস্থান করে বহু ধর্ম দেশনা করেন এবং এখানকার বহু লোক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন।[১৭১] দীঘনিকায়ে[১৭২] উল্লেখ আছে যে, বুদ্ধ কুরু রাজ্যের কম্মাসদস্‌স নগরে 'মহানিদান' এবং 'মহাসতিপট্‌ঠান' সূত্র দেশনা করেন। উক্ত নগরে বুদ্ধ চার বার ধর্ম দেশনা করেন বলে জানা যায়।[১৭৩] ধম্মপদট্‌ঠকথা হতে জানা যায় যে, কোশলরাজের এক পুরোহিত বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে কুরু রাজ্যে বসবাস করতেন। সোমনস্‌সজাতকে (IV. p. 444) উত্তর পঞ্চাল কুরু রাজ্যের একটি নগর হিসেবে উল্লেখ আছে। ফলে পঞ্চাল রাজ্যের উত্তরাঞ্চল এক সময় কুরুদের অধিনস্ত ছিল বলে ধারণা করা যায়। কুরু রাজ্যের লোকেরা সুস্বাস্থ্য এবং অসীম প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন বলে জানা যায়। কারণ বুদ্ধ তাঁদের মহানিদান এবং মহাসতিপট্‌ঠান নামক কঠিন তত্ত্ব সম্পন্ন সূত্র দেশনা করেছিলেন। তাছাড়া, মাগন্দিয় সূত্র, আনঞ্জসপ্পায় সূত্র, সম্মোস সূত্র এবং অরিয়বসা সূত্র প্রভৃতিও দেশনা করেন। এ সকল সূত্র কম্মাসদস্‌স নগরে দেশনা করেছিলেন।

46996

২.১০. পঞ্চাল

পঞ্চাল রাজ্য সম্পর্কে খুবই সামান্য তথ্য পাওয়া যায়। দিব্যাবদান,[১৭৪] কুম্ভকারজাতক (III. p. 376) এবং মহাভারত (১৩৮, ৭৩-৭৪) সাক্ষ্য দেয় যে, কুরু রাজ্যের ন্যায় পঞ্চাল রাজ্যও উত্তর এবং দক্ষিণ এ দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। ভাগীরথী (গঙ্গা) নদী পঞ্চাল রাজ্যকে দু'ভাগে বিভক্ত করে রেখেছিল। দিব্যাবদান[১৭৫] গ্রন্থে উত্তর পঞ্চালের রাজধানী হস্তিনাপুর বলে উল্লেখ আছে। কিন্তু কুম্ভকারজাতক মতে উত্তর পঞ্চালের রাজধানী ছিল কম্পিল্লনগর এবং সেখানকার রাজা ছিলেন দুম্মুখ। আবার, মহাভারত অনুসারে উত্তর পঞ্চালের রাজধানী ছিল অহিচ্ছত্র বা ছত্রবতী, যা বর্তমানে বেরিলী জেলার রামনগর

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। মহাভারত আরো সাক্ষ্য দেয় যে, দক্ষিণ পঞ্চালের রাজধানী ছিল কাম্পিল্য, যা বর্তমান ফরাক্কাবাদ জেলার কম্পিল বা কাম্পিল্য নামক স্থান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে (মহাভারত, ১৩৮, ৭৩-৭৪)। ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি সোমনস্‌সজাতক সাক্ষ্য দেয় যে, উত্তর পঞ্চাল কুরু রাজ্যের অন্তর্গত ছিল এবং হস্তিনাপুর ছিল এর রাজধানী। অপরদিকে, ব্রহ্মদত্তজাতক (III. pp. 78-79), জয়দ্দিসজাতক (V. p. 21) এবং গণ্ডিতিন্দুজাতক (V. p. 98-99) প্রভৃতি সাক্ষ্য দেয় যে, উত্তর পঞ্চাল কম্পিল্লরাজ্যের অংশ ছিল এবং কম্পিল্লরাজ্যের রাজা কখনো কখনো উত্তর পঞ্চালের নগরে দরবার বসাতেন। আবার কুম্ভকারজাতক (III. p. 376) সাক্ষ্য দেয় যে, উত্তর পঞ্চালের রাজা কখনো কখনো কম্পিল্লনগরে দরবার বসাতেন। উপরের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় কুরু এবং পঞ্চাল রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ লেগে থাকত, সময় বিশেষে উভয় রাজ্যের অংশ বিশেষের শাসন ক্ষমতা রদবদল হতো। মহাউম্মার্গজাতক (VI. p. 330) এবং স্বপ্নবাসবদত্তা (পঞ্চম অঙ্ক) এবং রামায়ণে (১, ৩২) চূলনি ব্রহ্মদত্ত নামক এক পঞ্চাল রাজের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। মহাউম্মার্গজাতকে উল্লেখ আছে যে, মন্ত্রি কেবত্ত রাজা ব্রহ্মদত্ত চূলনিকে ভারতের সার্বভৌম রাজা করার পরিকল্পনা গ্রহণ পূর্বক মিথিলা অবরোধ করেছিলেন।

পঞ্চাল রাজ্যের ভৌগোলিক সীমারেখা বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক লক্ষ্য করা যায়। টি. ডব্লিউ. রীস ডেবিড্‌স[১৭৬] পঞ্চাল রাজ্যের বর্তমান ভৌগোলিক সীমারেখা সম্পর্কে বলেন, কুরুর পূর্বে অবস্থিত পর্বতশ্রেণি এবং গঙ্গার মধ্যবর্তী অঞ্চলে পঞ্চাল রাজ্য অবিস্থত ছিল। হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর[১৭৭] মতে, রোহিলখণ্ড এবং মধ্য দোয়াবের একাংশ নিয়ে পঞ্চাল রাজ্য গঠিত ছিল। সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায়[১৭৮] হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর সঙ্গে একমত পোষণ করেন এবং বলেন, অন্যভাবে বললে বলা যায়, বর্তমানের বুদাউন, ফরাক্কাবাদ (ফরুখবাদ) এবং তৎসংলগ্ন উত্তর প্রদেশের জেলাসমূহ নিয়ে পঞ্চাল রাজ্য গঠিত ছিল। বি. সি. ল্য[১৭৯] এর মতে, পঞ্চাল রাজ্য মূলত দিল্লীর উত্তর-পশ্চিমে হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত ছিল, যা ছম্বল নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু তা গঙ্গা নদীর দ্বারা উত্তর এবং দক্ষিণ পঞ্চাল এ দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। পণ্ডিতদের অভিমত বিশ্লেষণ করে বলা যায়, হিমালয়ের পাদদেশ সংলগ্ন অঞ্চলেই ছিল পঞ্চাল রাজ্যের অবস্থান।

বুদ্ধের সমকালীন পঞ্চাল রাজ্যের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে তেমন কিছুই জানা যায় না। কিন্তু থেরগাথার অট্ঠকথা এবং সংযুক্ত নিকায়ে উল্লেখ আছে যে, পঞ্চাল রাজকন্যার পুত্র বিশাখ ছিলেন মগধের এক আঞ্চলিক প্রশাসকের পুত্র।[১৮০] তিনি বুদ্ধের নিকট দীক্ষা লাভ করে অর্হত্ব ফলে অধিষ্ঠিত হন। তিনি

Dhaka University Institutional Repository

বুদ্ধের ধর্ম দেশনা ব্যাখ্যায় পারদর্শী ছিলেন। বুদ্ধ তাঁর ব্যাখ্যা শুনে ভূয়শী প্রশংসা করেন। বিশাখের মাতা যেহেতু পঞ্চালের রাজকন্যা ছিলেন, সেহেতু ধারণা করা যায় বুদ্ধের সময়ে পঞ্চালে রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল এবং পঞ্চাল স্বাধীন রাজ্য হিসেবে শাসিত হতো। সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের[১৮১] মতে, খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ বা পঞ্চম শতকের দিকে পঞ্চালে রাজতন্ত্র বিলুপ্ত হয়ে প্রজাতন্ত্র শাসন প্রবর্তিত হয়েছিল। বুদ্ধের সময়ে সোরেয়্য, সাংকাশ্য, কর্ণকুব্জ পঞ্চালের অন্যতম নগর ছিল। সুত্তবিভঙ্গে[১৮২] উল্লেখ আছে যে, বুদ্ধ উক্ত নগরসমূহে অবস্থান করে ধর্ম দেশনা করেন।

২.১১. মৎস্য (মচ্চ)

ঋগবেদ[১৮৩] মতে, মৎস্য রাজ্য ইন্দ্রপ্রস্থের দক্ষিণ বা দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং সূরসেন রাজ্যের দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। বিদূরপণ্ডিতজাতক (VI. p. 255) পাঠে জানা যায় যে, মৎস্য রাজ্যের অধিবাসীগণ কুরুরাজের পাশা খেলা দেখেছিলেন। ফলে মৎস্য রাজ্য যে কুরু রাজ্যের নিকটবর্তী ছিল তা সহজে অনুমান করা যায়। টি. ডব্লিউ রীস ডেবিড্স[১৮৪] এর মতে, মৎস্য রাজ্য কুরুর দক্ষিণে এবং যমুনার পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। বি. সি. ল্য এবং সুনীল চট্টোপাধ্যায় বর্তমান ভারতের জৈপুর বা জয়পুর অঞ্চলই মৎস্য রাজ্য হিসেবে চিহ্নিত করেন। তাঁরা বলেন, বর্তমান ভারতের আলোয়ার এবং ভরতপুরের কিছু অংশ নিয়ে মৎস্য রাজ্য গঠিত ছিল।[১৮৫] হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর মতে, চম্বলের পার্বত্য অঞ্চল ও স্বরসতী নদীর প্রান্ত দেশের বনাঞ্চল, এই দুয়ের মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছিল মৎস্য রাজ্য।[১৮৬] মৎস্য রাজ্যের রাজধানীর নাম ছিল বিরাটনগর বা বিরাট। জি. পি. মালালাসেকেরো এবং বি. সি. ল্য এর মতে, মৎস্যরাজ বিরাটের নামানুসারে রাজধানীর নামকরণ করা হয়েছিল বিরাটনগর।[১৮৭] অর্থশাস্ত্রে সংঘশাসিত রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে মৎস্য রাজ্যের নামোল্লেখ নেই। মহাভারতে 'সহজ' নামক চেতি বা চেদিরাজকে মৎস্য রাজ্যের শাসক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর থেকে ধারণা করা যায়, মৎস্য রাজ্য মহাভারত রচনাকালীন সময়ে চেতিরাজের অধীনস্ত ছিল। জাতকে মৎস্য রাজ্য সম্পর্কে সামান্য তথ্যই পাওয়া যায় না। তবে দীঘনিকায়ের[১৮৮] জনবসভ সূত্রে উল্লেখ আছে যে, বুদ্ধ নাতিকে অবস্থানকালে মৎস্যরাজ্যের অধিবাসীগণ বুদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং বুদ্ধ তাঁদের ধর্মোপদেশ দান করেন।

২.১২. শূরসেন (সূরসেন)

শূরসেন রাজ্য সম্পর্কে খুব সামান্য তথ্য পাওয়া যায়। বৈদিক সাহিত্যে শূরসেন এবং মথুরার উল্লেখ নেই। খণ্ডহালজাতকে (VI. p. 137) উল্লেখ আছে যে, শূরসেন রাজ্যের অধিবাসীগণ পঞ্চাল এবং মৎস্যদের

Dhaka University Institutional Repository

সঙ্গে কুরুরাজ ধনঞ্জয় কৌরব্য এবং পুণ্নক যক্ষের মধ্যে অনুষ্ঠিত পাশাখেলা দর্শন করেছিল। এর থেকে বোঝা যায়, শূরসেন রাজ্যটি কুরু রাজ্যের নিকটে অবস্থিত ছিল। টি. ডব্লিউ. রীস ডেবিড্স[১৮৯] এর মতে, শূরসেন মৎস্য রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। জি. পি. মালালাসেকেরার[১৯০] মতে, শূরসেন কুরু রাজ্যের দক্ষিণে অবস্থিত ছিল এবং মথুরা ছিল এ রাজ্যের রাজধানী। হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী এবং সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের মতে শূরসেনের রাজধানী মথুরা কোশাম্বীর ন্যায় যমুনার তীরে অবস্থিত ছিল।[১৯১] সাংকশ্য (তাবতিংশ স্বর্গ হতে বুদ্ধের অবতরণের স্থল) হতে মথুরার দূরত্ব ছিল চার যোজন।[১৯২] বৎস রাজ্যের রাজধানী মথুরা বর্তমানে মাহোলি নামে পরিচিত, যা বর্তমান মথুরা শহরের ৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ছিল।[১৯৩] মহাভারতে এবং পুরাণে মথুরায় যদুবংশ রাজত্ব করতেন বলে উল্লেখ আছে। ঘটজাতক (IV. p. 50-52) হতে জানা যায়, মহাসাগর নামক এক রাজা মথুরায় রাজত্ব করতেন এবং তাঁর দুই পুত্রসন্তান ছিল। এ জাতকে কৃষ্ণ বাসুদেবের পরিবার সঙ্গে মথুরার সম্পর্কের কথাও উল্লেখ আছে। পতঞ্জলি এবং ঘটজাতকে কৃষ্ণকর্তৃক কংসবধের উল্লেখ আছে।

পালি সাহিত্যে মথুরায় বৌদ্ধধর্মীয় কার্যক্রম সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায়। বুদ্ধের সমসাময়িককালে শূরসেনের রাজা ছিলেন অবন্তিপুত্র। অবন্তীপুত্র নাম থেকে ধারণা করা যায় যে, শূরসেন এবং অবন্তির মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক প্রচলিত ছিল। রাজা অবন্তিপুত্র বুদ্ধশিষ্য মহাকচ্চায়নের সমসাসময়িক এবং বুদ্ধের অন্যতম প্রধান উপাসক ছিলেন। তাঁর সহায়তায় মথুরা অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম প্রচার প্রসার লাভ করে। মেগাস্থিনিসের সময় শূরসেন মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। মজ্ঝিমনিকায়ে[১৯৪] বুদ্ধশিষ্য মহাকচ্চায়ন কর্তৃক মথুরাতে জাতিভেদ বিষয়ক ধর্মোপদেশ দানের কথা উল্লেখ আছে। অঙ্গুত্তরনিকায়[১৯৫] গ্রন্থ হতে জানা যায় যে, বুদ্ধ মথুরা হতে বেরঞ্জ যাবার প্রাক্কালে বহু উপাসক উপাসিকা কর্তৃক পূজিত হন। বিমানবত্থুর অট্ঠকথায়[১৯৬] উল্লেখ আছে যে, উত্তর মথুরার এক উপাসিকা বুদ্ধকে ভিক্ষা দান করে তাবতিংশ স্বর্গে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

২.১৩. অস্সক (অশ্মক)

প্রাচীন ঐতিহাসিক আকর গ্রন্থসমূহে অস্সক বা অশ্মক সম্পর্কে খুবই কম তথ্য পাওয়া যায়। সুত্তনিপাত (গাথা নং ৯৭৭) গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, বাবরী নামক এক ব্রাহ্মণ অস্সক রাজ্যের গোদাবরী নদীর তীরে বসবাস করতেন। এর থেকে বোঝা যায়, অস্সক রাজ্য গোদাবরী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। দীর্ঘনিকায়ের মহাগোবিন্দ সূত্র[১৯৭] হতে জানা যায় যে, পোটন ছিল অস্সক রাজ্যের রাজধানী। বিমানবত্থু অট্ঠকথায়ও অস্সক রাজ্যের রাজধানীর হিসেবে পোটনগরের উল্লেখ আছে।[১৯৮] মহাভারত মতে, অস্সক নামক এক রাজর্ষি পোটন বা পোদন নগর প্রতিষ্ঠা করেন। সোননন্দজাতকে (V. p. 317) অঙ্গ-মগধের

Dhaka University Institutional Repository

ন্যায় যুক্তভাবে অস্‌সক-অবন্তির নামোল্লেখ আছে। চূল্লকালিঙ্গজাতক (III. p. 3-5) সাক্ষ্য দেয় যে, দন্তপুরের রাজা কলিঙ্গ এবং পোটনের রাজা অশ্মকের মধ্যে প্রথম বৈরী সম্পর্ক ছিল। পরবর্তীতে কলিঙ্গরাজের কন্যাকে অশ্মকরাজ বিবাহ করলে উভয়ের মধ্যে সুসম্পর্ক তৈরি হয়। চূল্লকালিঙ্গজাতক (III. p. 3) এবং সোননন্দজাতক আরো সাক্ষ্য দেয় যে, অরুণ নামক এক অস্‌সকরাজ নন্দিসেন নামক মন্ত্রীর সহায়তায় কলিঙ্গরাজকে পরাজিত করেছিলেন। এর থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অস্‌সক ও কলিঙ্গ পাশাপাশি অবস্থিত ছিল। টি. ডব্লিউ. রীস ডেবিড্‌স এবং বি. সি. ল্য মনে করেন, অস্‌সক রাজ্য অবন্তির উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ছিল।[১৯৯] অস্‌সকজাতকে (II. p. 155) উল্লেখ আছে যে, অশ্মক নামক এক রাজা কাশীর পোটলী (পোতলী) নামক স্থানে রাজত্ব করতেন। এর থেকে বোঝা যায়, অস্‌সক রাজ্যের রাজধানী এক সময় কাশীর অধীনস্ত ছিল, যা বিভিন্ন সময় পোটন, পোদন বা পোটনগর, পোটলী বা পোতলী প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিল।

সংস্কৃত সাহিত্যে অস্‌সক রাজ্যকে 'অশ্মক' বা 'অশ্বক' প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়েছে। বৃহৎসংহিতা এবং মার্কেণ্ডেয় পুরাণে অস্‌সক রাজ্য ভারতীয় ভূখণ্ডে উত্তর-পশ্চিমে দিকে অবস্থিত ছিল। কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রের ভাষ্যকার ভট্টস্বামীন অস্‌সক রাজ্য বর্তমান মহারাষ্ট্রে অবস্থিত ছিল বলে উল্লেখ করেন। অসঙ্গ অস্‌সক রাজ্য সিন্ধু নদীর তীরবর্তী বলে উল্লেখ করেছেন। হাতিগুম্ফ শিলালেখতে উল্লেখ আছে যে, রাজা সাতকর্ণী অস্‌সক রাজ্যের দুর্বৃত্তদের আঘাত করেছিলেন। বি. সি. ল্য[২০০] এর মতে, চূল্লকালিঙ্গজাতক, সুত্তনিপাত এবং হাতিগুম্ফ শিলালেখতে বর্ণিত অস্‌সক একই বা অভিন্ন রাজ্য ছিল, যা বৌদ্ধ মজ্ঝিমদেশ বা মধ্যদেশ বর্হিভূত ছিল। বিমানবত্থু অট্‌ঠকথায়[২০১] বুদ্ধশিষ্য মহাকচ্চায়ন কর্তৃক এক অস্‌সকরাজের বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হওয়ার কাহিনি পাওয়া গেলেও উক্ত অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মীয় কার্যক্রম সম্পর্কে তেমন কিছুই উল্লেখ পাওয়া যায় না।

২.১৪. অবন্তি

অবন্তি বিন্দপর্বতের উত্তরে এবং মুম্বাইয়ের (বম্বের) উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত বর্তমান মালওয়া বা মালব, নিমার এবং মধ্যপ্রদেশ সংলগ্ন অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল। হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর[২০২] মতে, অবন্তি উজ্জয়িনী অঞ্চল এবং নর্মদা উপত্যকার মান্ধাতা থেকে মহেশ্বর ও পাশ্ববর্তী কয়েকটা জেলা নিয়ে গঠিত ছিল। ভাণ্ডারকর এর মতে, প্রাচীন অবন্তি দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। যথা : উত্তরপথ এবং দক্ষিণাপথ। উত্তর পথের রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী, দক্ষিণপথের রাজধানী ছিল মহিস্‌সতী বা মহিষ্মতি। দীপবংস মতে, অচ্যুতগামী নামক রাজা উজ্জয়িনী নগর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দীর্ঘনিকায়ের মহাগোবিন্দ সূত্র উল্লেখ আছে যে,

Dhaka University Institutional Repository

উজ্জয়িনী ছিল অবন্তির রাজধানী, সেখানে বস্‌সভূ নামক এক রাজা রাজত্ব করতেন। কিন্তু মহাভারতে (II. 31.10) মহিস্মতি এবং অবন্তি দু'টি পৃথক রাজ্য হিসেবে উল্লেখ আছে। ফলে ধারণা করা যায় যে, অবন্তি উত্তরপথ-দক্ষিণপথ এ দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। বিন্দপর্বত জনপদটিকে দু'ভাগে বিভক্ত করে রেখেছিল। বৌদ্ধ এবং জৈন সাহিত্যে কুররঘর এবং সুদর্শনপুর অবন্তির দু'টি শহর হিসেবে উল্লেখ আছে। মিলিন্দপঞ্হ (II. p. 250) গ্রন্থে অবন্তি জম্বুদ্বীপের তিনটি মণ্ডলের মধ্যে অন্যতম একটি ছিল। অপর দু'টি মণ্ডল হলো : প্রাচীন এবং দক্ষিণপথ। ইন্দ্রিয়জাতকে (III. p. 463) অবন্তি দক্ষিণাপথে অবস্থিত ছিল বলে উল্লেখ আছে। চিত্তসম্ভূতজাতকে (IV. p. 390) উজ্জয়িনী অবন্তির অন্যতম নগর হিসেবে উল্লেখ আছে। সরভঙ্গজাতকে (V. p. 127-137) অবন্তি দক্ষিণাপথে অবস্থিত ছিল বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।

বুদ্ধের সময়কালেও অবন্তি বৌদ্ধধর্মের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র ছিল। বুদ্ধের সময়কালে অবন্তির রাজা ছিলেন প্রদ্যোত। বিনয়পিটক সাক্ষ্য দেয় যে, রাজা প্রদ্যোত অত্যন্ত ক্রোধ স্বভাব সম্পন্ন ছিলেন। এ কারণে তিনি চণ্ডপ্রদ্যোত নামেও খ্যাত ছিলেন। জানা যায় যে, রাজা প্রদ্যোত বংশ বা বৎসরাজ উদয়নের সঙ্গে বহুবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। পরবর্তীতে তিনি নিজকন্যা বাসবদত্তাকে রাজা উদয়নের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে সুসম্পর্ক তৈরি করেন। রাজা উদয়ন মগধরাজের সঙ্গেও বৈবাহিক সম্পর্কে স্থাপন করেন। বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে রাজা উদয়ন বংশ রাজ্যের স্বাধীনতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বুদ্ধের প্রথম সারির বহু শিষ্য এবং শিষ্যা এখানে জন্মগ্রহণ এবং বসবাস করতেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন : অভয়কুমার থের, থেরী ইসদাসী, থেরী ইসিদত্তা, সোণকুটিকর্ণ, উদান বা উদয়ন এবং মহাকচ্চায়ন। থেরগাথা[২০৩] সাক্ষ্য দেয় যে, বুদ্ধশিষ্য মহাকচ্চায়ন অবন্তিরাজ প্রদ্যোত এর পুরোহিতের পুত্র ছিলেন। জানা যায় যে, রাজা প্রদ্যোত বুদ্ধের গুণকীর্তন শুনে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য মহাকচ্চায়নকে বুদ্ধের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ করে প্রব্রজ্জিত হন এবং অর্হত্ব ফলে প্রতিষ্ঠিত হন। বুদ্ধের ধর্ম-দর্শন ব্যাখ্যায় তিনি খুবই পটু ছিলেন। তিনি রাজা প্রদ্যোতকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষাদান করেন। ধম্মপদট্‌ঠকথা[২০৪] হতে জানা যায়, মহাকচ্চায়ন অবন্তির কুররঘর নামক স্থানে অবস্থানকালে শ্রোণকোটিকর্ণকে বৌদ্ধধর্মে প্রব্রজ্জিত করেছিলেন। রাজা প্রদ্যোতের সহযোগিতায় মহাকচ্চায়ন অবন্তিতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার-প্রসার করেন। বৈশালীতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় মহাসঙ্গীতিতে অবন্তির ভিক্ষুগণ যশ স্থবিরের নেতৃত্বে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। জানা যায় যে, রাজা হওয়ার পূর্বে সম্রাট অশোক অবন্তিতে শাসনকর্তা হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

২.১৫. গান্ধার

বুদ্ধের সমসাময়িককালে গান্ধার ছিল ষোড়শ জনপদের অন্যতম একটি এবং রাজধানী ছিল তক্ষশিলা, যা শিক্ষা ও বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে প্রখ্যাত ছিল। বুদ্ধের সময়কালে গান্ধারের রাজা ছিলেন পুক্কুসাতি, যাঁর সঙ্গে মগধরাজ বিম্বিসারের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। মজ্ঝিমনিকায়ের অট্ঠকথা পপঞ্চসূদনী[২০৫] হতে জানা যায় যে, মগধরাজ বিম্বিসার গান্ধাররাজ পুক্কুসাতিকে পত্র লিখে বুদ্ধের আবির্ভাবের কথা জ্ঞাত করেন। পত্র পাঠ করে রাজা পুক্কুসাতি বুদ্ধের অনুসারী হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন এবং রাজ্য ত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্বক বুদ্ধকে দর্শনের জন্য শ্রাবস্তী গমন করেন। তেলপত্তজাতক (I. p. 395) এবং সুসীমজাতক (II. p. 47) সাক্ষ্য দেয় যে, গান্ধারের রাজধানী তক্ষশিলা বেনারস হতে ২০০০ (দুই হাজার) লিগ দূরত্ব ছিল। কুম্ভকারজাতকে (III. p. 376) বিদেহ রাজ্যের রাজা নিমির সমসাময়িককালে নগ্গাজ নামক এক রাজা তক্ষশিলায় রাজত্ব করতেন বলে উল্লেখ আছে। গন্ধারজাতক (III. pp. 363-369) হতে জানা যায় যে, কাশ্মির-গান্ধারের সঙ্গে বিদেহ রাজ্যের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। নিদ্দেস[২০৬] গ্রন্থ হতে জানা যায় যে, তক্ষশিলার অধিবাসীগণ যৌথভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করত। প্রখ্যাত অট্ঠকথাচার্য বুদ্ধঘোষের[২০৭] মতে, রাজা পুক্কুসাতির রাজ্য একশত লিগ বিস্তৃত ছিল এবং রাজধানী তক্ষশিলা হতে শ্রাবস্তীর দূরত্ব ছিল একশত বিরানব্বই লিগ। গান্ধার এবং শ্রাবস্তীর মধ্যে বাণিজ্য ও যোগাযোগ ছিল। মালালাসেকেরার[২০৮] মতে, কাশ্মির এবং তক্ষশিলা নিয়ে গান্ধার রাজ্য গঠিত ছিল। টি. ডব্লিউ রীস ডেবিড্স[২০৯] এর মতে, পূর্ব আফগানিস্তানের বর্তমান কান্দাহার ছিল গান্ধার, যা উত্তর-পশ্চিম পাঞ্জাবের অন্তর্ভূক্ত ছিল। সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের[২১০] বলেন, বর্তমান পেশোয়ার এবং রাওয়ালপিণ্ডি নিয়ে গান্ধার জনপদ গঠিত ছিল। হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর[২১১] মতে, কাশ্মির উপত্যকা এবং প্রাচীন তক্ষশিলা অঞ্চল গান্ধার জনপদের অন্তর্ভূক্ত ছিল। মূলত, পাকিস্তানের পেশোয়ার এবং রাওয়ালপিণ্ডি নিয়ে গান্ধার রাজ্য গঠিত ছিল। সম্রাট অশোকের সময় গান্ধার অশোক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল। দীপবংস এবং মহাবংস সাক্ষ্য দেয় যে, তৃতীয় সঙ্গীতির পর সম্রাট অশোক মোগ্গলীপুত্র তিষ্য থেরর সহযোগিতায় মজ্ঝন্তিক থেরকে কাশ্মির-গান্ধারে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য প্রেরণ করেন।

২.১৬. কম্বোজ

কম্বোজের ভৌগোলিক অবস্থান অস্পষ্ট। প্রাচীন সাহিত্যে এবং অশোকের শিলালিপিতে গান্ধার এবং কম্বোজের নাম একত্রে উল্লেখ পাওয়া যায়। এ কারণে কম্বোজ গান্ধারের নিকটবর্তী ছিল বলে ধারণা করা হয়। কিন্তু পালি সাহিত্যে কম্বোজের রাজধানীর নাম উল্লেখ পাওয়া যায় না। পেতবত্থু [২১২] গ্রন্থে কম্বোজের

Dhaka University Institutional Repository

সঙ্গে দ্বারকা নামক এক নগরের উল্লেখ পাওয়া যায়। টি. ডব্লিউ. রীস ডেবিড্‌স[২১৩] দ্বারকা কম্বোজের রাজধানী ছিল বলে মনে করেন। কিন্তু বি. সি. ল্য[২১৪] 'দ্বারকা'কে কম্বোজের নগর বা রাজধানী হিসেবে স্বীকার করেন না। তবে তিনি বলেন, কম্বোজ গান্ধারের নিকটে উত্তর-পশ্চিম ভারতে অবস্থিত ছিল। লুর্ডার অনুশাসন হতে জানা যায় যে, নন্দীপুর কম্বোজের একমাত্র নগর ছিল। মুখার্জি[২১৫] কম্বোজ কাবুল নদীর তীরে অবস্থিত বলে মতে পোষণ করেছেন। সুমঙ্গলবিলাসিনী[২১৬] মতে, কম্বোজ ঘোড়ার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। কুনালজাতকে (V. p. 446) কম্বোজের অধিবাসীরা জঙ্গলে কীভাবে ঘোড়া ধরত তার বর্ণনা পাওয়া যায়। ভূরিদত্তজাতকে (VI. p. 208) উল্লেখ আছে যে, কম্বোজের অধিবাসীগণ অনার্য রীতিনীতি পালন করতেন। তারা বিশ্বাস করতো যে, মশা, মাছি, পোঁকা, সাপ, ব্যঙ, মৌমাছি প্রভৃতি হত্যা করলে শুদ্ধিতা অর্জন হয়। হিউয়েন সাং[২১৭] এর বর্ণনায়ও উক্ত অভিমতের সত্যতা পাওয়া যায়। সাসনবংস গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর মহারক্ষিত থের যোনক রাজ্যে গমন করে কম্বোজ এবং অন্যান্য স্থানে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন। অশোকের শিলালিপিতেও কম্বোজদের উল্লেখ আছে। রাজৌরি বা রাজপুর এবং হাজরা জেলা নিয়ে কম্বোজ রাজ্য গঠিত ছিল। পশ্চিমে এর সীমা কাফিরিস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মহাভারতে রাজপুরকে কম্বোজের রাজধানী হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

৩. উপসংহার

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বুদ্ধের আবির্ভাবকালে প্রাচীন ভারতে কোনরূপ রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। একটি অখণ্ড রাষ্ট্রের পরিবর্তে প্রাচীন ভারতবর্ষ ষোলটি (বা ততোধিক) স্বতন্ত্র রাষ্ট্র বা জনপদে বিভক্ত ছিল এবং এসব জনপদকে কেন্দ্র করেই প্রাচীন ভারতের রাজনীতি আবর্তিত হতো। এসব জনপদগুলোর মধ্যে মগধ, কোশল, বৎস এবং অবন্তী ছিল পরাক্রমশালী। বুদ্ধের সময়কালেই বৌদ্ধধর্ম প্রায় সবকয়টি জনপদে প্রচার প্রসার লাভ করেছিল। বিশেষত অঙ্গ, মগধ, কাশি, কোশল, বজ্জি, মল্ল, গান্ধার প্রভৃতি জনপদ বা রাজ্যের রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বুদ্ধ অধিকাংশ জনপদে তাঁর ধর্ম প্রচার করতে সক্ষম হন এবং অনেক রাজা বুদ্ধের ধর্ম গ্রহণ করে বৌদ্ধধর্মের অনুসারী হন। বিশেষত বিম্বিসার, প্রসেনজিত, অজাতশত্রু, উদয়ন, পক্কুসাতি প্রমুখ রাজন্যবর্গ বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। বুদ্ধের সময়কালে অনেক রাজ্য বা জনপদ মগধের অধীনস্ত হয়ে যায় এবং মগধকে কেন্দ্র করে প্রাচীন ভারতে একক রাষ্ট্র কাঠামো বিকাশ লাভ করতে শুরু করেছিল। এ প্রক্রিয়ায় বৌদ্ধধর্ম সক্রিয় ভূমিকা রাখে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

[১] *Rāmāyana*, I, 23, 14, V. 22-14.

[২] *Mahābhārata*, I, 104; 53-54; *Matsyapurāṇa*, p. 48; *প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪-৯৫;

[৩] ভিক্ষু শীলভদ্র (অনু.), *দীঘ নিকায়*, ১ম খণ্ড, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলিকাতা, ১৯৪৭, পৃ. ৩৪৪.

[৪] বহু জাতকে রাজা ব্রহ্মদত্তের নামোল্লেখ পাওয়া যায় (দ্রষ্টব্য, সিগালজাতক)। ঈশানচন্দ্র ঘোষ (অনু.), *জাতক*, ২য় খণ্ড, করুণা প্রকাশিনী, কলিকাতা, ১৩৮৪ বাংলা, পৃ. ৩; *Jātaka*, vol. II, p. 7.

[৫] *Historical Geography of Ancient India*, op. cit., p. 43; JASB, 1897, p. 95.

[৬] *A Manual of Buddhism*, op. cit., p. 193, n.

[৭] *দীঘ নিকায়*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২-৯৩; *Digha Nikāya*, op. cit., vol. I, p. 111.

[৮] J. Wood and D. Kosambi (ed.), *Papañcasūdanī*, P. T. S. London, 1922, vol. I., p. 394.

[৯] *দীঘ নিকায়*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯-২৬১।

[১০] *Vinaya Pitaka*, op. cit., vol. I., p. 312; *Digha Nikāya*, op. cit., vol. II, p. 147, *Saṃyutta Nikāya*, op. cit., vol. I., p. 195, *Aṅguttara Nikāya*, op. cit., vol. iv., p. 59, 168; *Sumaṅgalavilāsinī*, op. cit., vol. I., p. 164.

[১১] 'চম্পস্য তু পুরী চম্পা, যা মালিন্য ভবং পুরা', *South Indian Inscription*, p. 29; *Mahābhārata*, chap. VIII, p. 22.

[১২] *Vinaya Pitaka*, op. cit., vol. I., p. 179.

[১৩] *Dictionary of Pali Proper Names*, op. cit., vol. II., p. 17.

[১৪] *Digha Nikāya*, op. cit., vol. IV., p. 34; *Majjhima Nikāya*, op. cit., vol. I., p. 51; *Saṃyutta Nikāya*, op. cit., vol. I., p. 195; *Aṅguttara Nikāya*, op. cit., vol. IV., p. 59.

[১৫] E. Hardy (ed.), *Dhammapāla's Paramttha-dīpanī pt. IV., being the Commentary on the Vimāna-vatthu*, P. T. S. London, 1901, pp. 332, 337.

[১৬] *The Lalita Vistara*, op. cit. p. 125-126.

[১৭] *Mahābhārata*, I, p. 44.

[১৮] *Mahābhārata*, I, p. 44; *Buddhist India*, op. cit., p. 24.

[১৯] *Historical Geography of Ancient India*, op. cit., p. 43; JASB, 1897, p. 44.

Dhaka University Institutional Repository

[২০] *Buddhist India*, op. cit., p. 24.

[২১] *Artharva-veda*, p. 22.

[২২] অন্যান্য নগরগুলো হলো : চম্পা, শ্রাবস্তী, সাকেত, কোশাম্বী এবং বেনারস, *Digha Nikāya*, op. cit., vol. II., p. 147.

[২৩] *Digha Nikāya*, op. cit., vol. II., p. 72ff.

[২৪] *Saṃyutta Nikāya*, op. cit., vol. II, p. 191-192; *Dhammapāla's Paramattha-dīpanī pt IV, being the commentary on the Vimāna-vatthu*, op. cit., vol. I (*Paramatthadīpanī,* III), p. 82.

[২৫] *Saṃyutta Nikāya*, op. cit., vol. I., p. 206.

[২৬] *Dhammapāla's Paramattha-dīpanī pt IV, being the commentary on the Vimāna-vatthu*, vol. I., (*Paramatthadīpanī,* III), op. cit., p. 82; *Digha Nikāya*, op. cit.,vol. II, p. 235.

[২৭] *Vinaya Pitaka*, op. cit., vol. I., p. 29.

[২৮] *Dictionary of Pali Proper Names*, op. cit., vol. II., p. 178.

[২৯] *Aṅguttara Nikāya*, op. cit., vol. III., p. 57.

[৩০] Thomas Watters, *On Yuan Chwang's Travels in India*, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd, New Delhi, 1996 (3rd ed.), Part II, pp. 86-99.

[৩১] দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়া ও সুমঙ্গল বড়ুয়া (অনু.), *দীপবংস*, বাংলাদেশ পালি সাহিত্য সমিতি, চট্টগ্রাম, ২০০৩, পৃ. ১৬৪; দিলীপ কুমার বড়ুয়া এবং মৈত্রী তালুকদার (অনু.), *মহাবংস*, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ১৪২-১৪৩।

[৩২] *দীঘ নিকায়*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলিকাতা, ১৯৪৭, পৃ. ৯২-৯৩।

[৩৩] *বুদ্ধচরিতম্ :* ১১, ২।

[৩৪] *Dictionary of Pali Proper Names*, op. cit., vol. II., p. 289.

[৩৫] *Majjhima Nikāya*, op. cit., vol. I., p. 95; F. L. Woodward (ed.), *Paramattha-dīpanī Theragathā-Aṭṭhagathā, The Commentary of Dhammapālācariya*, vol. I., P. T. S. London, 1940, p. 147.

[৩৬] Alexander Cinningham, *The Ancient Geography of India*, Infology Book House Varanasi, p. 128.

[৩৭] *Papañcasūdani :Majjhimanikāayaṭṭhakathā of Buddhaghosācariya*, op. cit., vol. I. p. 292.

[৩৮] F. L. Woodward (ed.), *Paramattha-dīpanī , Udānaṭṭhakathā (Udāna Commentary) of Dhammapālācāriya*, P. T. S. London, 1926, p. 104.

Dhaka University Institutional Repository

[৩৯] *Paramattha-dīpanī*, *Theragathā-Aṭṭhagathā, The Commentary of Dhammapālācariya*, op. cit., Vol. I., op. cit., p. 147.

[৪০] *প্রাচীন ভারতের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৩।

[৪১] *Aṅguttara Nikāya*, op. cit., vol. I., p. 25.

[৪২] *Digha Nikāya*, op. cit., vol. I., pp. 49-86.

[৪৩] প্রজ্ঞানন্দ স্থবির (অনু.), *মহাবর্গ*, যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ট্রাস্ট বোর্ড হতে সেক্রেটারী শ্রীঅধরলাল বড়ুয়া কর্তৃক প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৯৩৭, পৃ. ২৩৩।

[৪৪] *Majjhima Nikāya*, op. cit., vol. I., pp. 166-167.

[৪৫] *Digha Nikāya*, op. cit., vol. I., p. 127.

[৪৬] Rockhill, *Life of the Buddha*, p. 250.

[৪৬] J. Takakusu (ed.), *Samantapāsādikā, Buddhaghosa's Commentary on the Vinaya Pitaka*, vol. II., P. T. S. London, 1924, p. 297.

[৪৭] *On Yuan Chwang's Travels in India*, op. cit., Part II, pp. 148, 162.

[৪৮] *Vinaya Pitaka,* op. cit., vol. IV., pp. 116-117.

[৪৯] *Digha Nikāya*, op. cit., vol. II., p. 86.

[৫০] B.C. Law, `Rajagriha in Ancient India', p. 8ff; cf., *Historical Geography of Ancient India*, op. cit., p. 46.

[৫১] *Vinaya Pitaka*, op. cit., vol. I., pp. 226-230; *Digha Nikāya*, op. cit., vol. II., pp. 86-87.

[৫২] *Vinaya Pitaka*, op. cit., vol. I., op. cit., pp. 35, 39.

[৫৩] *মহাবর্গ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭।

[৫৪] *Digha Nikāya*, op. cit., vol. II., p. 206.

[৫৫] *Aṅguttara Nikāya*, op. cit., vol. I., p. 25; H. C. Norman (ed.), *The Commentary on the Dhammapada*, vol. IV., P. T. S. Londodn, 1906, p. 168.

[৫৬] *The Commentary on the Dhammapada*, op. cit., Vol. III, op. cit., pp. 439-440.

[৫৭] *Saṃyutta Nikāya*, op. cit., vol. I., pp. 83-85; *The Summaṅgalavilāsinī, Buddhaghosa's Commentary on the Dīgha- Nikāya*,, vol. I., pp. 135-137; *Vinaya Pitaka*, op. cit., vol. II., op. cit., pp. 190-192.

[৫৮] *মহাবর্গ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

[৫৯] *Vinaya Pitaka*, op. cit., vol. II., op. cit., p. 189.

[৬০] *Digha Nikāya*, op. cit., vol. I., pp. 49-86.

[৬১] *Saṃyutta Nikāya*, op. cit., vol. II., pp. 605-606.

[৬২] দিলীপ কুমার বড়ুয়া, *পালি ভাষার ইতিবৃত্ত*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৫০।

[৬৩] I. B. Horner (ed.), *Madhuratthavilāsinī nāma Buddhavaṃsaṭṭhakathā of Buhadantācariya Buddhadatta Mahāthera*, P. T. S. London, p. 3.

[৬৪] *Historical Geography of Ancient India*, op. cit., po. 9, 43.

[৬৫] *Samantapāsādikā, Buddhaghosa's Commentary on the Vinaya Pitaka*, op. cit., vol. I., p. 9.

[৬৬] *Majjhima Nikāya*, op. cit., vol. I., pp. 349; *Aṅguttara Nikāya*, op. cit., vol. III., p. 57.

[৬৭] *Samantapāsādikā, Buddhaghosa's Commentary on the Vinaya Pitaka*, op. cit., vol. I., p. 63.

[৬৮] A. C. Taylor (ed.), *Kathāvatthu*, P. T. S. London, 1894, vol. I, p. 89.

[৬৯] *Saṃyutta Nikāya*, op. cit., vol. I., pp. 172-173.

[৭০] *Saṃyutta Nikāya*, op. cit., Vol. I., pp. 82-85.

[৭১] *Historical Geography of Ancient India*, op. cit., p. 46.

[৭২] *Vinaya Pitaka*, op. cit., vol. I., op. cit., p. 342, বিনয়পিটকের মহাবর্গে এরূপ উল্লেখ আছে :

ভূতপূব্বং ভিক্খবে বারাণস্যাং ব্রহ্মদত্তো নামো কাশিরাজা
অহোসি অদ্ধো মহদ্ধনো মহাভোগে মহব্বলো মহাবাহনো
মহাবিজিতো পরিপুন্নকোস কোট্ঠাগারো।

[৭৩] *Majjhima Nikāya*, op. cit., vol. II., pp. 49.

[৭৪] *Paramattha-dīpanī, Udānaṭṭhakathā (Udāna Commentary) of Dhammapālācāriya*, op. cit., p. 123.

[৭৫] *Bhandarkar's List of Northern Inscription*, No. 22.

[৭৬] *Mahāvastu*, op. cit., vol. III, p. 402.

[৭৭] P. L. Vaidya (ed.), *Divyāvadāna*, Amasterdam, 1970, p. 71.

[৭৮] S. Beal, *Buddhist Recods of the Western World*, Low Price Publication, Delhi, 1973, Part. II., p. 44ff.

[৭৯] *Aṅguttara Nikāya*, op. cit., vol. III., p. 391; *Paramattha-dīpanī, Udānaṭṭhakathā (Udāna*

Dhaka University Institutional Repository

Commentary) of Dhammapālācāriya, op. cit., p. 332.

[৮০] *Dictionary of Pali Proper Names*, op. cit., vol. I., p. 593.

[৮১] *Aṅguttara Nikāya*, op. cit., vol. V., p. 59.

[৮২] *মহাবস্তু*, পৃ. ২৮৬।

[৮৩] *মহাবর্গ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯-১৫; *Majjhima Nikāya*, op. cit., vol. I., pp. 170-77; *Saṃyutta Nikāya*, op. cit., vol. V., pp. 420-425; *Kathāvatthu*, p. 97; *Lalitavistara*, pp. 412-413; সৌন্দরনন্দম্ (অধ্যায় ৩, গাথা : ১০-১১) এবং *বুদ্ধচরিতম্*, (অধ্যায় ১৫, গাথা ৮৭) মতে, পঞ্চবর্গী শিষ্যগণ হলেন : কৌণ্ডণ্য, ভদ্দিয়, বপ্প, মহানাম এবং অশ্বজি।

[৮৪] *পালি ভাষার ইতিবৃত্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০।

[৮৫] পরমত্থজোতিকা (vol. II, pp. 400-02) এবং দীর্ঘনিকায়ের অট্ঠকথা সুমঙ্গলবিলাসিনী (vol. I, pp. 239-40) গ্রন্থে কোশল নামকরণের ভিন্ন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

[৮৬] *প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯।

[৮৭] *Digha Nikāya*, op. cit., vol. II., p. 147.

[৮৮] *Vinaya Pitaka*, op. cit., vol. I., op. cit., p. 253; সারত্থপ্পকাসনী (vol. I, p. 243) মতে রাজগৃহ হতে ৪৭লি, জাতক (৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৬৫) মতে সাংকশ্য হতে ৩০ লিগ এবং পপঞ্চসূদনী (vol.II,p. 987) মতে তক্ষশিলা হতে ১৪৭লিগ দূরে স্থানটি অবস্থিত ছিল।

[৮৯] *Geography of Early Buddhism*, op. cit., p. 5.

[৯০] সমন্তপাসাদিকা (vol. III., p. 614) মতে, বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীতে ৫৭ হাজার পরিবার বসবাস করত। ধম্মপদট্ঠকথায় (vol. V., p. 40) উল্লেখ আছে যে, শ্রাবস্তীর নগর তোরণের বিপরীতে অবস্থিত গ্রামে পাঁচশত কৈবর্ত্য পরিবার বসবাস করত।

[৯১] *Buddhist India*, op. cit., p. 25.

[৯২] দীঘীতি নাম কোসলো রাজা অহোসি দলিদ্দো অপ্পধনো অপ্পধগো অপ্পবলো অপ্পবাহনো, অপ্পবিজিতো অপ্পনিপুন্ন-কোস-কোট্ঠাগারো), *মহাবর্গ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৩।

[৯৩] দীঘাতি, মল্লিক এবং ছত্ত (৩, ১১৬) প্রমুখ কোশলরাজগণও কাশীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন বলে জাতকে (vol. 2, p. 3, vol 3, pp. 116, 211) উল্লেখ আছে।

[৯৪] *The Commentary on the Dhammapada*, op. cit., vol. I, p. 338.

[৯৫] *Saṃyutta Nikāya*, op. cit., vol. I, p. 74.

[৯৬] ধম্মপদট্ঠকথা (vol. I, p. 385) হতে জানা যায় যে, মগধরাজ বিম্বিসারের বোন এবং উব্বিরী নামক তাঁর আরো দুই পত্নি ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

[৯৭] *Majjhima Nikāya*, op. cit., vol. II, p. 125.

[৯৮] *Saṃyutta Nikāya*, op. cit., vol. I, pp. 82-85.

[৯৯] *Majjhima Nikāya*, op. cit., vol. II, p. 101.

[১০০] *Saṃyutta Nikāya*, op. cit., vol. I, pp. 82-85.

[১০১] *Digha Nikāya*, op. cit., vol. I., pp. 288-289.

[১০২] *Digha Nikāya*, op. cit., vol. III., pp. 80.

[১০৩] দীর্ঘনিকায়ের অগ্গপন্ন সুত্তন্ত (vol. III, pp. 80-83)।

[১০৪] *Majjhima Nikāya*, op. cit., vol. II, p. 124.

[১০৫] এখানে উল্লিখিত গ্রন্থসূহের যে খণ্ড সংখ্যা ও পৃষ্ঠা নম্বর প্রদত্ত হলো তা লণ্ডনের পালি টেকস্ট সোসাইটি হতে প্রকাশিত গ্রন্থ ও খণ্ড সংখ্যা নির্দেশ করছে।

[১০৬] *দীর্ঘনিকায়ে* (vol. I, p. 235) অচিরাবতী এবং *সংযুক্তনিকায়* (vol. I, p. 167) ও *সুত্তনিপাত* (পৃ. ৯৭) গ্রন্থে সুন্দরিকা নামক কোশলের আরো দু'টি নদীর নাম উল্লেখ পাওয়া যায়।

[১০৭] *পালি ভাষার ইতিবৃত্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮-৫১।

[১০৮] *Vinaya Pitaka*, op. cit., pp. 79,80,82,83.

[১০৯] *Majjhima Nikāya*, op. cit., vol. I, pp. 285-287; vol. III, pp. 290-295.

[১১০] *Aṅguttara Nikāya*, op. cit., vol. I., pp. 180-182.

[১১১] A. Andersen and H. Smith (ed.), *Suttanipāta*, P.T.S. London, 1913, pp. 190-192; সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভান্তে) (অনূ.), সুত্তনিপাত, রাঙ্গামাটি ১৯৮৭, পৃ. ২৪।

[১১২] *Majjhima Nikāya*, op. cit., vol. III, pp. 270ff.

[১১৩] *The Commentary on the Dhammapada*, op. cit., vol. I, p. 330.

[১১৪] *Aṅgulīmāla Sutta, Majjhima Nikāya*, op. cit., vol. II, pp. 97-105.

[১১৫] মহাবস্তু, পৃ. ১০১।

[১১৬] F. L. Woodward (trans), *Kindered Sayings*, P.T.S. London, 1930, vol. v, p. xviii.

[১১৭] *The Commentary on the Dhammapada*, op. cit., vol. II, pp. 260-270.

[১১৮] *Papañcasūdani :Majjhimanikāayaṭṭhakathā of Buddhaghosācariya*, op. cit., vol. II. p. 19.

[১১৯] *The Life of Buddha*, op. cit., p. 62.

Dhaka University Institutional Repository

[১২০] *Vinaya Pitaka*, SBE, vol. II, p. 171.

[১২১] *The Lalita Vistara*, op. cit., p. 21.

[১২২] *Mahāvastu*, op. cit., vol. I, pp. 253-255.

[১২৩] *Vinaya Pitaka*, op. cit., vol. I, p. 117, vol. II, pp. 201-211, vol. III, pp. 321-323.

[১২৪] দীর্ঘনিকায়ের মহাপরিনির্বাণ সূত্র (*Vinaya Pitaka*, op. cit., vol. II, p. 267-268)

[১২৫] *Samyutta Nikāya*, op. cit., vol. II, pp. 267-268.

[১২৬] সংযুক্ত নিকায় (vol. II, p. 268) এবং সুমঙ্গলবিলাসিনী (vol. I, p. 47) হতে আরো জানা যায় যে, অজাতশত্রু বিদেহপুত্র নামে খ্যাত ছিল।

[১২৭] *Majjhima Nikāya*, op. cit., vol. I, p. 231.

[১২৮] শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির (অনূ.), *উদান*, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা ১৯৩০, পৃ. ৩।

[১২৯] *On Yuan Chwang's Travels in India*, op. cit., II, pp. 81f.

[১৩০] *Majjhima Nikāya*, op. cit., vol. I, p. 231.

[১৩১] *Digha Nikāya*, op. cit., vol. II., p. 165.

[১৩১] *Historical Geography of Ancient India*, op. cit., p. 103.

[১৩২] *ibid.*

[১৩৩] V. A. Smith, *Early History of India including Alexander's Campains*, Humphrey Milford Press, Oxford, 1924, p. 167, fn. 5; JRA.S, 1913, p. 152.

[১৩৪] *Buddhist India*, op. cit., p. 26

[১৩৫] *The Summangalavilāsinī, Buddhaghosa's Commentary on the Dīgha-Nikāya*, op. cit., vol. II, p. 609.

[১৩৬] *Digha Nikāya*, op. cit., vol. II., p. 170.

[১৩৭] A.S. R. vol. I, p. 74; vol. xvi, p. 118.

[১৩৮] *Historical Geography of Ancient India*, op. cit., p. 116.

[১৩৯] *Majjhima Nikāya*, op. cit., vol. I, p. 231.

[১৪০] *Digha Nikāya*, op. cit., vol. II., pp. 72-168.

[১৪১] Dhammapada, Fausboll, pp. 218-220.

[১৪২] *প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬।

Dhaka University Institutional Repository

[১৪৩] প্রাগুক্ত

[১৪৪] *Digha Nikāya*, op. cit., vol. II., pp. 165.

[১৪৫] *Digha Nikāya*, op. cit., vol. II., pp. 126-127.

[১৪৬] *Majjhima Nikāya*, op. cit., vol. I, p. 231.

[১৪৭] *The Summaṅgalavilāsinī, Buddhaghosa's Commentary on the Dīgha-Nikāya*, op. cit., vol. II, p. 569.

[১৪৮] *পালি ভাষার ইতিবৃত্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০।

[১৪৯] *Sutta-Nipāta Commentary being Paramatthajotikā*, op. cit., vol. I, p. 135.

[১৫০] *Dictionary of Pali Proper Names*, op. cit., vol. I., p. 911; *Buddhist India*, op. cit., p. 26.

[১৫১] *প্রাচীন ভারতের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩২।

[১৫২] *Aṅguttara Nikāya*, op. cit., vol. III., p. 355.

[১৫৩] *Aṅguttara Nikāya*, op. cit., vol. III., p. 355; Vol. V. pp. 41f, 157f.

[১৫৪] *Digha Nikāya*, op. cit., vol. II., pp. 200-203.

[১৫৫] *Saṃyutta Nikāya*, op. cit., vol. V, pp. 436-437.

[১৫৬] *পালি ভাষার ইতিবৃত্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮-৪৯।

[১৫৭] *Saṃyutta Nikāya*, op. cit., vol. IV, p. 170.

[১৫৮] *Aṅguttara Nikāya*, op. cit., vol. I., p. 170; ; অঙ্গুত্তর নিকায় (i, p. 170), *Papañcasūdanī : Majjhimanikāyaṭṭhakathā of Buddhaghosācariya*, op.cit., vol. II, p. 929; A. C. Taylor, *Paṭisambhidāmagga*, P.T.S. London, 1905/70, p. 491.

[১৫৯] *Cunningham's Ancient Geography of India*, op. cit. p. 330.

[১৬০] *Buddhist India*, op. cit., p. 27.

[১৬০] গণপতি শাস্ত্রী (অনু.) *স্বপ্নবাসবদত্তা*, কলিকাতা, পৃ. ১৪৯।

[১৬১] *প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫।

[১৬২] *Digha Nikāya*, op. cit., vol. II., pp. 146, 169.

[১৬৩] *Saṃyutta Nikāya*, op. cit., vol. IV, p. 179; স্থবির (অনু.), *থের-গাথা*, রেঙ্গুন বৌদ্ধ মিশন প্রেস, ১৯৩৫, পৃ.১৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

[১৬৪] *পালি ভাষার ইতিবৃত্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯।

[১৬৫] *Geography of Early Buddhism*, op. cit., p.17.

[১৬৬] *Buddhist India*, op. cit., p. 27.

[১৬৭] *প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।

[১৬৮] *The Summaṅgalavilāsinī, Buddhaghosa's Commentary on the Dīgha-Nikāya*, op. cit., vol. II, p. 623.

[১৬৯] *Majjhima Nikāya*, op. cit., vol. II, p. 65.

[১৭০] স্থবির (অনূ.), *থেরগাথা*, রেঙ্গুন বৌদ্ধ মিশন প্রেস, ১৯৩৫, পৃ. ৪০৫-৪১৩।

[১৭১] *Aṅguttara Nikāya*, op. cit., vol. V., pp. 29-32; *Saṃyutta Nikāya*, op. cit., vol. II, pp. 92-93; *Majjhima Nikāya*, op. cit., vol. I, pp. 55-57; *Digha Nikāya*, op. cit., vol. II., p. 55.

[১৭২] ভিক্ষু শীলভদ্র (অনূ.), *দীঘ নিকায়*, ১ম খণ্ড, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলিকাতা, ১৯৪৭, পৃ. ৩৯১।

[১৭৩] *পালি ভাষার ইতিবৃত্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০।

[১৭৪] *Divyāvadāna*, op. cit., p. 435.

[১৭৫] *ibid.*

[১৭৬] *Buddhist India*, op. cit., p. 37।

[১৭৭] *প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯।

[১৭৮] *প্রাচীন ভারতের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩২।

[১৭৯] *Historical Geography of Ancient India*, op. cit., pp. 50-51.

[১৮০] F. L. Woodward (ed.), *Paramatthadīpanī, Theragatha Aṭṭhakathā, The Commentary of Dhammapālācariya, P. T. S. London, 1940, vol. I, p. 331; Saṃyutta Nikāya*, op. cit., vol. II, p. 280.

[১৮১] *প্রাচীন ভারতের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৩।

[১৮২] *Vinaya Pitaka*, op. cit., vol. III., p. 11., vol. IV, pp. 16, 108.

[১৮৩] R. L. Mitra (ed.), *Rgveda,* Bibliotheca Indica Series, vol. VII, p. 30.

[১৮৪] *Buddhist India*, op. cit., p. 27.

[১৮৫] *Historical Geography of Ancient India*, op. cit., p. 51; *প্রাচীন ভারতের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৫।

Dhaka University Institutional Repository

[১৮৬] *প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩-৩৪।

[১৮৭] *Dictionary of Pali Proper Names*, op. cit., vol. II., p. 415; *Geography of Early Buddhism*, op. cit., p.19.

[১৮৮] *Digha Nikāya*, op. cit., vol. II., p. 200.

[১৮৯] *Buddhist India*, op. cit., p. 27.

[১৯০] *Dictionary of Pali Proper Names*, op. cit., vol. II., p. 1254.

[১৯১] হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী এবং সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের মতে শূরসেনের রাজধানী মথুরা কোশাম্বীর ন্যায় যমুনার তীরে অবস্থিত ছিল (*প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩-৩৪); *প্রাচীন ভারতের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩২)।

[১৯২] S. C. Vidyabhusan (ed.), *Kaccayana's Pali Grammar*, p. 157.

[১৯৩] *Geography of Early Buddhism*, op. cit., p.21.

[১৯৪] *Majjhima Nikāya*, op. cit., vol. II, pp. 83ff.

[১৯৫] *Aṅguttara Nikāya*, op. cit., vol. II., pp. 57.

[১৯৬] *Dhammapāla's Paramattha-dīpanī pt IV, being the commentary on the Vimāna-vatthu*, vol. I., (*Paramatthadīpanī*, III), op. cit., pp. 118f.

[১৯৭] *Digha Nikāya*, op. cit., vol. II. p. 235; *দীঘ নিকায়*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৪-৩৬৩।

[১৯৮] *Dhammapāla's Paramattha-dīpanī pt IV, being the commentary on the Vimāna-vatthu*, vol. I., (*Paramatthadīpanī*, III), op. cit., pp. 259ff.

[১৯৯] টি. ডব্লিউ. রীস ডেবিড্স এবং বি. সি. ল্য মনে করেন, অস্সক রাজ্য অবন্তির উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ছিল।

[২০০] বি. সি. ল্য এর মতে, চূল্লকালিঙ্গজাতক, সুত্তনিপাত এবং হাতিগুম্ফ শিলালেখতে বর্ণিত অস্সক একই বা অভিন্ন রাজ্য ছিল, যা বৌদ্ধ মজ্ঝিমদেশ বা মধ্যদেশ বর্হিভূত ছিল।

[২০১] *Dhammapāla's Paramattha-dīpanī pt IV, being the commentary on the Vimāna-vatthu*, vol. I., (*Paramatthadīpanī*, III), op. cit., pp. 259ff.

[২০২] হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর মতে, অবন্তি উজ্জয়িনী অঞ্চল এবং নর্মদা উপত্যকার মান্ধাতা থেকে মহেশ্বর ও পাশ্ববর্তী কয়েকটা জেলা নিয়ে গঠিত ছিল (*প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫)।

[২০৩] থেরগাথা সাক্ষ্য দেয় যে, বুদ্ধশিষ্য মহাকচ্চায়ন অবন্তিরাজ প্রদ্যোত এর পুরোহিতের পুত্র ছিলেন।

[২০৪] ধম্মপদট্ঠকথা হতে জানা যায়, মহাকচ্চায়ন অবন্তির কুররঘর নামক স্থানে অবস্থানকালে শ্রোণকোটিকর্ণকে বৌদ্ধধর্মে প্রব্রজ্জিত করেছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

[২০৫] J. H. Woods & D. Kosambi (ed.), *Papañcasūdanī*, : *Majjhimanikāyaṭṭhakathā of Buddhagosācariya*, P. T. S. London, 1922, vol. II, p. 979.

[২০৬] L. de La Valle Poussin and E. J. Thomas, The Niddesa, P. T. S. London, 1916, vol. I, p. 154.

[২০৭] *Papañcasūdanī*, : *Majjhimanikāyaṭṭhakathā of Buddhagosācariya*, op. cit., vol. II, p. 988.

[২০৮] *Dictionary of Pali Proper Names*, op. cit., vol. I., p. 749.

[২০৯] *Buddhist India*, op. cit., p. 28.

[২১০] *প্রাচীন ভারতের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৭।

[২১১] *প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬।

[২১২] N. A. Jayawickrama (ed.), *Petavatthu*, London, 1977, p. 23.

[২১৩] *Buddhist India*, op. cit., p. 27.

[২১৪] বি. সি. ল্য 'দ্বারকা'কে কম্বোজের নগর বা রাজধানী হিসেবে স্বীকার করেন না।

[২১৫] *Asoka*, op. cit., p. 168, n. 1.

[২১৬] *The Summaṅgalavilāsinī, Buddhaghosa's Commentary on the Dīgha-Nikāya*, op. cit., vol. I, p.124.

[২১৬] টি. ডব্লিউ. রিস ডেভিড্‌স (প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬) এবং কানিংহামের (প্রাগুক্ত, পৃ. ৯) মতানুসারে আটটি মৈত্রীবদ্ধ গোষ্ঠী বজ্জিরাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল।

[২১৭] *Si-Yu-Ki, Buddhist Records of the Western World*, op. cit., p. 36ff.

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্র কাঠামো ও জনজীবন

১. ভূমিকা

রাষ্ট্র এবং জনজীবন ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। রাষ্ট্রীয় অবকাঠামো এবং বিধি-বিধান সমাজ জীবনের ভিত্তি নির্মাণ করে। প্রাচীন ঐতিহাসিক ঐতিহ্য, পালি এবং সংস্কৃত সাহিত্যে প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্র কাঠামো ও রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধান সম্পর্কে বহু তথ্য পাওয়া যায়। এ অধ্যায়ে জাতকে প্রাপ্ত তথ্যকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে এবং তৎসঙ্গে অন্যান্য উৎসে প্রাপ্ত তথ্যের সমন্বয় সাধন পূর্বক প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্র কাঠামো ও জনজীবন সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হবে।

২. রাষ্ট্র কাঠামো : গ্রাম-নগর-মহানগর-বন্দর

ইতোপূর্বে প্রাচীন ভারতের ভৌগোলিক সংস্থান ও অবয়ব সমীক্ষা করেছি। এতে দেখা দেখা যায় যে, প্রাচীন জনপদ বা রাজ্যগুলো প্রধানত গ্রাম এবং নগরের সমন্বয়ে গঠিত ছিল। মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত-গুহা থেকে গ্রাম এবং গ্রাম হতে নগরের উদ্ভব হয় এবং এসব গ্রাম-নগরকে ভিত্তি করে প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্র কাঠামো বিকাশ লাভ করেছিল। আকার-আয়তন, সুরক্ষা ব্যবস্থা, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে গ্রাম ও নগরের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তবে পালি সাহিত্যে উল্লেখ আছে যে, প্রাথমিক ও একক ক্ষুদ্রতম জনবসতির স্থান হিসেবে জনপদগুলোর বিভিন্ন স্থান গ্রাম, নগর, নগরক, পত্তন, পুর, নিগম, রাজধানী প্রভৃতি নামে বিভক্ত ছিল। গ্রাম ছিল ক্ষুদ্রতম ও প্রাথমিক জনবসতির স্থান। গ্রাম বলতে সাধারণত কতকগুলো পরিবারের সমষ্টি বোঝায়, যেখানে সাধারণত কৃষিকর্ম করা হয় এবং কৃষিনির্ভর জনগণ বসবাস করে। পালি সাহিত্য পাঠে জানা যায় যে, প্রাচীনকালে গৃহের সংখ্যা, আকৃতি বা অবকাঠামোগত বৈশিষ্ট্য এবং বসবাসরত জনগণের বৃত্তি বা পেশা অনুসারে গ্রামগুলো নানা নামে অভিহিত হত। যেমন, সূচিজাতক (III. p. 281) এবং বিনয়পিটক[১] হতে জানা যায় যে, গৃহের সংখ্যা বা অবকাঠমোগত বৈশিষ্ট্য অনুসারে গ্রামগুলো 'এক কুটী গ্রাম' (একো কুটিকো), 'দুই কোটি গ্রাম' (দ্বি কোটিকো), 'তিন কুটী গ্রাম' (তি কোটিকো) প্রভৃতি নামে পরিচিত হত। এক কুটী গ্রামের প্রতিটি গৃহ ছিল এক কুটি বিশিষ্ট। তেমনিভাবে দুই কুটি গ্রাম এবং তিন কুটি গ্রামের প্রতিটি গৃহ ছিল যথাক্রমে দুই ও তিন কুটির বিশিষ্ট।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিজাতকে (III. p. 281) সহস্র কুটীর সম্পন্ন গ্রামেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। বিনয়পিটক,[২] মজ্ঝিমনিকায়,[৩] অঙ্গুত্তর নিকায়,[৪] জাতকের দূরনিদান অনুচ্ছেদ,[৫] সূচিজাতক (III. p. 281), লোসকজাতক (I. p. 234), সমুদ্দবাণিজজাতক (IV. p. 158f), ফন্দনজাতক (IV. p. 208) প্রভৃতি হতে জানা যায় যে, বসবাসরত জনগণের বৃত্তি বা পেশার ভিত্তিতেও অনেক গ্রামের নামকরণ করা হতো। সূত্রধরেরা যে গ্রাম বসবাস করতো তা 'বড্ডকি গাম (পালিতে গ্রামকে 'গাম' বলা হয়) বা সূত্রধর গ্রাম' নামে অভিহিত হতো। অনুরূপভাবে বাঁশ-বেতের সাহায্যে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করে জীবিকা নির্বাহকারী মানুষের গ্রাম 'নলকার গাম বা নলকার গ্রাম)', জেলেদের গ্রাম 'কেবট্ট গাম বা কৈবর্ত গ্রাম, মালীদের গ্রাম 'আরামিক গাম বা উদ্যান রক্ষক গ্রাম', মাটির জিনিস পত্র তৈরি করে জীবিকা নির্বাহকারী মানুষের গ্রাম 'কুম্ভকার গাম বা কুম্ভকার গ্রাম', লবণ প্রস্তুতকারী শ্রমিকদের গ্রাম 'লোনকার গাম বা লোনকার গ্রাম', কর্মকারদের গ্রাম 'কম্মকার গাম বা কর্মকার গ্রাম' প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিল। সূচিজাতকে আরো উল্লেখ আছে যে, একেকটি গ্রামে ত্রিশ থেকে পাঁচশত পরিবার বসবাস করতো। এ জাতকে বারণসীর নগর-তোরণের পাশে অবস্থিত এক কুম্ভকার গ্রামের বর্ণনা পাওয়া যায়। এসব পেশাজীবিগণ প্রস্তুতকৃত দ্রব্য নগরে সরবরাহ করে জীবিকা নির্বাহ করতো। পালি সাহিত্য আরো সাক্ষ্য দেয় যে, প্রাচীন ভারতের জাতিভেদ প্রথা জনগণের বসবাসের স্থান নির্ধারণেও প্রভাব বিস্তার করতো। যেমন, বিনয়পিটক,[৬] দীর্ঘনিকায়,[৭] মাতঙ্গজাতক (IV. p. 376), অম্বজাতক (IV. p. 200), চিত্ত-সম্ভূতজাতক (IV. p. 390), মোরজাতক (II. p. 36) প্রভৃতি হতে জানা যায় যে, ব্রাহ্মণ এবং অন্ত্যজ শ্রেণির লোকেরা আলাদা গ্রামে বসবাস করতো এবং গ্রামগুলো বসবাসরত জাতির নামানুসারে পরিচিতি ছিল। যেমন, ব্রাহ্মণেরা যে গ্রামে বসবাস করতো তা ব্রাহ্মণ গাম বা ব্রাহ্মণ গ্রাম, চণ্ডালদের গ্রাম 'চণ্ডাল গাম বা চণ্ডালগ্রাম', নিষাদদের গ্রাম 'নেসাদ গাম বা নিষাদ গ্রাম' নামে অভিহিত হতো। সমুদ্দবাণিজজাতক (IV. p. 158f) ও ফন্দনজাতকে (IV. p. 208) এক ছুতার গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায় যেখানে এক হাজার ঘর ছুতার বসবাস করতো। চূল্লবগ্‌গ[৮] গ্রন্থে 'গোণিসানিবিট্‌ঠ গাম' নামক একটি গ্রামের উল্লেখ আছে। এতে বোঝা যায়, গোপালকদেরও বসবাসের জন্য আলাদা গ্রাম ছিল। বর্তমানেও বৃত্তি বা পেশানুসারে পরিচিত গ্রামের সন্ধান পাওয়া যায়। এ গ্রন্থে প্রাচীর পরিবেষ্টিত এবং প্রাচীরবিহীন দু' প্রকার[৯] গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাচীর পরিবেষ্টিত গ্রাম হতে বোঝা যায়, সেকালে গ্রামগুলোতে চোর-ডাকাতের উপদ্রব ছিল এবং প্রাচীর দিয়ে গ্রামগুলো সুরক্ষা করে রাখা হতো। লোসকজাতক (I. p. 239) এবং মহাস্‌সারোহজাতক (III. p. 8) জাতক হতে জানা যায় যে, নগরদ্বারের নিকটবর্তী গ্রামগুলো 'নগরস্‌স দ্বার গাম' বা নগারদ্বার গ্রাম এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামগুলো 'পচ্চন্ত গাম' বা প্রত্যন্ত গ্রাম নামে অভিহিত হতো। নানা পেশার লোকজন বসবাস করলেও কৃষিকার্য ছিল গ্রামগুলোর জীবিকা নির্বাহের প্রধান অবলম্বন। কৃষি নির্ভরতা এবং কৃষিগত প্রাণ চরিত্রই গ্রামের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্যই গ্রামকে নগর থেকে পৃথক করে রেখেছিল। সম্ভাবজাতক (II. p. 43f) পাঠে জানা যায় যে, বুদ্ধের সময়কালে বিভিন্ন শিল্প থাকলেও জনসাধারণের প্রধান জীবিকা ছিল কৃষি এবং কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে ধান, শাক-সজি, ফল এবং বাদাম জাতীয় দ্রব্য ছিল অন্যতম। গ্রামবাসীগণ কৃষিকাজের তত্ত্বাবধায়ন করতো। গ্রামবাসীরাই ছিল কৃষিজমির প্রকৃত মালিক। এতে বোঝা যায়, তখন প্রজাস্বত্ব প্রচলিত ছিল। গ্রামে উৎপাদিত কৃষি ও ক্ষুদ্রশিল্পজাত দ্রব্য এবং কাঁচামাল নগর-মহানগরে সরবরাহ করা হতো।

অপরদিকে, বর্তমানে আমরা যাকে পৌর এলাকা বা শহর বলি প্রাচীনকালে তা নগর নামে পরিচিত ছিল। নগরের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, "গ্রামাঞ্চলের তুলনায় স্বল্পমাত্র স্থান আশ্রয় করে অধিকতর সংখ্যক লোকের বসবাস, সীমাবদ্ধ বাসস্থল, প্রধানত খাদ্যদ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন এরং অন্যদিকে খাদ্যশস্য ও কাঁচামালের জন্যে গ্রাম নির্ভরতা, বণিকশ্রেণির সাথে গভীর সম্পর্ক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক এমনকি ব্যবসা বাণিজ্যগত এবং কখনো ধর্মীয় কেন্দ্র হিসেবে গুরুত্ববহ ছিল।"[১০] ধম্মপদ[১১] গ্রন্থে মন বা চিত্তকে নগরের মতো সুরক্ষিত রাখার উপদেশ পাওয়া যায়। জাতক এবং বিভিন্ন পালি ও প্রাচীন ঐতিহাসিক আকর গ্রন্থে নগরের চারিদিক প্রাকার, পরিখা, তোরণ, গড়, অট্টালক প্রভৃতি দ্বারা সুরক্ষার কথা উল্লেখ আছে। মহাপরিনির্বাণ সূত্রে[১২] এবং তণ্ডুলনালিজাতকে (I. p. 125) কুসাবতী নগর সাতটি প্রতিরক্ষা প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল বলে উল্লেখ আছে। ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি, পালি সাহিত্যে বিভিন্ন জনপদের জনবসতির নানা অঞ্চল নগরক, পত্তন, পুর, নিগম, রাজধানী প্রভৃতি নামে অভিহিত হতে দেখা যায়। কিন্তু এগুলোর সুস্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে এগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে নগরকে নির্দেশ করে বা নগরের সমার্থক শব্দ। মজ্ঝিম নিকায়[১৩] গ্রন্থে গ্রাম-নিগম-নগর (গাম-নিগম-নগর) এরূপ উল্লেখ দেখা যায়। এরূপ বিন্যাস বিবেচনা করলে ধারণা করা যায়, বিস্তৃতি, সুরক্ষা এবং জনসংখ্যার দিক থেকে নিগম ছিল গ্রাম ও নগরের মাঝামাঝি পর্যায়ের। করুণানন্দ ভিক্ষুর মতে, নিগম বাণিজ্যশহর, সাধারণ শহর বা জেলা অর্থে গ্রহণ করা যায়।[১৪] 'নগরক' শব্দের সাধারণ অর্থ 'ছোট নগর'। মহাপরিনিব্বাণ সূত্রে[১৫] তিন প্রকার নগরক এর উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা : কুড্ডকনগরক, উজ্জঙ্গল নগরক এবং সাখা বা সাখা নগরক। টি. ডব্লিউ. রীস ডেবিড্স এ তিনটি নগরককে যথাক্রমে মাটির প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত নগর, জঙ্গলের মধ্যস্থিত শহর এবং শাখা নগর হিসেবে অভিহিত করেছেন।[১৬] পালি সাহিত্য তথা জাতকের ছত্রে ছত্রে 'পুর' শব্দটির

Dhaka University Institutional Repository

প্রচুর উল্লেখ দেখা যায়। যেমন, অগ্‌গলপুর, অন্দপুর, অস্‌সপুর, দন্তপুর ইত্যাদি।[১৭] কিন্তু এসব নামের জনবসতিগুলো নগর হিসেবে উল্লিখিত আছে। চুল্লকসেট্‌ঠিজাতক (I. p. 121), হরিতমাতজাতক (II. p. 238) এবং অট্‌ঠকথায় বন্দরনগরী বোঝাতে 'পট্টন' বা 'পত্তন' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন : কাবেরী পট্টন (পত্তন)। এটি দক্ষিণ ভারতের অন্যতম বন্দরনগরী ছিল। প্রাচীন কালের ন্যায় 'রাজকীয় নগর' বোঝাতে রাজধানী শব্দের প্রয়োগ বর্তমানেও দেখা যায়। অন্যান্য জনবসতি এলাকার চেয়ে রাজধানী অধিকতর সমৃদ্ধ ও সুরক্ষিত নগর ছিল। কারণ এ নগরে রাজন্যবর্গ বসবাস করতেন। এ কারণে দীর্ঘনিকায়ে[১৮] রাজধানীকে 'মহানগর' নামে অভিহিত করা হয়েছে। জাতকে কৃষক, কারিগর এবং শিল্পাশ্রয়ী নানা পেশাজীবি লোক এসব নগর-গ্রামে বসবাস করতো বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। অর্থনীতিতে সুসংবদ্ধ পরিবর্তন আনয়নে নগরের ভূমিকা অপরিসীম। নগরের সংখ্যা বাড়ানো ক্ষেত্রে রাজা ছিলেন প্রধান নির্ধারক। তিনি নগরের মূল কেন্দ্রে অবস্থান করে সভ্যতার সর্ব বিষয় তাঁর শাসনাধীনে নিয়ে আসতেন এবং নগরের শিল্পায়ন ও বাণিজ্যকরণের মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনয়নে চেষ্টা করতেন। এ কারণে শুধু নগর প্রতিষ্ঠা করতেন তা নয়, রাজনৈতিক কারণেও বহু নগর প্রতিষ্ঠা করা হতো। অনেকগুলো নগর-গ্রামের সমন্বয়ে একেকটি জনপদ গড়ে ওঠেছিল এবং এসব নগর-গ্রাম-জনপদকে ঘিরেই প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্র কাঠামো বিকাশ লাভ করেছিল।

৩. রাষ্ট্র ও নাগরিক

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে দেখেছি বর্তমান কালের ন্যায় প্রাচীনকালেও গ্রাম, নগর, মহানগর, বন্দর প্রভৃতি নিয়ে রাষ্ট্র কাঠামো গঠিত ছিল এবং এসব স্থানে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার লোক বসবাস করতো। জাতক এবং অন্যান্য পালি গ্রন্থে রাষ্ট্রে বসবাসরত বিভিন্ন শ্রেণির-পেশার লোকের উল্লেখ দেখা যায়, যাদের পৃথক পৃথক শ্রমদানের ফলে রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও জনজীবন পরিচালিত হতো। পেশা অনুসারে এসব জনগণকে সাতটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। যথা :

৩.১. প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী শ্রেণি

৩.২. ধর্মীয় সম্প্রদায় শ্রেণি

৩.৩. বণিক শ্রেণি

৩.৪. স্বাধীন পেশাজীবি শ্রেণি

৩.৫. শিল্পী ও কারিগর শ্রেণি

Dhaka University Institutional Repository

৩.৬. লোক রঞ্জক-রঞ্জিকা শ্রেণি

৩.৭. সাধারণ কর্মজীবি শ্রেণি

৩.১. প্রশাসনিক শ্রেণি

জাতকে প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে বিক্ষিপ্তভাবে বহু তথ্য পাওয়া যায়। বিশেষত কুক্কুজাতক (III. p. 317ff), কূটবাণিজজাতক (II. p. 181ff), তিত্থজাতক (I. p. 182ff), সুহনুজাতক (II. p. 30ff), কণবেরজাতক (III. p. 59ff), তণ্ডুলনালীজাতক (I. p. 124f), ছবকজাতক, (III. p. 30) সুলসাজাতক (III. p. 436), মহাহংসজাতক (V. p. 279) প্রভৃতিতে রাষ্ট্র ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নামোল্লেখ পাওয়া যায়, যাদের সমন্বয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করা হতো। বিনয়পিটক, দীর্ঘনিকায়, মজ্ঝিমনিকায়, অঙ্গুত্তর নিকায়, ধম্মপদট্ঠকথা, মিলিন্দপ্রশ্ন প্রভৃতি পালি গ্রন্থেও[১৯] রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা কর্মচারীদের নামোল্লেখ পাওয়া যায়, যা অনেক ক্ষেত্রে জাতকের তথ্যের সঙ্গে মিল পাওয়া যায়। এসব কর্মকর্তা কর্মচারীদের শ্রেণি-পেশা বিচার বিশ্লেষণ করলে প্রাচীন ভারতের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। মর্যাদা ও কর্ম অনুসারে প্রশাসনিক শ্রেণিভূক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা : ক) উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক ও সামরিক কর্মকর্তা এবং খ) নিম্নপদস্থ প্রশাসনিক ও সামরিক কর্মকর্তা।

৩.১.১. উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক ও সামরিক কর্মকর্তা

রাজা, উপরাজ, মন্ত্রী (অমাত্য), সর্ববিষয়ক মন্ত্রী বা প্রধান মন্ত্রি (সব্বত্থক মহামত্ত), অর্থমন্ত্রী বা অর্থধর্মানুশাসক, সেনাপতি (সেনানায়ক), পুরোহিত, বিচারক বা বিনিশ্চয়মাত্য (অক্খদস্স), কোষাগারাধ্যক্ষ বা ভাণ্ডারগারিক, গণক মহামাত্য (গণক মহামত্ত = প্রধান হিসাবসংরক্ষক), অর্ঘকারক (অগ্ঘণকো), দ্রোণমাত্য, ছত্র-গ্রাহক (ছত্ত-গাহক), খড়্গ-গ্রাহক (খগ্গগাহক), রাজবৈদ্য, হিরণ্যক, রজ্জুক, শ্রেষ্ঠী (সেট্ঠি), সারথী, হস্তিমঙ্গলকারক, গজাচার্য, দ্বাররক্ষক (দোবারিক) প্রমুখ কর্মকর্তাগণ উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক ও সামরিক কর্মকর্তা হিসেবে বিবেচিত হতো।

৩.১.২. নিম্নপদস্থ প্রশাসনিক ও সামরিক কর্মকর্তা

নগর রক্ষক (নগর-গুত্তিক), আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী (রাজভট্ট), রাজস্ব পরিদর্শক (কম্মিক), গ্রাম পরিদর্শক (গামিক), বলিপ্রতিগ্রাহক, খাজাঞ্চী বা পোদ্দার, গ্রামভোজক প্রভৃতি নিম্নপদস্থ প্রশাসনিক ও

Dhaka University Institutional Repository

সামরিক কর্মকর্তা হিসেবে বিবেচিত হতো। এ শ্রেণির মধ্যে সামরিক বাহিনীর নানা দায়িত্ব প্রাপ্ত এক শ্রেণির কর্মকর্তার উল্লেখ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : অশ্বারোহী (অস্‌সারোহ), হস্তী আরোহী (হত্থারোহ), রথারোহী (রথিকা), তীরন্দাজ (ধনুগ্‌গহ), পতাকাবাহী (চেলকা), সৈন্যদের আবাসস্থলে নিয়োজিত কর্মকর্তা (চলকা), খাদ্য সরবরাহকারী (পিণ্ডদাবিক), হিংস্রযোদ্ধা (উগ্‌গযোধা), অভিজ্ঞ সৈনিক (পুক্‌খান্দিনো), সাহসী যোদ্ধ (মহানাগা), চর্ম নির্মিত বর্ম পরিধানকারী সৈনিক (চম্মযোধিনো) প্রভৃতি। এঁরা চতুরঙ্গনি সেনা বা চতুরঙ্গ সেনা নামে অভিহিত ছিল। রাজপুরুষ (রাজপুরিসো) নামক এ শ্রেণির কর্মকর্তার উল্লেখ পাওয়া যায়, যারা রাজার নানা সেবামূলক কাজে নিয়োজিত থাকতেন। যেমন : গুপ্তচর (চরা), সংবাদবাহক (দূতা), উদ্যান রক্ষক (আরামিক), কাঠ-সংরক্ষক (দারু-গহা), দেহরক্ষী (অনিকট্‌ঠ), সভাসদ (পরিসজ্জ), রাজদূত (বলত্থ), পাচক (সুদক), কারাগাররক্ষক (বন্ধনাগারিক) ইত্যাদি। উপরে বর্ণিত কর্মচারীগণ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের অধীনস্ত ছিলেন।

৩.২. ধর্মীয় সম্প্রদায় শ্রেণি

এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত লোকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন : ব্রাহ্মণ, ভিক্ষু, শ্রমণ, পরিব্রাজক, তীর্থিক প্রমুখ।[২০] সঞ্জীবজাতক (V. p. 246), মহাবোধিজাতক (V. p. 227), সংকিচ্চজাতক (V. p. 261), তেলোবাদজাতক (II. p. 262), মহানারদকস্‌সপজাতক (V. p. 177, VI. p. 219), দীর্ঘনিকায়ের[২১] শ্রামণ্যফল সূত্র এবং ব্রহ্মজাল সূত্র এবং বিভিন্ন পালি ও সংস্কৃত গ্রন্থে এঁদের জীবনাচার ও ধর্মীয় মতাদর্শ সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায়, যা পরবর্তী অধ্যায়ে বর্ণনা করা হবে। এঁরা প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত নন। জনগণকে ধর্মোপদেশের মাধ্যমে আদর্শ ও নৈতিক জীবন-যাপনে, মানবিক গুণাবলী অর্জনে এবং ঐক্য ও সংহতি রক্ষায় উদ্বুদ্ধ করেন এবং জনগণের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এ কারণে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এঁদের মর্যাদা ও সমাদর ছিল বেশি। জাতক পাঠে জানা যায় যে, অনেক ব্রাহ্মণ রাজসভার সদস্য এবং ধর্মোপদেষ্টার পদ অলংকৃত করতেন। এছাড়া, জাতকে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, ব্রাহ্মণ, ভিক্ষু, শ্রমণ, পরিব্রাজক এবং তীর্থিকরা রাজকর প্রদান হতে অব্যাহতি লাভ করতেন।[২২]

৩.৩. বণিক শ্রেণি

পালি সাহিত্যে বণিক সম্প্রদায় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে উল্লেখ দেখা যায়। বণিকগণ ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। পালি সাহিত্যে সাধারণত দোকানদারকে 'আপনিক'[২৩] নামে অভিহিত করা হলেও জাতকে ধনী বণিকদের 'শ্রেষ্ঠী (সেট্‌ঠি)'[২৪] নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রীয় প্রশাসনেও শ্রেষ্ঠীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। বণিকরা নিজেদের নিরাপত্তার জন্য রাজাদের উপর নির্ভর করতেন, অপরদিকে বণিকরা প্রশাসনিক কাজে রাজাকে সহযোগিতা করতেন। এভাবে এঁরা একে অপরের পরিপূরক ছিলেন। রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে বণিকদের ভূমিকা পরবর্তী অনুচ্ছেদে বর্ণনা করা হবে। অপণ্ণকজাতক (I. p. 95), তিত্থিরজাতক (I. p. 217), খদিরঙ্গারজাতক (I. p. 226), রোহিনীজাতক (I. p. 248), বারুণিজাতক (I. p. 252), চূল্লপদুমজাতক (II. p. 119), বলাহস্সজাতক (II. p. 127), সিরিজাতক (II. p. 410), চক্কবাকজাতক (III. p. 520) প্রভৃতিতে শ্রাবস্তীর সুদত্ত শ্রেষ্ঠীর সুখ্যাতি ও প্রভাব-প্রতিপত্তির উল্লেখ আছে। তিনি যেমন ছিলেন বিভবশালী তেমনি ছিলেন দানশীল। দানশীলতার জন্য, বিশেষত অনাথদের পিণ্ড তথা খাদ্য-দ্রব্য দান করতেন বিধায় তিনি অনাথপিণ্ডদ নামে আখ্যায়িত হন। তিনি খুবই বুদ্ধ ভক্ত ছিলেন এবং বৌদ্ধধর্মের অন্যতম অনুসারী ছিলেন। তিনি জেতবন বিহার নির্মাণ করে বুদ্ধকে দান করেন। বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা এবং অসাধারণ দানশীলতার জন্য বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে তাঁর নাম অমর হয়ে আছে।[২৫] সুজাতজাতক (II. p. 347) এবং সুরুচিজাতক (IV. p. 315) জাতকে প্রভাবশালী শ্রেষ্ঠী হিসেবে ধনঞ্জয় ও মিগার শ্রেষ্ঠীরও নামোল্লেখ পাওয়া যায়।

৩.৪. স্বাধীন পেশাজীবি শ্রেণি

এ শ্রেণির লোকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন আচার্য বা শিক্ষক (আচারিয়) [২৬] এবং বৈদ্য বা চিকিৎসক (বেজ্জ)।[২৭] কর্মক্ষেত্রে এঁদের যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল। বিনয়পিটক এবং মিলিন্দপ্রশ্ন গ্রন্থে এঁদের বৃত্তি উচ্চ-শিল্প (উক্কট্ঠ-সিপ্প) রূপে অভিহিত করা হয়েছে। রাষ্ট্রে এঁদের যথেষ্ট সমাদর ছিল এবং এঁরা সকলের শ্রদ্ধা লাভ করতেন। চূল্লসেট্ঠিজাতক (I. p. 116), সঞ্জীবজাতক (I. p. 508), সত্তিগুম্বজাতক (I. p. 430), সংকিচ্চজাতক (V. p. 262), চূল্লহংসজাতক (V. p. 333) প্রভৃতিতে রাজবৈদ্য জীবকের কর্মদক্ষতা সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি মগধরাজ বিম্বিসারের চিকিৎসক ছিলেন এবং রাজপরিবারে তাঁর যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। রাজা বিম্বিসার তাঁকে কোশাম্বীরাজ উদয়নের চিকিৎসা করতে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি বুদ্ধ এবং ভিক্ষুসংঘেরও চিকিৎসক ছিলেন। এ কারণে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে তাঁর নাম অমর হয়ে আছে। দীর্ঘনিকায়ে[২৮] উল্লেখ আছে যে, বুদ্ধের সময়ে আচার্য সোণদণ্ড চম্পা নগরীর বিখ্যাত আচার্য ছিলেন।

৩.৫. শিল্পী ও কারিগর শ্রেণি

পালি সাহিত্যে[২৯] বিশেষত, দীর্ঘনিকায়, মিলিন্দপ্রশ্ন এবং মহাজনকজাতকে (VI. p. 30ff) শিল্পী ও কারিগর শ্রেণি লোকের উল্লেখ পাওয়া যায়। পালি সাহিত্যে এঁদের কী নামে অভিহিত করা হয়েছে তা বন্ধনীতে দেয়া হলো। এ শ্রেণির লোকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন : সূত্রধর (বড়্ঢকি), কুম্ভকার (কুম্ভকার), কামার (কম্মকার), স্বর্ণকার (সুবণ্ণকার), দন্তশিল্পী (দন্তকার), মালাকার (মালাকার), রজ্জুকার

(রজ্জুকার), বাঁশ-বেতের দ্বারা দ্রব্য প্রস্তুতকারক (নলকার), রেশম প্রস্তুতকারক (কোসিয়কার), চিত্রকর (চিত্তকার), চর্মকার (চম্মকার), তাঁতী পেসকার), ধনু নির্মাতা (ধনুকার), তীরনির্মাতা (জিয়কার), সীসা দিয়ে দ্রব্য প্রস্তুতকারক (সীসাকার), টিন দিয়ে দ্রব্য প্রস্তুতকারক (তীপুকার), লৌহ দিয়ে দ্রব্য প্রস্তুতকারক (লোহকার), পিতল দিয়ে দ্রব্য প্রস্তুতকারক (সন্ধকার), রথ প্রস্তুতকারক (রথকার), লবণ প্রস্তুত কারক (লোণকার), রং প্রস্তুতকারক (রঙ্গকার)। এঁদের তৈরি জিনিস জনজীবনের চাহিদা মেটাতো। গ্রাম এবং নগরে এঁরা বসবাস করতেন।

৩.৬. লোকরঞ্জক ও লোকরঞ্জিকা শ্রেণি

এ শ্রেণির লোকেরা নানাভাবে জনগণের মনোরঞ্জন করতেন। লোকরঞ্জনকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করতেন বলে এঁদের লোকরঞ্জক ও লোকরঞ্জিকা অভিধায় আখ্যায়িত করা হয়। বিনয়পিটক, দীর্ঘনিকায়, সংযুক্ত নিকায়, জাতক (কেলিসীলজাতক, কুসজাতক, মহাসীলবজাতক) এবং মিলিন্দ প্রশ্ন গ্রন্থে এ শ্রেণির লোকের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৩০] পালি সাহিত্যে এঁদের কী নামে অভিহিত করা হয়েছে তা বন্ধনীতে দেয়া হলো। এ শ্রেণির লোকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন : অভিনেতা (নট), [৩১] নৃত্যশিল্পী (নটক, নটকা, নটিকা), [৩২] মল্লক্রীড়াবিদ (লঙ্ঘক) [৩৩] এবং কৌতুক অভিনেতা (সোকজ্ঝায়িকা) [৩৪]। গ্রাম এবং নগর উভয় স্থানেই এঁরা বসবাসপূর্বক তাঁদের শিল্প কুশলতা প্রদর্শন করে লোকের মনোরঞ্জন করতেন এবং এর থেকে অর্জিত অর্থ দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। পালি সাহিত্যে লোকের মনোরঞ্জন সাধন করে জীবিকা নির্বাহকারী এক শ্রেণির স্ত্রীলোকের উল্লেখ পাওয়া যায়, যারা গণিকা নামে অভিহিত হতেন। বুদ্ধের সমসাময়িককালে রাজগৃহের নগরের সালবতী[৩৫] এবং বৈশালী নগরের আম্রপালির[৩৬] খ্যাতি ছিল সর্বজন বিদিত। রূপে গুণে এঁরা অসাধরণ ছিলেন। জানা যায় যে, আম্রপালি এক রাতের জন্য ৫০ কহাপণ নিতেন এবং তাঁর কারণে বৈশালী সমৃদ্ধ নগরীতে পরিণত হয়।[৩৭] থেরীগাথার অট্ঠকথা আরো সাক্ষ্য দেয় যে, মগধরাজ বিম্বিসার আম্রপালির তাঁর অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তাঁর ঔরসে পুত্র বিমল-কোণ্ডণ্য জন্মগ্রহণ করেন।[৩৮] পরবর্তীতে আম্রপালি গণিকা বৃত্তি ত্যাগ পূর্বক বুদ্ধের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করে ভিক্ষুণী হন এবং অদম্য প্রচেষ্টায় অর্হত্ব ফলে অধিষ্ঠিত হন। তিনি বুদ্ধ এবং ভিক্ষুসংঘকে বসবাসের জন্য আম্রপালিবন দান করেন।

৩.৭. সাধারণ কর্মজীবি শ্রেণি

পালি সাহিত্যে, বিশেষত জাতকে সাধারণ কর্মজীবি শ্রেণির লোক হিসেবে যাদের উল্লেখ পাওয়া যায় তাদের মধ্যে অন্যতম হলো : কৃষক (কস্সকো), নাপিত (নাহাপিত), ধোপা (রজক) এবং দাস-দাসী (দাস-দাসী)।[৩৯] কৃষক তাদের জীবন ধারণের প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক খাদ্য-শস্য উৎপাদন করতো।

Dhaka University Institutional Repository

উদ্বৃত্ত খাদ্যদ্রব্য দিয়ে তারা রাষ্ট্রে বসবাসকারী অন্যান্য শ্রেণি-পেশার লোকের ভরণ পোষণে সহায়তা করতো। নাপিতরা জনগণের চুল-দাড়ি কামানোর কাজ করতো। সিগালজাতকে (I. p. 504) উল্লেখ আছে যে, নাপিতগণ রাজা, রাজার অন্তঃপুরচারিণী, রাজপুত্র ও রাজকন্যাদের চুল কাটা ও চুলসজ্জার কাজ করতো। 'নাপিত' শব্দটি 'স্না' ধাতু হতে উৎপন্ন। সংস্কৃত 'স্না', পালিতে 'নহা', ণিজন্ত ক্রিয়ারূপে 'নহাপিত' পদ সিদ্ধ হয়, যার অর্থ যে স্নান করায়। এতে ধারণা করা যায়, বিবাহাদি মাঙ্গলিক কার্যেও নাপিতগণ ভূমিকা পালন করতেন। এ প্রথা এখনো ভারতবর্ষের বহু স্থানে প্রচলিত আছে। ধোপাগণ কাপড় চোপড় ধৌত করণের কাজ করতেন। দাস-দাসীগণ অর্থ সম্পন্ন পরিবারে সামান্য মজুরী বা খাদ্যের বিনিময়ে কাজ করতেন।

৪. রাষ্ট্র ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা : প্রশাসনিক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

উপরে (৩.১ অনুচ্ছেদ) বর্ণিত প্রশাসনের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জাতকে সুস্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে বিক্ষিপ্তভাবে অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়, যাদের সমন্বয়ে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন পরিচালনা করা হতো। নিম্নে জাতকের আলোকে এসব প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পর্যালোচনা করে প্রাচীন ভারতের প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হবে।

৪.১. রাজা ও রাজপদ

প্রাচীন ঐতিহাসিক আকর গ্রন্থ, পালি এবং বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যে প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কে বহু তথ্য পাওয়া যায়। এসব গ্রন্থ সাক্ষ্য দেয় যে, আর্যরা ভারতবর্ষে প্রবেশের পর ব্যক্তিগত সম্পত্তির গোড়া পত্তন হয়। তৎপূর্বে ভারতবর্ষে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল না। 'সম্পত্তি' গণের সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করা হতো। সমাজ বিরোধীদের হাত থেকে গণের সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য এক স্থানে বা এক গ্রামে বসবাসরত জনগণ একই গোষ্ঠিভুক্ত একজন লোককে নেতা নির্বাচন করে তাঁর উপর সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব প্রদান করতো। এসব নেতারা মহাসামন্ত নামে অভিহিত হতেন। জাতকে এরূপ মহাসামন্তের প্রচুর উল্লেখ আছে। এই নেতারাই পরবর্তীতে একটি অঞ্চল বা জনপদের রাজা হয়ে ওঠে। পূর্ববর্তী অধ্যায় হতে আমরা জেনেছি, প্রাচীন ভারতবর্ষ ষোলটি বা ততোধিক জনপদে বিভক্ত ছিল এবং একেক জন রাজা বা একেকটি রাজবংশ কর্তৃক জনপদগুলো শাসিত হতো। ঐতিহাসিক আকর গ্রন্থ এবং বৌদ্ধ ও সংস্কৃত সাহিত্য হতে জানা যায়, শাসন ব্যবস্থা হিসেবে অধিকাংশ জনপদ তথা রাজ্যসমূহে

Dhaka University Institutional Repository

রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজপদ ছিল বংশগত। তেলপত্তজাতক এবং চূল্লপদূমজাতক (II. p. 115ff) জাতকের তথ্য এ বিষয়টি সত্য বলে প্রতিপন্ন করে। দসরথজাতকে (IV. p. 124ff) রাজাদের বহু বিবাহের কথা উল্লেখ আছে। ফলে রাজপদ নিয়ে কখনো কখনো বিবাদ দেখা দিত। মহপদুমজাতক (IV. p. 187ff) এবং কুসজাতক (V. p. 278ff) প্রভৃতি হতে জানা যায়, সাধারণত রাণীদের মধ্যে যিনি অগ্রমহিষী ও ক্ষত্রিয়জাত সাধারণত তাঁরই গর্ভজাত সন্তান রাজপদ লাভ করতেন। কিন্তু অন্তঃপুর ষড়যন্ত্রের কারণে বা রাজপুত্র না থাকায় অনেক সময় এ বিধির ব্যতিক্রম ঘটতো, যা দেবধম্মজাতক (I. p. 132), কট্‌ঠহারিজাতক (l. p. 134ff) এবং দসরথজাতকে (IV. p. 124ff) হতে জানা যায়। মুদুপাণিজাতক (II. p. 323ff) এবং মহাজনকজাতক (VI. p. 30ff) হতে অপুত্রক রাজা জামাতাকে রাজপদে অধিষ্ঠিত করা কথা জানা যায়। উপর্যুক্ত দু'টি জাতক এবং অসিলক্‌খণজাতকে (I. p. 455ff) উল্লেখ আছে যে, অপুত্রক রাজা স্বীয় কন্যাকে ভ্রাতুষ্পুত্র বা ভাগিনার সাথে বিবাহ দিয়ে তাঁকে রাজপদে অধিষ্ঠিত করেন। পাদঞ্জলীজাতক (II. p. 264f) এবং গ্রামণীচণ্ডজাতক (II. p. 297f) পাঠে জানা যায় যে, অমাত্যেরা অভিষেকের পূর্বে রাজপুত্রগণের পরীক্ষা গ্রহণ করতেন। পাদঞ্জলীজাতকে উল্লেখ আছে যে, রাজকুমার পাদঞ্জলী এরূপ পরীক্ষায় অনুপযুক্ত প্রতিপন্ন হয়েছিলেন বলে অমাত্যগণ তাঁকে রাজপদে অভিষিক্ত করেননি। তাঁর পরিবর্তে অর্থধর্মানুশাসক তথা অর্থমন্ত্রীকে রাজপদে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে পাদঞ্জলী অসামান্য বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করায় তাঁকে পরবর্তীতে রাজপদে অভিষিক্ত করা হয়। দুম্মেধাজাতক (I. p. 50), রাজোবাদজাতক (II. p. 1-5), কুরুধম্মজাতক (II. p. 366ff) প্রভৃতি সাক্ষ্য দেয় যে, গুণবান রাজাগণের ক্ষেত্রে এরূপ বিধিব্যবস্থার প্রয়োজন হতো না। জাতকে রাজার অবর্তমানে রানী কর্তৃক রাজ্য শাসনের কথাও উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন, উদয়জাতক (IV. p. 104ff) সাক্ষ্য দেয় যে, রাজা উদয়ের সঙ্গে তাঁর বৈমাত্রেয় বোনের বিবাহ হয়, যিনি রাজা উদয়ের মৃত্যুর পর রাজ্য শাসন করেছিলেন। কুসজাতকে (V. p. 279f) বর্ণিত আছে যে, প্রভাবতীকে পিত্রালয় থেকে ফিরিয়ে আনবার জন্য যাত্রাকালে কুশকুমার মাতা শীলাবতীকে তাঁর অনুপস্থিতিতে রাজ্য শাসন করার জন্য অনুরোধ করেন। শীলাবতী এতে তাঁর সম্মতি প্রকাশ করেন এবং রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। হত্থিপালজাতকে (IV. p. 487) উল্লেখ আছে যে, বারাণসীরাজ এসুকারী রাজ্য ত্যাগ করে সন্ন্যাস পদ অবলম্বন করায় রাজপদ শূন্য হয়। এতে নাগরিকবৃন্দ চিন্তিত হয়ে রাজদ্বারে সমবেত হন এবং মহিষীকে রাজ্য শাসন করার জন্য প্রার্থনা জানান। তবে একপণ্ণজাতক (I. p. 504), চূল্লকলিঙ্গজাতক (III. p. 3) সাক্ষ্য দেয় যে, সর্বক্ষেত্রে রাজপদ বংশগত ছিল না। লোকে যাঁকে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত মনে করত, সমাজরক্ষার জন্য

Dhaka University Institutional Repository

তাঁকেই নিজেদের 'বিশ্বপতি' হিসেবে নির্বাচিত করতো। উলূকজাতকের (II. p. 351-352) অতীতবস্তুতে যে জনশ্রুতি লিপিবদ্ধ আছে, তা এই মতেরই সমর্থন করে। কোনো কোনো জাতকে রাজতন্ত্রের পরিবর্তে কুলতন্ত্র এবং গণতন্ত্র প্রচলিত থাকার কথাও উল্লেখ পাওয়া যায়। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় নির্দিষ্টকালের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিকে শাসক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হতো। অপরদিকে কুলতন্ত্র শাসন ব্যবস্থায় কুলভুক্ত কিছু লোক একত্রিত হয়ে শাসনকার্য নির্বাহ করতেন। ভদ্দসালজাতকে (IV. p. 144ff) কুলতন্ত্র শাসন ব্যবস্থার উল্লেখ পাওয়া যায়। বজ্জি, মল্ল, শাক্য, কোলীয়, মদ্র, কুরু, পঞ্চাল প্রভৃতি ক্ষত্রিয় শ্রেণির রাজ্যে কুলতন্ত্র শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল বলে জানা যায়। এসব রাজ্য উত্তর ভারতে অবস্থিত ছিল। এতে বোঝা যায়, উত্তর ভারত তথা হিমালয়ের পাদদেশ সংলগ্ন উপজাতীয় অঞ্চলগুলোতে কুলতন্ত্র বা গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক গৌতমবুদ্ধ শাক্যজাতিভুক্ত ছিলেন। একপণ্নজাতকে (I. p. 504) কুলতন্ত্র শাসকদের 'রাজা' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু ভদ্দসালজাতকে তাঁদেরকে 'গণরাজ' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। মহানারদকস্সপজাতক (VI. pp. 219-255) হতে জানা যায় যে, বজ্জিরাজ্যে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। লিচ্ছবিগণ একত্রিত হয়ে সম্প্রীতির সঙ্গে রাজ্য শাসন পরিচালনা করতেন এবং প্রত্যেকে 'রাজা' বা 'গণরাজা' হিসেবে অভিহিত হতেন। টি. ডব্লিউ. রিস ডেভিড্স এবং কানিংহামের মতানুসারে আটটি মৈত্রীবদ্ধ গোষ্ঠী বজ্জিরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৪০]

জাতক পাঠে জানা যায়, প্রশাসনিক ব্যবস্থার কর্ণধার ছিলেন রাজা। প্রশাসনের সর্বত্র ছিল রাজার কর্তৃত্ব। এ কারণে কখনো কখনো রাজারা অত্যাচারী হতেন। তণ্ডুলনালীজাতক (I. p. 124f), ভরুজাতক (II. p. 170ff), ধম্মদ্ধজজাতক (II. p. 187ff), খন্তিবাদীজাতক (III. p. 39ff), চূল্লধম্মজাতক (III. p. 178ff), মাতঙ্গজাতক (IV. p. 376ff), চেতিয়জাতক (III. p. 454ff) প্রভৃতিতে অধার্মিক, মদ্যাসক্ত, অর্থলোভী, উৎকোচগ্রাহী রাজার কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাপিঙ্গলজাতক (II. p. 240), গণ্ডতিন্দুজাতক (V. p. 99ff) প্রভৃতি জাতকে অধার্মিক রাজা কর্তৃক হৃদয়বিদারক অত্যাচার এবং অতিরিক্ত কর আদায়ের কথা উল্লেখ আছে। মাতঙ্গজাতক (IV. p. 376ff) হতে জানা যায় যে, বুদ্ধের সমসাময়িক কোশাম্বীরাজ উদয়ন অতিরিক্ত মদ্যাসক্ত ছিলেন। তিনি একদা মদ্যপানে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষু পিণ্ডোলভারদ্বাজকে যন্ত্রণা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁর মাথায় বিষাক্ত পিপীলিকা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। ভরুজাতকে (II. p. 170ff) উল্লেখ আছে যে, কোশলরাজ প্রসেনজিত উৎকোচ গ্রহণ করে প্রজাদের প্রতি অবিচার করতেন। তণ্ডুলনালীজাতকে (I. p. 124f) উক্ত আছে যে, বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত অতিরিক্ত অর্থলোলুপ ছিলেন। তিনি

Dhaka University Institutional Repository

রাজ্যের অশ্ব, হস্তি, মণি, মুক্তা এবং দ্রব্যাদির ইচ্ছেমত মূল্য নির্ধারণ করতেন। তাঁর অর্ঘকারকও অর্থ উৎকোচ গ্রহণ করে দ্রব্যাদির ইচ্ছেমত মূল্য নির্ধারণ করতেন। ধম্মদ্ধজজাতক (II. p. 187ff) হতে জানা যায় যে, বারণসীরাজ যশঃপাণির সেনাপতি উৎকোচ গ্রহণ করে বিচারকালে একের সম্পত্তি অন্যেকে দিয়ে দিতেন। এভাবে রাজা এবং রাজকর্মচারীগণ প্রজাদের উপর নানাভাবে অত্যাচার করতেন বলে জাতকে সাক্ষ্য পাওয়া যায়। তবে রাজশক্তির উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণের জন্য অমাত্য বা মন্ত্রী, ধর্মীয় গুরু, পুরোহিত, আচার্য প্রমুখ উপদেষ্টাগণ সচেষ্ট থাকতেন। অনেক রাজা তাঁদের উপদেশ মেনে চলতেন। ভরুজাতক (II. p. 170ff), তণ্ডুলনালীজাতক (I. p. 124f), কুক্কুজাতক (III. p. 317ff) এবং রথলট্ঠিজাতক (III. p. 104ff) প্রভৃতি হতে জানা যায় যে, রাজাগণ উপদেষ্টাদের সদুপোদেশ অনুসরণ করে ন্যায় ও ধর্মের পথে রাজত্ব করতেন। ভরুজাতকে (II. p. 170ff) উল্লেখ আছে যে, বুদ্ধ রাজা প্রসেনজিতকে উৎকোচগ্রাহী ভরু বা ভৃগুরাজের করুণ পরিণতির কথা বর্ণনা করে তাঁকে উৎকোচ গ্রহণ এবং অন্যায় কর্মকাণ্ড হতে নিবৃত করেন। তেলপত্তজাতকেও (I. p. 395f) এরূপ উদাহরণ পাওয়া যায়। এ জাতকে বর্ণিত আছে যে, তক্ষশিলারাজ পুরোহিত উপদেষ্টার উপদেশ মেনে অন্যায় কর্মকাণ্ড হতে বিরত থাকতেন। একদা রানী তক্ষশিলারাজ নিরাপরাধ প্রজাদের শাস্তি দিতে অনুরোধ করলে রাজা বলেন, "ভদ্রে, সমস্ত রাজ্যের উপর আমার প্রভুত্ব নেই। আমি সমস্ত প্রজার প্রভু নই। যারা দুরাচারী, রাজদ্রোহী, অন্যায়কারী আমি কেবল তাদের দণ্ড দিতে পারি।" ক্ষেত্র বিশেষে উপদেষ্টা এবং রাজকর্মচারীদের কুপরামর্শেও রাজারা অত্যাচারী হয়ে উঠতেন বলে জাতকে উল্লেখ পাওয়া যায়। ভরুজাতকে (II. p. 170ff) এবং পদকুসলমাণবজাতকে (III. p. 501ff) দুষ্ট অমাত্য এবং পুরোহিতের কুপরামর্শে রাজার অত্যাচারী ও অধার্মিক হয়ে ওঠার কথা বর্ণিত আছে। আবার, সকল রাজা পুরোহিত বা উপদেষ্টাদের উপদেশ বা শাস্ত্রের কথা মান্য করতেন না। এক্ষেত্রে প্রজারা রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতেন এবং রাজাকে হত্যা করে নতুন রাজা নির্বাচন করতেন। উলূকজাতক বিশ্লেষণে দেখা যায়, তখনকার শাসন প্রণালী সাধারণত রাজতন্ত্র হলেও অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে প্রজারা বিদ্রোহ করে তাঁকে পরাস্থ করতে স্থির প্রতিজ্ঞ হন। মনিচোরজাতক (II. p. 121ff), পদকুসলমাণবজাতক (III. p. 501ff) এবং সচ্চংকিরজাতক (I. p. 322ff) প্রভৃতিতে অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে প্রজা বিদ্রোহের কথা এবং রাজাকে হত্যা করে নতুন রাজা নির্বাচনের কথা উল্লেখ আছে। এ দু'টি জাতকে রাজাকে হত্যা করে ব্রাহ্মণকে রাজপদে অভিষিক্ত করার কথা বর্ণিত আছে। জাতক পাঠে আরো জানা যায় যে, নির্বংশভাবে কোনো রাজার মৃত্যু হলে বংশান্তর বা জনগণের মধ্য থেকে রাজা নির্বাচন করা হতো। এরূপ রাজা নির্বাচনের জন্য মহাজনকজাতক (VI. p. 30ff), নিগ্রোধজাতক (IV. p.

37ff), দরীমূখজাতক (III. p. 238ff) এবং সোনকজাতকে (V. p. 247ff) প্রভৃতিতে অদ্ভুত প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায়। এ প্রথায় ক্ষত্রিয় ছাড়াও যে কোনো লোক রাজপদ লাভ করতে পারতো। উপর্যুক্ত জাতক মতে, মৃত রাজার সৎকার শেষে রাজা নির্ধারণের জন্য পুষ্পরথ প্রেরণ করা হতো। রথ প্রেরণের পূর্বে রাজধানী নানাভাবে সজ্জিত করা হতো এবং সর্বত্র ভেরি বাজিয়ে রথ প্রেরণের কথা ঘোষণা প্রদান করা হতো। সাদা ঘোড়া রথটি টেনে রাজ্য পরিক্রম করতো। সঙ্গে থাকতো চতুরঙ্গিনী সেনা ও বাদ্যযন্ত্র দল। পরিবেষ্টিত রথে রাজচিহ্ন হিসেবে পরিচিত পাদুকা, খড়গ, ছত্র, উষ্ণীষ ও চামড় প্রভৃতি রাখা হতো। পুরোহিত রাজা নির্বাচনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। দরীমূখজাতকে উল্লেখ আছে এক উদ্যানে পুষ্পরথ থামার পর পুরোহিত পাদদ্বয়ের লক্ষণ দেখে বোধিসত্ত্বকে রাজা নির্বাচন করেছিলেন। পদকুসলমাণবজাতক (III. p. 501ff) এবং সচ্চংকিরজাতকে এ প্রথায় দু'জন ব্রাহ্মণের রাজ্য প্রাপ্তির কথা উল্লেখ আছে। নিগ্রোধজাতকে (IV. p. 37ff) এ প্রথায় অজ্ঞাত রমণীর পরিত্যক্ত পুত্রের রাজ্য লাভের কথা বর্ণিত আছে।

সংকিচ্চজাতক (V. p. 263ff), সঞ্জীবজাতক (I. p. 508f) এবং ভদ্দসালজাতক (IV. p. 144ff) প্রভৃতিতে রাজকুমার কর্তৃক রাজাকে হত্যা করে রাজপদ লাভের কথা উল্লেখ আছে। সঞ্জীবজাতক (I. p. 508f) হতে জানা যায় যে, রাজা অজাতশত্রু পিতা মগধরাজ বিম্বিসারকে হত্যা করে রাজপদ লাভ করেছিলেন। ভদ্দসালজাতকে (IV. p. 144ff) উল্লেখ আছে যে, রাজকুমার বিড়ূঢ়ব কর্তৃক রাজা প্রসেনজিত সিংহাসন চ্যুত হয়েছিলেন। এ দু'জন রাজকুমারের পিতৃহত্যা পূর্বক রাজপদ লাভের কাহিনি ঐতিহাসিকভাবেও সত্য বলে গণ্য করা হয়।

উপর্যুক্ত বিষয় পর্যালোচনা করে বলা যায়, প্রাচীন ভারতের অধিকাংশ রাজ্য বা জনপদে রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল এবং রাজপদ ছিল বংশগত। তবে ক্ষেত্র বিশেষে গণতন্ত্র এবং কুলতন্ত্রও প্রচলিত ছিল। সেক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজা নির্বাচন করে রাজপদে অভিষিক্ত করা হতো।

৪.২. উপরাজা

ঐতিহাসিক আকর গ্রন্থ ও জাতক পাঠে জানা যায় যে, রাজার পরেই ছিল উপরাজের স্থান। দুম্মেধাজাতক (I. p. 259ff), তুসজাতক (III. p. 122ff) এবং কুম্মাসপিণ্ডজাতক (III. p. 405ff) প্রভৃতি হতে জানা যায় যে, সাধারণত শিক্ষা সমাপ্তির পর জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র উপরাজের পদ অলঙ্কৃত করতেন এবং রাজার মৃত্যুর

Dhaka University Institutional Repository

পর তিনি রাজপদে অধিষ্ঠিত হতেন। তবে ক্ষেত্র বিশেষে এর ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করা যায়। যেমন, দেবধম্মজাতক (I. p. 132), অসদিসজাতক (II. p. 87ff) এবং কুসজাতক (V. p. 278ff) প্রভৃতি সাক্ষ্য দেয় যে, রাজপুত্র না থাকলে রাজার ভ্রাতাকে উপরাজ করা হতো।

৪.৩. অমাত্য বা মন্ত্রি পরিষদ

জাতকে এবং বিভিন্ন পালি গ্রন্থে রাজাকে সর্বতোভাবে সাহায্যকারী এক শ্রেণির কর্মকর্তার উল্লেখ পাওয়া যায়, যাঁরা অমাত্য নামে অভিহিত। বর্তমানকালের মন্ত্রিপরিষদের ন্যায় ছিল অমাত্য পরিষদের ভূমিকা। রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অমাত্য পরিষদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন এবং প্রশাসনের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় তাঁদের অধীনে পরিচালিত হতো। রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য 'সন্থাগার' নামক প্রশাসনিক ভবন ছিল, যা বর্তমান কালের সাংসদ ভবনের ভূমিকা পালন করতো। জাতকে সর্ববিষয়ক মন্ত্রী বা প্রধান মন্ত্রি (সব্বথক মহামত্ত), অর্থমন্ত্রী বা অর্থধর্মানুশাসক, সেনাপতি, পুরোহিত, বিচারক বা বিনিশ্চয়মাত্য, কোষাগারাধ্যক্ষ বা ভাণ্ডারগারিক, গণক মহামাত্য, অর্ঘকারক (অগ্ঘণকো), দ্রোণমাত্য, ছত্র-গ্রাহক (ছত্ত-গাহক), খড়্গ-গ্রাহক (খগ্গগাহক), রাজবৈদ্য, হিরণ্যক, রজ্জুক, শ্রেষ্ঠী (সেট্ঠি), সারথী, হস্তিমঙ্গলকারক, গজাচার্য প্রমুখ কর্মকর্তাগণকে অমাত্য হিসেবে অভিহিত করতে দেখা যায়। অর্থাৎ এসব কর্মকর্তা মন্ত্রিপরিষদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সব্বথক মহামত্ত নামক কর্মকর্তা সরকারী কাজের সার্বিক তত্ত্ববধান করতেন। অর্থাৎ তিনি প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা পালন করতেন। অর্থধর্মানুশাসক অর্থমন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকতেন। পুরোহিত রাজার ধর্মগুরু বা ধর্ম-বিষয়ক রীতি-নীতি সম্পর্কে ও করণীয়-অকরণীয় বিষয়ে উপদেশ প্রদান করতেন। মহাজনকজাতক (VI. p. 30ff), নিগ্রোধজাতক (IV. p. 37ff), দরীমূখজাতক (III. p. 238ff) এবং সোনকজাতক (V. p. 247ff) প্রভৃতি হতে জানা যায় যে, পুরোহিতগণ ক্ষেত্র বিশেষে রাজা নির্বাচনেও ভূমিকা রাখতেন। মহাসুপিনজাতক (I. p. 333ff), লোহকুম্ভিজাতক (III. p. 43ff), সুসীমজাতক (II. p. 46ff) প্রভৃতি হতে জানা যায় যে, রাজা দুঃস্বপ্ন দেখলে, রাজ্যে দুর্নিমিত্ত বা অশুভ কোনো কিছু দেখা দিলে, রানীর গর্ভজাত সন্তানের শুভাশুভ, রাজার অভিষেক ও সৎকার, রাজ্যের ভাল-মন্দ প্রভৃতি বিষয়ে পুরোহিতের উপদেশ ছিল পালনীয়। সুসীমজাতক (II. p. 47) চেতিয়জাতক (III. p. 456), বন্ধনমোক্খজাতক (I. p. 439) প্রভৃতি হতে জানা যায় যে, পুরোহিতের পদ ছিল বংশগত। তবে ক্ষেত্র বিশেষে এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়। যেমন, কুরুধম্মজাতক (II. p. 366ff), সরভঙ্গজাতক (V. p. 125ff),

Dhaka University Institutional Repository

তিলমুট্ঠিজাতক (II. p. 277) প্রভৃতিতে শিক্ষাগুরুর পুরোহিতের পদ অলঙ্কৃত করার কথা বর্ণিত আছে। ছবকজাতকে (III. p. 27ff) বারাণসীরাজ পুরোহিতের নিকট শিক্ষা লাভের কথা উল্লেখ আছে। এতে বোঝা যায়, রাজপরিবারে পুরোহিতের ব্যাপক প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল এবং তিনি একাধারে গুরু, পুরোহিত এবং আচার্যের ভূমিকা পালন করতেন। ফলে রাজবংশের সঙ্গে পুরোহিত বংশের বংশপরম্পরা সম্পর্ক ছিল বলে ধারণা করা যায়। সহ্যজাতকে (III. p. 31) রাজপুত্র এবং পুরোহিতপুত্র সমান আদরে রাজসংসারে প্রতিপালিত হওয়ার কথা উল্লেখ আছে। চূল্লসুতসোমজাতক (V. p. 178) হতে জানা যায় যে, সেনাপতি সাধারণত প্রতিরক্ষা প্রধানের ভূমিকা পালন করতেন।

কূটবানিজজাতক (II. p. 181) এবং গামণিচণ্ডজাতক (II. p. 297ff) হতে জানা যায় যে, বিচারক বা বিনিশ্চয় মহামাত্য আইন ও বিচার সংক্রান্ত বিষয়ে দেখা শোনা করতেন। এঁরা গুরুতর অপরাধীদের বিচার করতেন এবং নির্দোষ প্রমাণিত হলে ছেড়ে দিতে পারতেন। এতে বোঝা যায়, বিনিশ্চয় মহামাত্য বর্তমান কালের পুলিশের মতো ভূমিকা পালন করতেন। কিন্তু উক্ত ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হলে তাকে বোহারিক নামক অমাত্যের নিকট প্রেরণ করা হতো। অন্যান্য পালি সাহিত্যে বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত সূত্রধর এবং অষ্টকুলক[৪১] নামক আইন কর্মকর্তার উল্লেখ পাওয়া গেলেও জাতকে পাওয়া যায় না। দীর্ঘনিকায়ের অট্ঠকথা সুমঙ্গলবিলাসিনী[৪২] গ্রন্থে বজ্জিদের বিচার ব্যবস্থার উল্লেখ পাওয়া যায়। এ গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারের জন্য প্রথমে মন্ত্রীর নিকট হস্তান্তর করা হতো। তিনি অভিযোগসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করতেন, যাতে নির্দোষ ব্যক্তি দণ্ডের শিকার না হয়। তিনি সেই ব্যক্তিকে নিরাপরাধী মনে করলে মুক্তি দিতেন, আর দোষী মনে করলে পুনঃবিচারের জন্য উচ্চক্ষমতার অধিকারী বোহারিক নামক অমাত্যের নিকট প্রেরণ করতেন। বিনয়পিটকেও উল্লেখ আছে যে, রাজা বিম্বিসার দোষী ব্যক্তিকে কঠোর শাস্তি দানের পূর্বে বোহারিক নামক অমাত্যের সঙ্গে পরামর্শ করতেন। বোহারিক নিরপেক্ষভাবে বিচার করতেন। তিনি দোষী সাব্যস্ত করলে পুনঃবিচারের জন্য আইন তত্ত্বাবধায়ক সূত্রধরের নিকট প্রেরণ করতেন। তাঁর নিকট দোষী সাব্যস্ত হলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটজন প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত অষ্টকুলকারকদের নিকট প্রেরণ করতেন। তাঁরা অপরাধ সম্পর্কে নিশ্চিত হলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রধান সেনাপতির নিকট প্রেরণ করতেন, প্রধান সেনাপতি উপরাজের নিকট এবং উপরাজ রাজার নিকট প্রেরণ করে ফৌজদারী আইন বিধি অনুসারে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান করতেন। এরূপ বিচার পদ্ধতি ব্রিটিশ আইনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। ধারণা করা হয় যে, বজ্জিদের এই বিচার পদ্ধতি অনুসরণ করে ব্রিটিশ ফৌজদারী আইন 'জুরির বিচার বা অ্যাসেসর' বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল।[৪৩]

ধম্মদ্ধজজাতক (II. p. 187ff), খণ্ডহালজাতক (VI. p. 129ff) এবং কিংছন্দ (V. p. 2ff) সেনাপতি, পুরোহিত এবং উপরাজকে বিচারকের ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। তুণ্ডিলজাতক (III., p. 287), তেসকুণজাতক (V. p. 110f) প্রভৃতিতে উল্লেখ আছে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রবেণিপুস্তক বা Book of Precedent অনুসারে দণ্ড বিধান করা হতো। এছাড়া জাতকে বিচারের প্রতিবিচারও দেখা যায়। ধম্মদ্ধজজাতকে (II. p. 187ff) উল্লেখ আছে যে, সেনাপতি অবিচার করায় পুরোহিত এর প্রতিবিচার করেন। খণ্ডহালজাতক (VI. p. 129ff) পুরোহিত অবিচার করায় উপরাজকে প্রতিবিচার করতে দেখা যায়। রথলট্‌ঠিজাতক (III. p. 104ff) হতে জানা যায় যে, উচ্চশ্রেণির কর্মকর্তাদের বিচার করতেন স্বয়ং রাজা। এ জাতকে উল্লেখ আছে যে, একদা রাজা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা না করে দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করেন। তখন বিনিশ্চয় মহামাত্য রাজাকে বলেন, 'মহারাজ ! লোকে অনেক সময় মিথ্যা-অভিযোগও করে থাকেন। এ কারণে অভিযোগকারী এবং অভিযুক্ত উভয় ব্যক্তির কথা শ্রবণ করা উচিত।' বিনিশ্চয় মহামাত্যের কথা শুনে রাজা দণ্ডাজ্ঞা প্রত্যাহার করেন। অবারিয়জাতক (III. p. 229) এবং গামণিচণ্ডজাতকে (II. p. 297ff) উল্লেখ আছে যে, গ্রামবাসী বা রাজকর্মচারীরা অপরাধীকে গ্রেফতার করতো। গামণিচণ্ডজাতকে (II. p. 297ff) অপরাধী ধরার এক অদ্ভুত প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায়। এ প্রথা মতে, লোকে একটা ঢিল বা একখানা খাপরা তুলে অপরাধীকে বলত, "এ দেখ রাজদূত, তোমাকে রাজার নিকট যেতে হবে।" এ কথা শুনে যদি কেহ যেতে অপরাগতা প্রকাশ করতো তখন তাকে অতিরিক্ত দণ্ড ভোগ করতে হতো। মহাসীলবজাতক (I. p. 262f), কুণালজাতক (V. p. 313ff), কণবেরজাতক (III. p. 59ff), মনিচোরজাতক (II. p. 122f), পুপ্‌ফরত্তজাতক (I. p. 499f), গামণিচণ্ডজাতক (II. p. 297ff) প্রভৃতিতে হত্যা, চুরি, ডাকাতি, প্রতারণা এবং ব্যভিচার প্রভৃতি প্রধান প্রধান অপরাধের জন্য শাস্তিস্বরূপ মৃত্যুদণ্ড, অঙ্গচ্ছেদ, নির্বাসন, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত এবং অর্থদণ্ডাদেশ দিতে দেখা যায়। তবে রাজা ভিন্ন অন্য কেহ এই দণ্ডাদেশ দিতে পারতেন না। কখনো শূলে চড়িয়ে, কখনো মস্তক ছিন্ন করে, কখনো বা ভূগর্ভে প্রোথিত করে মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকর করা হতো। প্রাণদণ্ডাদেশ ব্যক্তির গলায় রক্তকরবীর মালা পরিধান করা হতো, যা বর্তমানকালের যমটুপির সঙ্গে তুলনীয়।

সুবণ্ণকক্কটজাতক (III. p. 293) হতে জানা যায় যে, কোষাগারাধ্যক্ষ বা ভাণ্ডারগারিক সাধারণত রাজকীয় কোষাগার তত্ত্বাবধান করতেন। 'আগারক' নামক কর্মচারী তাঁর কাজে সহায়তা করতেন। গণক মহামাত্য হিসাব সংরক্ষক মন্ত্রণালয়ের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। অর্ঘকারক মূলত জিনিস পত্রের মূল্য

Dhaka University Institutional Repository

নির্ধারণ করতেন। দ্রোণমাত্য শস্যভাণ্ডার, হিরণ্যক রত্নভাণ্ডার পরিমাপ করতেন। কুরুধম্মজাতক (II. p. 367) হতে জানা যায় যে, রজ্জু-গহক অমচ্চ বা অমাত্য জমি জরিপ ও তৎসম্পর্কিত শুল্ক নির্ধারণ বিষয়ে মুখ্য ভূমিকা পালন করতেন। ছত্র-গ্রহাক মূলত রাজছত্র ধারণ করতেন। সারথী রাজার রথ চালনার দায়িত্ব পালন করতেন। যুদ্ধক্ষেত্রে সারথীর উপর নির্ভর করতো রাজার জীবন-মরণ বা জয় পরাজয়। এ কারণে তাঁকে উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন কর্মচারী হিসেবে গণ্য করা হতো। দোবারিক বা দ্বাররক্ষক নগর দ্বার রক্ষা করতেন। নগর প্রশাসনে সুরক্ষা ব্যবস্থায় দ্বাররক্ষক বা দোবারিকের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তিনি শুধু পরিচিত লোকদেরই নগরে প্রবেশের অনুমতি দিতেন। এ কারণে অপরিচিত জনেরা নগরে প্রবেশ করতে পারতো না। বড় বড় নগরের দ্বার রাত্রে এবং যুদ্ধের সময়ে বন্ধ থাকতো। যুদ্ধের সময় বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে নগরদ্বার রক্ষা করা হতো। এ কারণে দ্বাররক্ষক বা দোবারিকদের উচ্চ শ্রেণির কর্মকর্তা হিসেবে মর্যাদা দেয়া হতো।

চূল্লকসেট্ঠি (I. p. 117-18), ময্যজাতক (III. p. 299f), পীঠজাতক (III. p. 119f), পুণ্নপাতি (I. p. 269f), ইল্লীস (I. p. 346), নিগ্রোধজাতক (IV. p. 38f) প্রভৃতি হতে জানা যায় যে, শ্রেষ্ঠী পদ ছিল কুলক্রমাগত, তাঁরা ধনাধ্যক্ষ বা ব্যাংকারের ভূমিকা পালন করতেন, রাজ্যের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়ে রাজাকে সাহায্য করতেন এবং রাজকোষে অর্থের অভাব হলে রাজাকে ঋণ প্রদান করতেন। তাঁরা রাজদরবারে উপস্থিত থাকতেন। সুধাভোজন (V. p. 383) জাতক হতে জানা যায় যে, শ্রেষ্ঠীদের একজন সহকারী থাকতেন, যিনি 'অনুশ্রেষ্ঠী' নামে অভিহিত হতেন। এছাড়াও তাঁরা পণ্যাদি বিলি-বণ্টনে মুখ্য ভূমিকা পালন করতেন।

নগর প্রশাসনে শ্রেষ্ঠীদের বিশেষ প্রভাব ছিল। মহাসীলবজাতক (I. p. 267) এবং বিনয়পিটক[৪৪] হতে জানা যায় যে, নগরগুলো পরিচালনার জন্য নেগম, গনবন্ধন, সেণি, পুগ প্রভৃতি পরিষদের উল্লেখ দেখা যায়। বণিক শ্রেণির লোকদের বিবাদ নিরসনের ক্ষমতা এসব পরিষদের ছিল। এছাড়া এঁদের আরো বিশেষ ক্ষমতা ছিল। এ প্রসঙ্গে শান্তিকুসুম দাশ গুপ্তের অভিমত প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে, "এই শ্রেণিগুলি (guilds) সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্যের গুণাগুণ পরীক্ষা করে দাম নির্ধারণ করত এবং কারিগর ও শ্রমিকদের কাজের মান অনুসারে বেতন নির্ধারণ করত। শ্রেণির আদালতী ক্ষমতাও ছিল যা কোনো কারিগর বা বিণককে তাদের কাজ বন্ধ করতে নির্দেশ দিতে পারত; এবং শ্রেণির সদস্যের মৃত্যু ঘটলে তার বিধবা স্ত্রী এবং তার সন্তান-সন্ততিদের মাসোহারা দেওয়ার ব্যবস্থা করত। প্রত্যেক শ্রেণির নিজের বিশেষ নির্দেশক

Dhaka University Institutional Repository

শীলমোহর থাকত। শ্রেণির নায়ক হিসেবে সাধারণত নির্বাচিত বা বংশপরম্পরায় মনোনীত কোনো এক প্রাজ্ঞ ব্যক্তি হতেন।"[৪৫] এসব পরিষদের প্রধান হিসেবে কাজ করতেন মূলত শ্রেষ্ঠী (সেট্‌ঠি), সার্থবাহ (সত্থবাহ) এবং কুলিক বা জৈষ্ঠক (জেট্‌ঠক)। ব্যবসা বাণিজ্যে সমৃদ্ধির ফলেই এসব সম্প্রদায়ের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছিল। বট্টকজাতক (I. p. 433) হতে জানা যায় যে, পরিষদগুলো 'উত্তর শ্রেষ্ঠী' বা 'মহাশ্রেষ্ঠী' নামক একজন ব্যক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। বিনয়পিটক, মজ্ঝিমনিকায় এবং অঙ্গুত্তরনিকায় প্রভৃতি গ্রন্থ হতে জানা যায় যে, 'পুগ' নামক পরিষদ শিক্ষার্থীদের অবৈতনিক শিক্ষা লাভের সুযোগ প্রদান করতেন।[৪৬] নগর প্রশাসনে এসব পরিষদের কর্তৃত্ব থাকলেও মুখ্য ভূমিকা পালন করতেন রাজা। এ প্রসঙ্গে এর্ডওয়াড মিসেল (Edward Michael) বলেন, "শ্রেষ্ঠী, স্বার্থবাহ এবং কুলিক প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই নিজ নিজ নিগম বা শ্রেণি ছিল, নিজেদের স্বার্থ, অধিকার রক্ষা ও বিস্তারের জন্য এ শ্রেণিগুলো আদি যুগে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করত। শ্রেণিগুলো প্রাচীন কাল থেকেই বিদ্যমান ছিল, কিন্তু বৌদ্ধযুগে প্রায় সকল রকম বাণিজ্য ও শিল্পেই শ্রেণিগুলো আদিপত্য বিস্তার করেছিল।"[৪৭]

রাজবৈদ্য রাজপরিবারের এবং অমাত্যগণের চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত থাকতেন। রাজাসংসারে তাঁরও বেশ প্রতিপত্তি ছিল। চূল্লকসেটঠিজাতক (I. p. 116), জীবনসঞ্জীবজাতক (I. p. 509), সত্তিগুম্বজাতক (IV. p. 430) এবং চূল্লহংসজাতকে (V. p. 333) রাজবৈদ্য জীবকের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বর্ণনা পাওয়া যায়।

৪.৪. অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী

ছবকজাতক (III. p. 30), সুলসাজাতক (III. p. 436) এবং মহাহংসজাতক (V. p. 279) প্রভৃতি হতে জানা যায় যে, নগর-গুত্তিক নামক নগর রক্ষক কর্মকর্তা প্রশাসনের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি মূলত বোহারিক মহামাত্যের অধীনে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকতেন। অপরাধী ধরা ও শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ ক্ষমতা ছিল। কণবেরজাতকে (III. p. 59ff) নগর-গুত্তিকের উৎকোচ গ্রহণের কথা এবং নিরাপরাধ ব্যক্তির প্রাণবধের কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজভট্ট নামক কর্মচারী আইন রক্ষায় ক্ষমতা প্রাপ্ত ছিলেন। দসব্রাক্ষ্মণজাতক (IV. p. 366) এবং গণ্ডিতিন্দুজাতক (V. p. 103) সাক্ষ্য দেয় যে, তৎকালে নগর প্রশাসন ব্যবস্থায় শুল্ক আদায় ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। যিনি শুল্ক সংগ্রহের দায়িত্ব পালন করতেন তিনি 'বলিসাধক' এবং যিনি শুল্কসংক্রান্ত বিষয় পর্যবেক্ষণ করতেন তিনি 'কম্মিক' নামে অভিহিত হতেন। সেকালে নগরে প্রবেশ এবং নগর হতে বর্হিগমনের সময় কর্তৃপক্ষকে শুল্ক প্রদান করতে হতো। রাজস্ব বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কম্মিকের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুত্তবিভঙ্গ[৪৮] গ্রন্থ হতে জানা যায়

Dhaka University Institutional Repository

যে, একদা বণিকদের এক শকট চালক শুল্ক ফাঁকি দিয়ে রাজগৃহ নগর হতে বের হয়ে যাচ্ছিল, তখন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কম্মিকরা পথ অবরোধ করে শকটটি আটক পূর্বক কর আদায় করে।

জাতক মতে, সর্বনিম্নশ্রেণির কর্মচারী ছিল গ্রামভোজক। কুলাবক জাতক (I. p. 199f) এবং উভতোভট্ঠজাতক (I. p. 483) হতে জানা যায় যে, গ্রামভোজক শান্তিরক্ষা বাহিনী হিসেবে মূলত রাজার আদেশে নিযুক্ত হতেন, রাজকর সংগ্রহ করে পাঠাতেন, গ্রামবাসীদের ছোটখাট মকদ্দমার বিচার করতেন, নানারকম উপদ্রব নিবারণের ব্যবস্থা করতেন এবং গুরুতর অপরাধীকে বিচারের জন্য রাজধানীতে প্রেরণ করতেন। পানীয়জাতকে (IV. p. 114f) গ্রামভোজক কর্তৃক প্রাণী হত্যা ও সুরাপানে নিষেধাজ্ঞা জারি করতে দেখা যায়। খরস্সরজাতক (I. p. 354ff), এবং গহপতিজাতকে (II. p. 135) অত্যাচারী গ্রামভোজকের উল্লেখ পাওয়া যায়।

জাতকে প্রশাসন সংক্রান্ত উল্লিখিত তথ্য বিশ্লেষণে বোঝা যায়, বর্তমানকালের ন্যায় প্রাচীনকালেও অত্যাচার-অবিচার হতো এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার কর্মকর্তা-কর্মচারীর সমন্বয়ে গঠিত রাষ্ট্রীয় প্রশাসন জনজীবন নিয়ন্ত্রণ করতো। তবে প্রশাসনে রাজা ছিলেন সর্বেসর্বা।

৫. রাষ্ট্রের আয়-ব্যয় খাত ও রাজস্ব ব্যবস্থা

রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থার ব্যয়ভার রাজকর বা রাজস্ব সংগ্রহের মাধ্যমে নির্বাহ করা হতো। জাতকে কর আদায়ের কথা উল্লেখ পাওয়া গেলেও রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়খাত এবং রাজকর বা রাজস্ব সম্পর্কে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের ন্যায় সুনির্দিষ্ট বিধি-ব্যবস্থার উল্লেখ নেই। তবে এ সম্পর্কে জাতকে বিক্ষিপ্তভাবে যে তথ্য পাওয়া যায় তা দ্বারা প্রাচীন ভারতের আয়-ব্যয় ও রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। মহাস্সারোহজাতক (III. p. 8-9), মহাপিঙ্গল (II. p. 240) এবং গণ্ডতিন্দুজাতকে (V. p. 99ff) অধার্মিক রাজা কর্তৃক অতিরিক্ত কর আদায়ের কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। কুরুধম্মজাতক (II. p. 366ff) পাঠে জানা যায় যে, জনগণ উৎপন্ন শস্যের একটা নির্দিষ্ট অংশ রাজকর হিসেবে প্রদান করতো। দ্রোনমাত্য কর হিসেবে শস্য মেপে নিতেন। কুলাবকজাতক (I. p. 199f) এবং উভতোভট্ঠজাতক (I. p. 483) হতে জানা যায় যে, গ্রামভোজক গ্রামীণ জনগণের নিকট হতে রাজকর সংগ্রহ করতেন। উক্ত জাতকসমূহে মাদক দ্রব্যের উপর শুল্ক ধার্য্যের কথা উল্লেখ আছে। দসব্রাহ্মণজাতক (IV. p. 366) এবং গণ্ডিতিন্দুজাতক (V. p. 103) সাক্ষ্য দেয় যে, তৎকালে নগর প্রশাসন ব্যবস্থায় শুল্ক আদায় ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। জাতকদ্বয়ে উল্লেখ আছে যে, 'বলিসাধক বা বলি প্রতিগ্রাহক' নামক কর্মচারী নগর হতে রাজকর সংগ্রহ

Dhaka University Institutional Repository

করতেন এবং 'কম্মিক' নামক কর্মচারী শুল্ক ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করতেন। জাতকসমূহে আরো উল্লেখ আছে যে, নগরের প্রবেশকৃত রথ হতেও শুল্ক সংগ্রহ করা হতো। মযাজাতক (III. p. 301), হত্থিপালজাতক (IV. p. 474ff) এবং তেলপত্তজাতকে (I. p. 396f) বর্ণিত আছে যে, অস্বামীন ধন রাজার প্রাপ্য ছিল। এছাড়া, জাতকে রাজকর সম্পর্কে তেমন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে[৪৯] রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়ের খাত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। এ গ্রন্থে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের খাতগুলো চিহ্নিত করে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

ক) রাজার ব্যক্তিগত ব্যয় খাত : ১। দেবপূজার ব্যয় ২। পিতৃপুরুষদের শ্রাদ্ধাদির জন্য ব্যয় ৩। অনাথ, দরিদ্র এবং অক্ষম ব্যক্তিকে দান প্রদান এবং ৪। পুরোহিতকে দান প্রদান প্রভৃতির জন্য ব্যয়।

খ) রাজঅন্তঃপুর ব্যয় খাত : রাণী, রাজপুত্র, রাজকন্যাসহ রাজ পরিবারের সদস্যদের (জীবিকা ও রন্ধনশালা) জন্য ব্যয়।

গ) রাজকার্যে ব্যয় খাত : রাষ্ট্রীয়কার্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কর্মচারী, রথ, যুদ্ধাস্ত্র ও সৈন্যবাহিনী প্রভৃতির জন্য ব্যয়।

ঘ) সংরক্ষণাগার নির্মাণ সম্পর্কিত ব্যয় খাত: খাদ্যদ্রব্য, বিভিন্ন রকম পণ্য-সামগ্রী, অস্ত্র প্রভৃতি সংরক্ষণের জন্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ ব্যয়।

ঙ) শিল্প-কারখানা নির্মাণ : কৃষি ও শিল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন রকম কারখানা নির্মাণ ব্যয়।

চ) যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কিত ব্যয় খাত : যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে রাস্তা-ঘাট নির্মাণ ব্যয়।

ছ) শিক্ষা-স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ব্যয় খাত : শিক্ষায়তন, হাসপাতাল, শৌচারগার, পুষ্করণী প্রভৃতি নির্মাণে ব্যয়।

জ) পশু-পাখী সংরক্ষণে ব্যয় : পশু-পাখী সংরক্ষণের জন্য অভয়ারণ্য ও কুটির নির্মাণ ব্যয়।

উপর্যুক্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বিভিন্ন রকম আয়ের খাতের উল্লেখ পাওয়া যায়। দিলীপ কুমার গঙ্গোপাধ্যায়[৫০] এ খাতগুলোকে নিম্নরূপে বিন্যাস করেছেন :

১। পিণ্ডকর : সকল গ্রামের উপর ধার্য কর।

২। সেনাভক্ত : সামরিক অভিযানের সময় প্রজাদের প্রদত্ত উপহার।

৩। কর : সাময়িক খাজনা।

৪। উৎসঙ্গ : রাজোৎসবে প্রজাদের দেয় উপঢৌকন।

৫। পার্শ্ব : অতিরিক্ত কর।

Dhaka University Institutional Repository

৬। বলি : অতিরিক্ত উৎপন্ন ফসলের জন্য কর।

৭। পারিহীনিক : পোষ্য জীব-জন্তু দ্বারা শস্য বিনষ্টের জন্য এবং নানা রকম অপরাধের জন্য জরিমানার অর্থ।

৮। উপায়নিক : উপহার সামগ্রী হতে অর্জিত অর্থ।

৯। কৌষ্ঠেয়ক : রাষ্ট্র কর্তৃক নির্মিত পুষ্করণী ব্যবহারজনিত কর।

এগুলো ছাড়াও কৌটিলের অর্থশাস্ত্রে আয়ের অন্যান্য যে খাতগুলো পাওয়া যায় তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ গণিকালয়, জুয়াখেলা, পানশালা, কসাইখানা, খেয়াপারাপার, জলসেচ, বন, খনি, গুপ্তধন, পণ্য-পরিবহন, নদী-নদী, বন্দর, ব্যবসা-বাণিজ্য. পশুচারণ, জমি পরিমাপ, চৌকিদার প্রভৃতি। জানা যায় যে, বণিকগণ মুদ্রায় বা হিরণ্যে কর প্রদান করতেন। এ গ্রন্থে আরো উল্লেখ আছে যে, কোষাধ্যক্ষ, আকরাধ্যক্ষ (খনি ও ধাতুজাতীয় দ্রব্য নিয়ন্ত্রক কর্মকর্তা), সুবর্ণাধ্যক্ষ, কোষ্ঠাগারাধ্যক্ষ, পণ্যাধ্যক্ষ, শুল্কাধ্যক্ষ, সীতাধ্যক্ষ এবং সমাহর্তা (যিনি আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখেন) প্রভৃতি কর্মকর্তা আয়ের খাতগুলো হতে রাজস্ব সংগ্রহ করতেন।[৫১] কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত রাজস্ব ব্যবস্থার সঙ্গে জাতকে বর্ণিত রাজস্ব ব্যবস্থা ক্ষেত্র বিশেষে মিল পাওয়া যায়। এভাবে জনগণ হতে সংগৃহীত করের মাধ্যমে প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে রাষ্ট্রীয় খরচ নির্বাহ করা হতো।

৬. রাষ্ট্রীয় দুর্যোগ

৬.১. যুদ্ধ বিগ্রহ, রাজ্য দখল ও বিদ্রোহ

জাতক পাঠে জানা যায় যে, বর্তমানকালের মতো প্রাচীনকালেও ভারতবর্ষের রাজ্যসমূহে সময় সময় নানা রকম রাষ্ট্রীয় দুর্যোগ সৃষ্টি হতো। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল : যুদ্ধবিগ্রহ এবং বিদ্রোহ। ঐতিহাসিক আকার গ্রন্থ, বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যেও এ বিষয়ে সত্যতা পাওয়া যায়। ইতোপূর্বের (তৃতীয় অধ্যায়ের) আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, অঙ্গ, মগধ, কাশী, কোশল, বৃজ্জি, মল্ল প্রভৃতি রাজ্যের রাজাগণ একে অপরের উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করতেন। ফলস্বরূপ রাজ্যসমূহের মধ্যে প্রায়ই সময় যুদ্ধ বিগ্রহ লেগে থাকত এবং শক্তি প্রদর্শনপূর্বক এক রাজা অপর রাজার রাজ্য দখল করে নিতেন। চম্পেয্যজাতক (IV. p. 454), সোন-নন্দজাতক (Vol. V. pp. 315-317) এবং মহাজনকজাতক (Vol. VI. p. 32) সাক্ষ্য দেয় যে, অঙ্গ ও মগধের মধ্যে প্রায় সময় বিবাদ লেগে থাকত। কখনো অঙ্গরাজ মগধ দখল করতেন, আবার কখনো মগধরাজ অঙ্গ দখল করতেন। কিন্তু বুদ্ধের সমকালীন সময়ে অঙ্গ মগধের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় এবং

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গ রাজ্য আর কখনো স্বাধীনতা লাভ করতে পারেনি। ব্রহাছত্তজাতক (III. p. 115), কোসাম্বীজাতক (III. p. 486), কুণালজাতক (V. p. 417), একরাজজাতক (III. p. 13), ঘটজাতক (III. p. 169), দীঘিতিকোসল জাতক (III. p. 211-213), বড্ঢকিসূকরজাতক (II. p. 493), চূল্লহংসজাতক (V. p. 342) এবং তেসকুণজাতক (V. p. 112) প্রভৃতিতে কাশী-কোশলের যুদ্ধ এবং কাশীরাজ কর্তৃক কোশল অধিকার ও কোশলরাজকে বন্দি করার কথা জানা যায়। অপরদিকে, মহাসীলবজাতকে (I. p. 262) কাশীর রাজা মহাসীলব কোশলরাজ কর্তৃক ধৃত হয়েছিল বলে উল্লেখ আছে। অসদিসজাতকে (II. p. 86) সাতজন রাজা কর্তৃক বারাণসী অবরোধ হওয়ার কথা বর্ণিত আছে। চূল্লকালিঙ্গজাতক (III. p. 3) এবং সোননন্দজাতকে অস্‌সকরাজ কর্তৃক কলিঙ্গ দখলের বর্ণনা আছে। এছাড়া, জাতকে রাজাদের বিরুদ্ধে প্রজাগণের বিদ্রোহ ঘোষণার কথাও উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাস্‌সারোহজাতক (III. p. 8-9) সাক্ষ্য দেয় যে, সেসময় রাজারা অশ্বারোহণ করে চতুরঙ্গিণী সেনা নিয়ে বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রত্যন্ত প্রদেশে যেতেন। বড্ঢকিসূকরজাতক (II. p. 405) এবং তচ্ছসূকরজাতক (IV. p. 344) সাক্ষ্য দেয় যে, রাজা চতুরঙ্গিনী সৈন্যদল নিয়ে বিদ্রোহ-অঞ্চলের চতুর্দিকে ব্যূহ রচনা করে বিদ্রোহ দমন করতেন। ক্ষেত্র বিশেষে তাঁরা বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থ হতেন এবং পরাস্ত হয়ে প্রত্যাবর্তন করতেন।

সংকিচ্ছজাতক (V. p. 261-262) হতে জানা যায় যে, কখনো কখনো রাজপুত্রগণও রাজাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতেন এবং রাজাকে সিংহাসন চ্যুত করতেন। সঞ্জীবজাতকে (I. p. 508f) মগধরাজ বিম্বিসারের বিরুদ্ধে রাজকুমার অজাতশত্রুর বিদ্রোহের কথা বর্ণিত আছে। ভদ্দসালজাতক (IV. p. 144ff) পাঠে কোশলরাজ প্রসেনজিতের বিরুদ্ধে রাজকুমার বিড়ূঢ়বের বিদ্রোহ ঘোষণার কথা জানা যায়। আবার ধম্মদ্ধজজাতকে (II. p. 186-187) উল্লেখ আছে যে, রাজকর্মচারীরা অত্যাচারী হলে উত্তেজিত প্রজারা কোনো কোনো সময় রাজবিচারের অপেক্ষা না করে নিজেরাই প্রাণদণ্ড দিতেন। এজন্য রাজা এবং রাজকর্মচারীদেরকে সব সময় নিয়মানুগ ও সতর্ক হয়ে রাজ্য শাসন করতে হত।

৬.২. রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা এবং মারণাস্ত্রের ব্যবহার

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে আমরা জেনেছি, প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ প্রচলিত ছিল। এ কারণে রাষ্ট্রসমূহ নানা রকম সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। তন্মধ্যে অন্যতম ছিল নগর সুরক্ষা ব্যবস্থা। নগরের চারিদিকে প্রাকার বা দেয়াল, অট্টালক, নগর দ্বার প্রভৃতি নির্মাণ এবং পরিখা খননের মাধ্যমে নগরের সুরক্ষা ব্যবস্থা করা হতো। একপণ্ণজাতকে (I. p. 506) উল্লেখ আছে যে, বৈশালী নগর চারিদিকে এক

ক্রোশ অন্তর তিনটি প্রাচীর এবং অট্টালক (watach tower) দ্বারা সুরক্ষিত থাকত। যুদ্ধ চলাকালে শত্রুপক্ষ সময়ে সময়ে রাজধানী অবরুদ্ধ করে রাখত এবং প্রবেশ দ্বার বন্ধ করে নগরবাসীর ক্রোধ জন্মাত। নগরবাসীরাও সুযোগ বুঝে প্রাচীর অতিক্রম করে শত্রুপক্ষকে হঠাবার চেষ্টা করতো। এছাড়াও শত্রুপক্ষ যাতে সহজে নগরে প্রবেশ করতে না পারে সে জন্য চতুর্দিকে পরিখা খনন করা হতো।

জাতক গ্রন্থ সাক্ষ্য দেয় যে, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে শত্রুকে দমন করার জন্য যুদ্ধে মারণাস্ত্র ব্যবহার করা হতো। বৈশালীর সঙ্গে যুদ্ধে 'মহাশিলা কন্টগ' এবং 'রথমুসল' নামে দু'ধরণের যুদ্ধাস্ত্রের ব্যবহার করেছিলেন কুর্ণিয় এবং অজাতশত্রু।[৫২] মহাশিলা কন্টক ছিল গুলতি জাতীয় এক প্রকার যুদ্ধযন্ত্র, যার মাধ্যমে বড় বড় পাথর নিক্ষেপ করা হতো। রথমুসল হচ্ছে এক ধরণের রথ যা ধাতু দিয়ে বাঁধানো ছিল এবং সামনে তীক্ষ্ণ গদাবিশেষ দণ্ড আটকানো থাকত। রথটি যুদ্ধক্ষেত্রে একদিক থেকে অপরদিকে ছুটাছুটি করে শত্রুপক্ষকে আঘাত করে ঘায়েল করতো। এছাড়াও, তীর, ধনুক, ঢাল, বর্শা, গদা, ত্রিশূল, চক্র, লৌহদণ্ড, তলোয়ার, খড়গ, কুঠার, বিষধর সাপ, অগ্নি নিক্ষেপন করার বিশেষ যন্ত্র প্রভৃতিও যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

৬.৩. নির্বাসন প্রথা

পালি এবং সংস্কৃত সাহিত্য পাঠে জানা যায় যে, প্রাচীনকালে রাষ্ট্রে দুর্যোগ সৃষ্টিকারী এবং রাষ্ট্রীয় আইন অমান্যকারীদের নির্বাসনে পাঠানো হতো। রামায়ণ-মহাভারতে এরূপ বহু ঘটনা বর্ণিত আছে। জাতকেও এরূপ ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে জাতকে মূলত রাজপুত্রদের নির্বাসনের কথাই অধিক উল্লেখ পাওয়া যায়। দদ্দরজাতক (III. p. 16f) হতে জানা যায় যে, নাগরাজ শূরদর্দ্দর কনিষ্ঠ রাজপুত্র খুল্লদদ্দরের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তাঁকে বারাণসীর মলপূর্ণভূমিতে তিন বৎসরের জন্য নির্বাসন দিয়েছিলেন। বেস্সান্তরজাতক (VI. P. 480) সাক্ষ্য দেয় যে, রাজকুমার বেস্সান্তর অতিদানে রাজভাণ্ডার শূন্য করতে উদ্যত হয়েছিলেন বলে প্রজারা অসন্তুষ্ট হয়ে রাজাকে বলে তাঁকে রাজ্য হতে নির্বাসিত করিয়েছিলেন। পিতৃ-বিদ্রোহের কারণেও রাজপুত্রদের নির্বাসন দেয়া হতো। প্রাচীন ঐতিহাসিক আকর গ্রন্থ হতে জানা যায়, রাজারা গৃহশত্রুর ভয়ে সর্বদা আতংকের মধ্যে থাকতেন। রাজপুত্র এবং রানীগণ ছিলেন গৃহশত্রুর মধ্যে অন্যতম। মূসিকজাতক (III. p 216) এবং থুসজাতক (III. p. 122) হতে জানা যায় যে, রাজারা আত্মরক্ষার জন্য রাজপুত্রদের নির্বাসন দিতেন এবং কারাগারে নিক্ষেপ করতেন। চুল্লপদুমজাতক (II. p. 117f) এবং অসিতাবুজাতকে (II. p. 230) উল্লেখ আছে যে, রাজকুমার রাজাকে হত্যা করার চেষ্টা করলে

Dhaka University Institutional Repository

তিনি তাঁকে কারাগারে নির্বাসিত করেন। অসিতাভুজাতক (II. p. 230) জাতকে উল্লেখ আছে যে, বারাণসীরাজ স্বীয় পুত্র ব্রহ্মদত্ত-কুমারকে অনুচর পরিবেষ্টিত ও অস্ত্র-শস্ত্র-বেশভূষাদি সজ্জিত দেখে সন্দেহবশত তাঁকে রাজ্য হতে নির্বাসিত করেছিলেন। চূল্লপদুমজাতক (II. p. 117f) হতে জানা যায়, রাজপুত্র পদ্মকুমার ছয়জন ভ্রাতাসহ অনুচর পরিবেষ্টিত হয়ে রাজার নিকট গমন করছিলেন। তাঁদের দেখে রাজার মনে সন্দেহ জাগ্রত হল যে রাজকুমারগণ তাঁকে হত্যা করতে আসছে। তখন তিনি সাতপুত্রকে নির্বাসনে প্রেরণ করেন। পরন্তপজাতকে (III. p. 415ff) উল্লেখ আছে যে, রাজা স্বীয় পুত্র উপরাজ কর্তৃক হত্যা হওয়ার আশংকা করে তাঁকে যুদ্ধে প্রেরণের মাধ্যমে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। ভূরিদত্তজাতক (VI. p. 159) উল্লেখ আছে যে, বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত পুত্রকে উপরাজ পদে সমাসীন করলেও সিংহাসন হারাবার ভয়ে তাঁকে নির্বাসনে পাঠান। অসদিসজাতক (II. p. 88) এবং সুচ্চজাতকেও (III. p. 68f) উপরাজদের নির্বাসনের কথা উল্লেখ পাওয়া যায়।

৭. রাষ্ট্র ও নাগরিক সুবিধা

জাতক এবং বিভিন্ন পালি ও ঐতিহাসিক আকর গ্রন্থ সাক্ষ্য দেয় যে, প্রাচীনকালে জনগণের প্রদত্ত করের মাধ্যমে রাষ্ট্রের ব্যয় যেমন নির্বাহ করা হতো তেমনি রাষ্ট্রও নাগরিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানে সচেষ্ট থাকতেন। জাতকে এবং বিভিন্ন পালি গ্রন্থে রাষ্ট্র কর্তৃক নাগরিকদের মৌলিক চাহিদা পূরণে নানা বিধি-ব্যবস্থা গ্রহণের কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। এসব বিধি ব্যবস্থার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : দুর্দিনে বা দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্য সরবরাহ করার জন্য রাষ্ট্রীয় শস্যাগার নির্মাণ করে খাদ্য-দ্রব্য সংরক্ষণ; শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষায়তন নির্মাণ এবং মেধাবী শিক্ষার্থীদের বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ দান; নাগরিক স্বাস্থ্য সেবার জন্য হাসপাতাল নির্মাণ; যোগাযোগের সুবিধার্থে রাস্তা-ঘাট-সেতু নির্মাণ; ধর্মীয় উপাসনালয় নির্মাণ; পানীয় জলের সুবিধার জন্য পুষ্করণী নির্মাণ; গরীব-দুঃস্থদের জন্য দানশালা নির্মাণ; আমোদ-প্রমোদের জন্য উদ্যান নির্মাণ, যাত্রীদের বিশ্রামের জন্য বিশ্রামাগার নির্মাণ, বন্দিনিবাস নির্মাণ, বিপনী-বিতান নির্মাণ এবং জনজীবনের নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা করতেন।[৫৩] বেস্সন্তরজাতকে (VI. p. 580) রাজা ও রানী কর্তৃক দান-শালা নির্মাণ গরিবদের দান দেয়ার কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। সুমঙ্গলবিলাসিনী[৫৪] গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, বুদ্ধের সময়কালে গগ্গরা নামক রানী কর্তৃক চম্পানগরীতে এক বিশাল পুষ্করণী নির্মাণ করা হয়েছিল। অম্বজাতকে (I. p. 450) পশু-পাখীদের পানীয় জলের ব্যবস্থার জন্য ডোঙ্গা নির্মাণের

Dhaka University Institutional Repository

কথা বর্ণিত আছে। তণ্ডুলনালিজাতক (I. p. 125), মহাসুপিনজাতক (I. p. 340) এবং মহাজনকজাতক (VI. p. 32) পাঠে জানা যায় যে, নাগরিকদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুরক্ষার জন্য প্রাকার, পরিখা, তোরণ, গড় বা অট্টালক প্রভৃতি নির্মাণ করা হতো। একপণ্ণজাতকে (I. p. 504) বৈশালীর নিরাপত্তার জন্য তিনটি প্রাকার নির্মাণের কথা উল্লেখ আছে। জাতকের নিদান কথায়, বেস্সন্তরজাতক (VI. p. 485) এবং সীলবনাগজাতকে (I. p. 320) রাস্তা-ঘাট নির্মাণের কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। কুলাবকজাতকে (I. p. 199) বিশ্রামের জন্য চৌরাস্তার মাথায় বিশ্রামাগার নির্মাণে কথা বর্ণিত আছে। পালি সাহিত্যে[৫৫] উল্লেখ আছে যে, বুদ্ধের সময়কালে রাষ্ট্রীয় এবং ধণিকশ্রেণির পৃষ্ঠপোষকতায় রাজগৃহের বেলুবন বিহার, শ্রাবস্তীর জেতবন বিহার, পূর্বারাম বিহার, কোশাম্বীর কুক্কুটারাম বিহার, পাবারিকারাম, সাকেতের কালকারাম প্রভৃতি নির্মাণ হয়েছিল। মিলিন্দ প্রশ্ন[৫৬] গ্রন্থে নানা রকম বিপনি বিতান নির্মাণের বর্ণনা আছে। এভাবে প্রাচীন কালেও রাষ্ট্র কর্তৃক নানা রকম নাগরিক সুবিধা প্রদান করা হতো।

৮. উপসংহার

উপর্যুক্ত তথ্য পর্যালোচনা করে বলা যায়, গ্রাম-নগর-মহানগর-বন্দর প্রভৃতিকে ভিত্তি করে প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রীয় অবকাঠামো গড়ে ওঠেছিল। তবে অধিকাংশ রাষ্ট্রে রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল এবং রাজপদ ছিল বংশগত। অবশ্য কিছু কিছু রাষ্ট্রে গণতন্ত্র বা কুলতন্ত্রও প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার লোকের পৃথক পৃথক শ্রমদানে রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালিত হতো। জনজীবনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ছিল সুনিয়ন্ত্রিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা। বিভিন্ন শ্রেণির কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সমন্বয়ে প্রশাসনিক অবকাঠামো গঠিত ছিল, যার মাধ্যমে প্রশাসনিক ব্যবস্থা পরিচালিত হতো। এ প্রশাসনিক ব্যবস্থায় রাজা ছিলেন সর্বেসবা। জনগণের প্রদত্ত করের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ব্যয় নির্বাহ করা এবং নাগরিক সুবিধা প্রদান করা হতো। তবে রাজনৈতিক দিক থেকে গ্রামগুলো নগর অপেক্ষা কম কেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত ছিল। গ্রাম অপেক্ষা নগরের লোকেরাই অধিক নাগরিক সুবিধা ভোগ করতো।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

[১] *Vinaya Pitaka*, op. cit., vol. III., p. 46f.

[২] *ibid*, vol. III., p. 249.

[৩] *Majjhima Nikāya*, op. cit., vol. II., p. 205.

[৪] *Aṅguttara Nikāya*, op. cit., vol. II, p. 82.

[৫] *The Jātaka*, vol. I., p. 8.

[৬] *Vinaya Pitaka*, op. cit., vol. I., p. 220.

[৭] *Dīgha-Nikāya*, op.cit., vol. I, p. 227.

[৮] *Vinaya Pitaka*, op. cit., vol. II., p. 46.

[৯] পরিক্খিত্ত গামো এবং অপরিক্খিত্ত গামো।

[১০] *পালি সাহিত্যে নগরবিন্যাস ও নগরজীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।

[১১] *ধর্মপদ*, চিত্তবর্গ।

[১২] *দীঘ নিকায়*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৬.

[১৩] *Májjhima Nikāya*, op. cit., vol. III., p. 5.

[১৪] *পালি সাহিত্যে নগরবিন্যাস ও নগরজীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০।

[১৫] *Dīgha-Nikāya*, op.cit., vol. II., p. 147.

[১৬] T. W. Rhys Davids, *Dialogue of the Buddha*, P.T.S. London, 1977 (reprint), p. 161.

[১৭] *Vinaya Pitaka*, op. cit., vol. II., p. 300; *Majjhima Nikāya*, op. cit., vol. I., p. 271.

[১৮] *Dīgha-Nikāya*, op.cit., vol. II., p. 47.

[১৯] *Dīgha-Nikāya*, op.cit., vol. I., p. 51; *Majjhima Nikāya*, op. cit., vol. I., p. 77; *Aṅguttara Nikāya*, op. cit., vol. III, p. 76; *Vinaya Pitaka*, op. cit., vol. I., p. 179, Milinda Panha, 330; *The Commentary on the Dhammapada*, op. cit., vol. I., p. 184; ছবকজাতক (III., p. 30) সুলসাজাতক (III., p. 436) মহাহংসজাতক (V., p. 279)।

[২০] *Dīgha-Nikāya*, op.cit., vol. I., p. 90, vol. III., p. 208, vol. I; *Aṅguttara Nikāya*, op. cit., vol. I, p. 78; *Vinaya Pitaka*, op. cit., vol. I., p. 342, *Majjhima Nikāya*, op. cit., vol. I., p. 271; *Milindapañha*, op. cit., p. 225.

Dhaka University Institutional Repository

[২১] *দীঘ নিকায়*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২, ৩৯।

[২২] *Dīgha-Nikāya*, op.cit., vol. I., p. 111-113; *Milindapañha*, op. cit., p. 114.

[২৩] *Milindapañha*, op. cit., p. 344.

[২৪] *The Jātaka*, vol. I., p. 124.

[২৫] *Dictionary of Pali Proper Names*, op. cit., vol. I., p. 67-72.

[২৬] *Vinaya Pitaka*, op. cit., vol. I., pp. 60, 61, 119.

[২৭] *The Jātaka*, vol. I., p. 411.

[২৮] *দীঘ নিকায়*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২, ৯২-১০১।

[২৯] *Milindapañha*, op. cit., pp. 1-2, 330; *Dīgha-Nikāya*, op.cit., vol. I., p. 51.

[৩০] কেলিসীলজাতক (II, .p. 142), কুসজাতক (V., p. 285) এবং মহাসীলবজাতক (I., p. 267); *Milindapañha*, op. cit., p. 331.

[৩১] *Vinaya Pitaka*, op. cit., vol. IV., p. 285; *Saṃyutta-Nikāya*, op. cit., vol. VI, p. 309.

[৩২] *Milindapañha*, op. cit., p. 331.

[৩৩] *The Jātaka*, vol. II., p. 142.

[৩৪] *The Jātaka*, vol. VI., p. 285.

[৩৫] *Vinaya Pitaka*, op. cit., vol. I., p. 268-269.

[৩৬] *Dictionary of Pali Proper Names*, op. cit., vol. I., p. 155f.

[৩৭] ibid, p. 156.

[৩৮] F. L. Woodward (ed.), *Theragathā-aṭṭhakathā, the Commentary of Dhammapālacariya*, P.T.S. London, 1940/1959, vol. I., p. 146.

[৩৯] *Vinaya Pitaka*, op. cit., vol. I., p. 249; *Dīgha-Nikāya*, op.cit., vol. I., p. 225; *Saṃyutta-Nikāya*, op. cit., vol. II, p. 101.

[৪০] *Buddhist India*, op. cit., p. 26-27.

[৪১] আটটি কুলের আটজন প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত বিচার কমিটিকে অষ্টকুলিকা বলা হয়।

[৪২] *The Summaṅgalavilāsinī, Buddhaghosa's Commentary on the Dīgha-Nikāya*, op. cit., vol. II., p. 519.

Dhaka University Institutional Repository

[৪৩] দিলীপ কুমার বড়ুয়া, 'বজ্জি কাহিনী ও শাসন প্রণালী', *কৃষ্টি*, বুদ্ধ পূর্ণিমা সংখ্যা, ১৩৯৮ (বাংলা), পৃ. ১৭।

[৪৪] *Vinaya Pitaka*, op. cit., vol. IV., p. 226; *The Jātaka*, vol. I., pp. 267, 314.

[৪৫] শ্রী শান্তিকুসুম দাশ গুপ্ত, *বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম এবং প্রাচীন বৌদ্ধ সমাজ*, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলিকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ২০৬।

[৪৬] *Vinaya Pitaka*, op. cit., vol. II., p. 109f; *Majjhima Nikāya*, op. cit., vol. III., p. 48; *Aṅguttara Nikāya*, op. cit., vol. III, p. 300.

[৪৭] Edward Michael, Everyday Life in Early India, B. T. Batsford Ltd., London, 1968, p. 49.

[৪৮] *Vinaya Pitaka*, op. cit., vol. II., p. 131.

[৪৯] মানবেন্দু বন্দোপাধ্যায় (অনু.), *কৌটিলীয়াম অর্থশাস্ত্রম*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, ২০০২, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬১-২৬৪.

[৫০] দিলীপ কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, *ভারত ইতিহাসের সন্ধানে*, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ২০০, পৃ. ২১৭।

[৫১] *কৌটিলীয়াম অর্থশাস্ত্রম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯-৩০, ৯২-৯৪.

[৫২] *প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬।

[৫৩] *পালি সাহিত্যে নগরবিন্যাস ও নগরজীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ. ৩৮।

[৫৪] *The Summaṅgalavilāsinī, Buddhaghosa's Commentary on the Dīgha-Nikāya*, op. cit., vol. I., p.164.

[৫৫] *Dīgha-Nikāya*, op.cit., vol. II., p. 76; *Saṃyutta-Nikāya*, op. cit., vol. I, pp. 8, 27, 52; *Majjhima Nikāya*, op. cit., vol. II., p. 52; *The Jātaka*, vol. I., p. 92; *Vinaya Pitaka*, op. cit., vol. II., p. 16.

[৫৬] *Milindapañha*, op. cit., p. 333.

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

প্রাচীন ভারতের সমাজ ও সামাজিক প্রথা

১. ভূমিকা

'নারী' এবং 'পুরুষ' – এই দু'য়ের মিলনে রচিত হয় মানব সংসার। মানব সংসারের সমষ্টিগত রূপ হলো মানব সমাজ। মানব সমাজ গঠনের মূলে রয়েছে মানুষের জীবন ও জীবিকা রক্ষার প্রেরণা। এ কারণে মানুষ দলবদ্ধভাবে বসবাস করতে শুরু করলে গড়ে ওঠে মানব সমাজ। মূলত শ্রম শক্তির বিকাশ ঘটার পর প্রকৃতির উপর মানুষের প্রভুত্ব বেড়ে যায়। ফলে প্রগতির পথ খুলে যায়। মানুষ শ্রমের নিত্য নতুন ব্যবহার আয়ত্ব করে অধিকতর প্রাকৃতিক বস্তুর ব্যবহার আয়ত্বে আনতে থাকে। এরূপ শ্রম-বিকাশের মূল প্রেরণা ছিল বস্তুর অধিকতর অর্জন বা ব্যবহার। এ কাজে অধিক লোকের সহযোগিতা ও সহভোগের প্রয়োজন হয়। এতে মানুষ ঐক্যশক্তির গুরুত্ব উপলব্দি করতে পারে। এই উপলব্ধি থেকে মানুষ দলবদ্ধভাবে বসবাস করতে শুরু করলে সমাজ সৃষ্টি হয়। মানব সংসারের প্রথম যুগে নিয়ম-কানুনের অস্তিত্ব ছিল না। বন্ধনমুক্ত নর-নারী নিজের ইচ্ছেমত একত্রে বসবাস করে সংসার জীবন-যাপন করতো। কিন্তু মানব সংসার যখন সমষ্টিগতভাবে সমাজে রূপান্তরিত হলো তখন নানা রকম নিয়ম-নীতির প্রয়োজন হয়। সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য ক্রমে নানা রকম সামাজিক প্রথা বা বিধি-নিষেধ এবং ধর্মীয় রীতি-নীতি ও আচার-অনুষ্ঠান সৃষ্টি হয়। একারণে নানা দেশে নানারকম সমাজ ব্যবস্থা বা সামাজিক অবকাঠামো গড়ে ওঠে। প্রাচীন ভারতের সামাজিক রীতি-নীতিও এভাবে সৃষ্টি হয়েছিল। জাতকের আলোকে প্রাচীন ভারতের সমাজ ও সামাজিক প্রথা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করাই এ অধ্যায়ের অন্যতম উদ্দেশ্য।

২. সমাজ ব্যবস্থা

মানব সমাজ বিবর্তনশীল, পরিবর্তন তার নিয়ম। নৃবিজ্ঞানীদের মতে, মানব সমাজ কতগুলো পরিবর্তনের স্তর বা ধাপ অতিক্রম করে বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে।[১] সমাজবিজ্ঞানী এবং নৃবিজ্ঞানীদের মতে, সমাজ বিকাশের প্রথম অবস্থায় মেয়েদের প্রাধান্য ছিল বেশি। তখন মেয়েরাই সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। প্রাকৃতিক নিয়মেই সেদিনের সমাজ ব্যবস্থা ছিল মাতৃতান্ত্রিক (matriarchal)।[২] এর মূল কারণ ছিল জৈবিক (biological)। এ পথ ধরেই মাতৃতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টি হয়েছিল, যেখানে মেয়েদের কর্তৃত্ব ছিল

Dhaka University Institutional Repository

সর্বত্র। গোষ্ঠি অধিপতিও ছিলেন মেয়েরা। মানুষের জীবন ছিল প্রকৃতি নির্ভর। তখন ফলমূল সংগ্রহ এবং পশুপালন করে জীবিকা নির্বাহ করা হতো। পশুপালন স্তর হতে কৃষি ব্যবস্থা প্রচলন পর্যন্ত দীর্ঘদিন সময় মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। কৃষি ব্যবস্থা প্রচলন হওয়ার পর মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা দুর্বল হতে শুরু করে। কারণ কৃষিভিত্তিক সমাজে কঠোর শারীরিক পরিশ্রমের প্রয়োজন ছিল। গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব এবং সন্তান লালন পালনে নারীদের প্রচুর শক্তি ও সময় ব্যয় করতে হয়। এতে উৎপাদন ব্যবস্থায় মেয়েরা পিছিয়ে পড়তে শুরু করে এবং পুরুষোচিত শৌর্যবীর্যের পরিচয় দেওয়ার সুযোগও তেমন একটা থাকে না। কারণ নারীকে প্রকৃতির নিয়মে জননী হতে হয়। এতে পুরুষ শক্তিকে অধিক শক্তিশালী করার জন্য সমাজব্যবস্থাপকগণ অধিক মনোযোগী হন।[৩] কারণ সমাজবদ্ধ মানুষ উপলব্ধি করেন যে শ্রম নির্ভর সমাজে জীবন সংগ্রামে জয়ী হতে হলে যে শৌর্যবীর্যের প্রয়োজন তা প্রধানত পুরুষ শক্তির উপর নির্ভরশীল।[৪] ফলে উৎপাদনমুখী সমাজে পুরুষের প্রাধান্য সৃষ্টি হতে থাকে, যা মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পরিণত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এছাড়া, সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্পর্কিত বিষয়ও মাতৃতান্ত্রিক সমাজ বিলুপ্তিতে সহায়তা করে। কারণ কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সম্পত্তির উত্তরাধিকার বিষয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। কারণ তখন একজন স্ত্রীর একজন স্বামী বা একজন স্বামীর একজন স্ত্রী – এরূপ 'একবিবাহ (monogamy)' প্রথা না থাকায় সন্তানের কে পিতা তা বোঝার উপায় ছিল না। কিন্তু মাকে সহজেই চিহ্নিত করা যেতো। এ কারণে তখন মায়ের নামে সন্তানের পরিচয় নির্ধারণ হতো। তবে এমন মাও পাওয়া যেতো যার সন্তানের পিতা সমস্ত গোষ্ঠীতে ছড়িয়ে আছে। ফলে পিতৃপরিচয় নির্ধারণ করা ছিল কঠিন। সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হলে মাতৃতান্ত্রিক সমাজে পিতৃপরিচয় নির্ধারণ জরুরি হয়ে ওঠে। কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্নটির সমাধান আবশ্যক হয়ে ওঠে। ফলে সমাজে পিতৃ প্রাধান্য সৃষ্টি হতে থাকে, যা মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পরিণত করার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। ক্রমে পুরুষরা তাদের প্রাধান্য বৃদ্ধি করতে নানা অনুশাসন তৈরি করতে শুরু করে। এসব অনুশাসন সংস্কাররূপে নারী সমাজ মেনে নিতে বাধ্য হলে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা বিলুপ্তির পথে এগিয়ে যায় এবং পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠে। এ প্রক্রিয়াটি প্রাচীন ভারতের সমাজ ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য।[৫]

বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, কৃষিব্যবস্থা প্রচলনের যুগেই বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল।[৬] এ কারণে বৌদ্ধ সাহিত্যে তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে বহু তথ্য পাওয়া যায়, যা প্রাচীন ভারতের

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ জীবন ও রীতি-নীতি সম্পর্কে সত্যস্পর্শী ধারণা প্রদান করে। সম্ভাবজাতক (II. p. 43f) পাঠে জানা যায় যে, বুদ্ধের সময়কালে বিভিন্ন শিল্প থাকলেও জনসাধারণের প্রধান জীবিকা ছিল কৃষি এবং কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে ধান, শাক-সব্‌জি, ফল এবং বাদাম জাতীয় দ্রব্য ছিল অন্যতম। এতে বোঝা যায়, তখন সমাজ ছিল কৃষি নির্ভর। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে জাতকের আলোকে রাষ্ট্রীয় অবকাঠমো এবং জনজীবন সম্পর্কে আলোচনা করেছি। তাতে রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার যে চিত্র ফুটে ওঠেছে তা বিচার-বিশ্লেষণ করলে পিতৃতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। চূল্লপদূমজাতক (II. p. 115ff), দসরথজাতকে (IV. p. 124ff), মহপদুমজাতক (IV. p. 187ff), কুসজাতক (V. p. 278ff), দেবধম্মজাতক (I. p. 132), কট্‌ঠহারিজাতক (I. p. 134ff) এবং দসরথজাতকে (IV. p. 124ff), মুদুপাণিজাতক (II. p. 323ff), মহাজনকজাতক (VI. p. 30ff), অসিলক্‌খণজাতকে (I. p. 455ff), পাদঞ্জলীজাতক (II. p. 264f) এবং গ্রামণীচণ্ডজাতক (II. p. 297f) প্রভৃতি সাক্ষ্য দেয় যে, বুদ্ধের সমসাময়িককালে প্রাচীন ভারতে রাজপদ ছিল বংশগত এবং পুত্রগণই অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজপদে অধিষ্ঠিত হতেন। এ বিষয়টি পর্যালোচনা করে বলা যায়, বৌদ্ধধর্মের প্রচারকালে প্রাচীন ভারতে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। পালি সাহিত্য এবং জাতকের বিভিন্ন কাহিনি পর্যবেক্ষণে এ বিষয়টির সত্যতা পাওয়া যায়। সংযুক্তনিকায়ে[৭] উল্লেখ আছে যে, রাজমহিষী মল্লিকা দেবী এক কন্যা সন্তান প্রসব করেছেন শুনে কোশলরাজ প্রসেনজিত বিষাদগ্রস্থ হয়ে পড়েন। বুদ্ধ এ খবর শুণে রাজা প্রসেনজিতকে বলেন, "কন্যা সন্তানের জন্ম হেতু কারো দুঃখ করা উচিত নয়। যদি কন্যা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্না, ধর্মপ্রাণা, শ্রদ্ধাশীলা এবং কর্তব্য পরায়ণ হন তা হলে সে কন্যা সন্তান পুত্র অপেক্ষা শ্রেয়সী হওয়ার যোগ্যতা রাখে। এমন কি সেই কন্যা রত্নগর্ভাও হতে পারে। তার গর্ভজাত সন্তান ভবিষ্যতে মহৎ কার্য সম্পন্ন করতে পারে এবং সুবিশাল রাজ্যের অধিশ্বর হতে পারে।" এছাড়াও কট্‌ঠহারিজাতকে (I. p. 123f) উল্লেখ পাওয়া যায় যে, একদা বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত ফল-পুষ্পাদি আহরণের নিমিত্ত বনে গমন করেন। সেখানে তখন এক রমণী গান গাইতে গাইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করছিল। তার রূপে মুগ্ধ হয়ে বারাণসীরাজ তাকে গান্ধর্ববিধান মতে বিবাহ করেন। রমণীকে গর্ভবতী জেনে রাজা তাকে স্বনামাঙ্কিত এক অঙ্গুরী প্রদান করে বলেন, 'যদি কন্যা প্রসব কর, তবে ইহা বিক্রয় করে তার ভরণ-পোষণ করবে, আর যদি পুত্র প্রসব কর, তবে তাকে এই অঙ্গুরীসহ আমার নিকট নিয়ে আসবে।' উদ্দালকজাতক (IV. p. 298f) এবং চেতিয়জাতকেও (III. p. 455) কন্যা সন্তান সম্পর্কে এরূপ উক্তি পাওয়া যায়। চেতিয়জাতক পাঠে জানা যায় যে, মহাপুরোহিত কপিল চেতি রাজ্যের রাজা অপরচরকে মিথ্যাভাষণের জন্য কন্যা সন্তান জন্মদানের অভিসম্পাত দেন। জাতকে এরূপ কাহিনি প্রচুর পাওয়া যায়। অবদান শতকের শুক্লাবদান অধ্যায় হতে জানা যায় যে, রোহিনী নামক এক ধনী বিত্তশালী

Dhaka University Institutional Repository

শাক্য নিঃসন্তান ছিলেন। দীর্ঘদিন পর তার সহধর্মিনী এক কন্যা সন্তান প্রসব করলে তিনি প্রথমে ক্ষোভে ফেটে পড়েন, কিন্তু পড়ে কন্যার রূপে মুগ্ধ হয়ে ক্ষোভ নিবারণ করেন। এসব কাহিনি বুদ্ধের সমকালীন তথা জাতকের রচনাকালীন সময়ে ভারতে পিতৃতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল বলে প্রতীতি জন্মায়। অঙ্গুত্তর নিকায়[৮] নামক পালি গ্রন্থ সাক্ষ্য দেয় যে, সমাজে স্বামীর নামে স্ত্রীর পরিচয় হতো। এ গ্রন্থ আরো সাক্ষ্য দেয় যে, পরিবারে গৃহকর্তার স্থান সর্বোচ্ছরূপে স্বীকৃত ছিল। পতিব্রতা নারী স্বামীর সুখের জন্য ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অনায়াসেই পরিত্যাগ করতো। অঙ্গুত্তর নিকায়[৯] গ্রন্থে পুত্র সন্তান কামনার পাঁচটি কারণ উল্লেখ আছে। যথা : ১) পুত্র পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ করে ২) পুত্র অর্থকরী কর্ম করে ৩) পুত্র পিতার বংশধারা অব্যাহত রাখে ৪) পুত্র মৃত পূর্বপুরুষদের পিণ্ড দান করে এবং ৫) পুত্র পিতার ধন সম্পদের অধিকারী হয় এবং ধন-সম্পদ রক্ষা করে। এসব বিষয় পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার স্বাক্ষর বহন করে। তাছাড়া, প্রাচীন ভারতের বিবাহ প্রথা (যা পরবর্তী অনুচ্ছেদে বর্ণনা করা হবে) পর্যালোচনা করলেও বুদ্ধের সমকালীন সময়ে যে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তা ধারণা করা যায়।

৩. সামাজকি প্রথা

সমাজের সুষ্ঠু পরিচালনা এবং শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য প্রাচীন ভারতেও নানা রকম সামাজিক প্রথা প্রচলিত ছিল। পালি সাহিত্যে বিশেষত জাতকে প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ছিল এরূপ নানা রকম সামাজিক প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায়। এ অনুচ্ছেদে জাতকের তথ্যের সঙ্গে অন্যান্য পালি, সংস্কৃত এবং বিভিন্ন ঐতিহাসিক আকর গ্রন্থের তথ্যের সমন্বয় সাধনপূর্বক প্রাচীন ভারতের সমাজ জীবনে প্রভাব বিস্তারকারী প্রধান প্রধান সামাজিক প্রথাসমূহ আলোচনা করা হলো।

৩.১. পরিবার ও বিবাহ প্রথা

পরিবার হচ্ছে সমাজের মূল কেন্দ্রবিন্দু। বৈদিক ও পালি সাহিত্য সাক্ষ্য দেয় যে, প্রাচীন ভারতের পরিবার গঠনের সামাজিক ও শাস্ত্রসম্মত প্রথা ছিল বিবাহ। বৈদিক এবং পালি সাহিত্যে বিবাহ প্রথা সম্পর্কে বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। এসব তথ্য বিচার বিশ্লেষণে প্রাচীন ভারতের বিবাহ প্রথার ধরণ ও প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা করা যায়। নিম্নে প্রাচীন ভারতের প্রচলিত বিবাহ প্রথার নানা দিক তুলে ধরা হলো।

৩.১.১. বিবাহের প্রকার ভেদ

প্রাক বৌদ্ধযুগের প্রাচীন শাস্ত্রসমূহে[১০] আট রকম বিবাহের উল্লেখ পাওয়া যায়, তবে কার্যত এই সবক'টি বিবাহ রীতি প্রচলিত ছিল কিনা বলা কঠিন। আট রকম বিবাহ রীতি হচ্ছে :

১. ব্রাহ্মবিবাহ : কন্যা সম্প্রদান

২. দৈববিবাহ : পুরোহিতকে কন্যা সম্প্রদান

৩. আর্যবিবাহ : গরু কিংবা ষণ্ডের বিনিময়ে কন্যা-ক্রয়

৪. প্রজাপত্য-বিবাহ : সমচুক্তির ভিত্তিতে বিবাহ

৫. অসুর-বিবাহ : স্থিরীকৃত কন্যাপণ দিয়ে কন্যা-ক্রয়

৬. রাক্ষস-বিবাহ : অপহরণ পূর্বক বিবাহ

৭. পৈশাচ-বিবাহ : ঘুমন্ত কন্যাকে বলপূর্বক অপহরণ করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা

৮. গান্ধর্ব-বিবাহ : নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে বিবাহ।

উপর্যুক্ত আট রকম বিবাহ প্রথার মধ্যে ব্রাহ্মবিবাহ, দৈববিবাহ, আর্যবিবাহ এবং প্রজাপত্য-বিবাহ শাস্ত্রীয় বিবাহ বিধি রূপে স্মৃতিশাস্ত্রকারগণের দ্বারা প্রশংসিত এবং অপরগুলো নিন্দিত হয়েছে।[১১] পালি সাহিত্যে উপর্যুক্ত সকল প্রকার বিবাহ প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায় না, তবে পাঁচ প্রকার বিবাহ প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা :

ক) অভিভাবক কৃর্তক স্থিরকৃত বিবাহ

খ) স্বয়ম্বর বিবাহ এবং

গ) গান্ধর্ব-বিবাহ

ঘ) রাক্ষস-বিবাহ

ঙ) অসুর-বিবাহ

ক) অভিভাবক কৃর্তক স্থিরকৃত বিবাহ

প্রথম প্রকার বিবাহ প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায় উদয়জাতক, সুরুচিজাতক, সংকিচ্ছজাতক (V. p. 269) এবং সামজাতক প্রভৃতিতে। উদয়জাতক (IV. p. 112) হতে জানা যায় যে, কাশী রাজ্যের রাজকুমার উদয় বৈমাত্রেয় ভগিনী উদয়ভদ্রাকে পিতার মাতার সম্মতিতে বিবাহ করেন। সুরুচিজাতক (IV. p. 316) পাঠে জানা যায় যে, মিথিলার রাজপুত্র সুরুচিকুমার এবং বারাণসীর রাজপুত্র ব্রহ্মদত্তকুমার ছিলেন সমবয়সী। উভয়ে বিদ্যাশিক্ষার জন্য তক্ষশিলা গমন করেন। সেখানে উভয়ের মধ্যে পরম বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি হয়। বিদ্যা শিক্ষা শেষে উভয়ে যখন স্ব স্ব রাজ্যে ফিরে যাচ্ছিলেন তখন পরস্পর এরূপ প্রতিজ্ঞা করেন, "যদি আমার পুত্র ও তোমার কন্যা জন্মে, বা তোমার পুত্র এবং আমার কন্যা জন্মে, তবে আমরা তাদেরকে পরস্পর পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করাব।" পরবর্তীতে সুরুচিকুমারের এক পুত্র এবং ব্রহ্মদত্তকুমারের

Dhaka University Institutional Repository

এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। পুত্র ও কন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তাঁরা প্রতিজ্ঞা মতো তাদেরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করান। সামজাতকে (VI. p. 71) উল্লেখ আছে যে, নদীর দু'পারে দু'টি নিষাদ গ্রাম ছিল। দুই গ্রামের দুই পরিবারের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক সৃষ্টি হলে উভয়ের সম্মতিতে নিষাদপুত্র দুকুলক এবং নিষাদ কন্যা পারিকার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

প্রথম প্রকার বিবাহ প্রথার মাধ্যমে জাতি-কুল ও বংশ রক্ষা করা হতো। পিতা-মাতা বা অভিভাবকগণ সমপর্যায়ের জাতি, বর্ণ, কুল এবং বংশ ও সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন পরিবার থেকে নিজ নিজ পুত্র কন্যার জন্য পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতেন। বৈদিক সাহিত্যে বর্ণিত প্রজাপত্য বিবাহ প্রথার সঙ্গে এর মিল রয়েছে। এ বিবাহ প্রথা তৎকালীন সমাজে বিশেষভাবে প্রশংসিত ছিল। কারণ এ প্রথায় কন্যাকে দান করা হতো। এক্ষেত্রে দান ছিল মুখ্য, বিবাহ অনুষ্ঠান ছিল গৌণ। পিতা পছন্দীয় পাত্র নির্বাচন করে বিবাহ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পাত্রের হস্তে কন্যা দান করতেন। এক্ষেত্রে কন্যারা পিতা কর্তৃক নির্বাচিত পুরুষকে স্বামীরূপে গ্রহণ করে পিতারূপ প্রভুর অধীনতা থেকে স্বামী রূপ প্রভুর অধীনতায় জীবন-যাপনের উদ্দেশ্যে পতিগৃহে যাত্রা করতেন।[১২]

খ) স্বয়ম্বর বিবাহ

নিজের পছন্দ মতো বর বা পতি নির্বাচনপূর্বক বিবাহ করাকে স্বয়ম্বর বিবাহ বলে। এ প্রথা মতে, সাধারণত কন্যার ইচ্ছা মতো বর নির্বাচন করার জন্য এক সভার আয়োজন করা হতো, যা 'স্বয়ম্বর সভা' নামে পরিচিত ছিল। উক্ত সভায় পাণিপ্রার্থীগণ উপস্থিত হতেন। উপস্থিত পাণিপ্রার্থীদের থেকে কন্যা নিজের পছন্দ অনুযায়ী পাত্র পছন্দ করে বিবাহ করতেন। এরূপ বিবাহ প্রথা কুণালজাক, কুলাবকজাতক, নচ্চজাতক প্রভৃতিতে উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাক বৌদ্ধযুগেও এ প্রথা প্রচলিত ছিল। কুণালজাতকে (V. p. 426f) উল্লেখ আছে যে, একদা কাশীর রাজকুমারী কৃষ্ণা বা কণ্হার বিবাহের জন্য এক স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় অন্যান্য পাণিপ্রার্থীর সঙ্গে পাণ্ডুরাজবংশীয় রাজকুমার পঞ্চপাণ্ডবও উপস্থিত হন। রাজকুমারী সভায় আগত পাণি প্রার্থীদের মধ্যে কাউকেও পছন্দ করেন নি। তবে পঞ্চপাণ্ডবদের দেখে তিনি অতীব মুগ্ধ হন এবং তাঁদের প্রতি তাঁর কামানুরাগ জন্মে। ফলে তিনি একই সঙ্গে উক্ত পাঁচজনকে পতিরূপে গ্রহণ করেন। কুলাবকজাতকে (I. p. 205-206) উল্লেখ আছে যে, একদা অসূররাজ বেপচিত্ত তাঁর কন্যা সুজাতার জন্য উপযুক্ত পাত্র নির্বাচনের উদ্দেশ্যে এক স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করেন। সুজাতা সেই সভায় একজনকে পতিরূপে নির্বাচন করে তাঁর গলায় বরমাল্য অর্পণ করেন। কিন্তু নচ্চজাতক (I. p. 207) পাঠে একথাও জানা যায় যে, স্বয়ম্বর সভায় কন্যার পছন্দের পাত্রকে যদি কোনো কারণে পিতা

Dhaka University Institutional Repository

অপছন্দ করতেন, তবে তিনি পাত্রটির সঙ্গে কন্যার বিবাহ না দিয়ে কন্যার মতামত অগ্রাহ্য করে নিজের পছন্দ করা পাত্রের সঙ্গে বিবাহ দিতেন।

গ) গান্ধর্ব-বিবাহ

নারী-পুরুষ উভয়ের সম্মতিতে যে বিবাহ হতো তা গান্ধর্ব-বিবাহ নামে পরিচিত। এ বিবাহ প্রথায় মাতা-পিতা বা অভিভাবকগণের সম্মতি ব্যতীত বা অজ্ঞাতসারে এবং কোনো প্রকার শাস্ত্রীয় ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে প্রণয়ীযুগল পারস্পরিক প্রণয়বশে পরস্পর পরস্পরকে গলায় মালা অর্পন করে বিবাহ কার্য সম্পাদন করতেন। চূল্লসেট্‌ঠিজাতক, কট্‌ঠাহারিজাতক, খন্তিবণ্ণনজাতক (II. p. 207) এবং পরমত্থদীপনী,[১৩] ধম্মপদট্‌ঠকথায় গান্ধর্ব-বিবাহের উল্লেখ পাওয়া যায়। চূল্লসেট্‌ঠিজাতকে (I. 120) উল্লেখ আছে যে, রাজগৃহের এক বিত্তশালী শ্রেষ্ঠী কন্যা গৃহের এক দাসের প্রণয়াসক্ত হন। প্রণয়ের কথা প্রকাশ পেলে নির্যাতন ভোগ করতে হবে এরূপ ভেবে শ্রেষ্ঠী কন্যা পালিয়ে গিয়ে দাসকে গান্ধর্ব প্রথায় বিবাহ করেন। কট্‌ঠাহারিজাতকে (I. p. 134f) উল্লেখ আছে যে, বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত বনে কাষ্ঠ আহরণরত এক কুমারীর রূপ-সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে গান্ধর্ব প্রথায় বিবাহ করেন। ধম্মপদট্‌ঠকথায়[১৪] গান্ধর্ব-বিবাহের অপর একটি নিদর্শন পাওয়া যায়। এ গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, উজ্জয়িনীর রাজা চণ্ডোপ্রদ্যোতের কন্যা বাসুলদত্তা ও কোশাম্বীরাজ উদয়ন ঘটনাচক্রে পরস্পরের প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়ে পড়েন। ফলে বাসুলদত্তা গোপনে উদয়নের সঙ্গে পালিয়ে যান।

ঘ) রাক্ষস বিবাহ

মূলত কন্যার আত্মীয়স্বজনকে বিনাশ করে, যুদ্ধে পরাজিত করে বা বলপূর্বক অপহরণ করে বিবাহ করাকে রাক্ষস-বিবাহ বলে। এরূপ বিবাহের উল্লেখ কতিপয় জাতকে পাওয়া যায়। তক্কজাতকে (I. p. 296f) উল্লেখ আছে যে, এক দস্যু এক তক্র (দধিজাতীয় দ্রব্য) বিক্রেতার স্ত্রীকে জোরপূর্বক ধরে দিয়ে যায় এবং তার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিবাহ করে। অসাতরূপজাতক (I. p. 409) পাঠে জানা যায় যে, কোশলরাজ প্রসেনজিত বারাণসীর রাজাকে পরাজিত করে তাঁর রাজ্য দখল করেন এবং বারাণসীরাজের অগ্রমহিষীকে স্বীয় প্রধানমহিষীরূপে গ্রহণ করেন।

ঙ) অসুর-বিবাহ

স্থিরকৃত কন্যাপণ দিয়ে বিবাহ করার রীতিকে অসুর বিবাহ বলে। পালি সাহিত্যে অসুর বিবাহের কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। মিলিন্দ প্রশ্ন[১৫] গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, এক ব্যক্তি বিবাহ করার নিমিত্ত অগ্রিম অর্থ দিয়ে একটি ছোট বালিকাকে নির্বাচন করে চলে যান। বালিকাটি বয়োপ্রাপ্ত হলে পাত্রীপক্ষকে পণ দিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

অপর এক ব্যক্তি ঐ মেয়েকে বিবাহ করে। এছাড়া, পলায়িজাতক (II. p. 217), উদয়জাতক (IV. p. 105), সংকিচ্ছজাতক (V. p. 263) প্রভৃতিতে পণ দিয়ে বিবাহ তথা অসুর বিবাহের উল্লেখ পাওয়া যায়।

উল্লেখ্য যে, গান্ধর্ব-বিবাহ মূলত কামাসক্ত নর-নারীর মিলন মাত্র। রাক্ষস-বিবাহ জোরপূর্বক ইচ্ছার বিরুদ্ধে নারীকে বিবাহে বাধ্য করা হয়। অসুর বিবাহ পণ দিয়ে নারীকে বিবাহে বাধ্য করা হয়। এ কারণে শাস্ত্রকারগণ এসব বিবাহের নিন্দা করেছেন। তৎসত্ত্বেও এরূপ বিবাহ প্রথা সমাজ স্বীকৃত ছিল।[১৬]

৩.১.২. বিবাহের বয়স

পালি সাহিত্যে মেয়েদের বিয়ের বয়স সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই। তবে বিক্ষিপ্ত কিছু তথ্য পাওয়া যায় যা বুদ্ধের সমকালীন সময়ে নারীদের বিবাহের বয়স নির্ধারণে সহায়ক ভূমিকা রাখে। কিন্তু পুরুষের বিবাহের নির্দিষ্ট কোনো সীমারেখা সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায় না। চূল্লসেট্‌ঠিজাতক (I. p. 121), পণ্ণিকজাতক (I. p. 412), অসিলক্‌খনজাতক (I. p. 456f), সেগ্‌গুজাতক (II. p. 180), মুদুপাণিজাতক (II. p. 324f) প্রভৃতিতে উল্লেখ আছে যে, মেয়েরা যৌবনোদয় পর্যন্ত পিতৃগহে অবস্থান করতেন। কুম্মাসপিণ্ডজাতক (III. p. 407) হতে জানা যায় যে, কোশলরাজ প্রসেনজিত ষোল বছর বয়সী মালাকার কন্যা মল্লিকার প্রণয়াসক্ত হয়ে তাকে বিবাহ করেন। ভদ্দসালজাতকে (IV. p. 153) বর্ণিত আছে যে, কোশলরাজ প্রসেনজিত মহানাম শাক্যের কন্যা বাসবক্ষত্রিয়কে ষোল বছর বয়সে বিবাহ করেন। ধম্মপদট্‌ঠকথা (বিসাখাবত্থু) হতে জানা যায় যে, মিগার-শ্রেষ্ঠীর কন্যা বিশাখা ষোল বছর পর্যন্ত পিতৃগৃহে ছিলেন। ভদ্রাকুণ্ডলকেশী, ইসিদাসী, পটাচারা প্রমুখ নারীগণ ষোল বছর বয়সে বিবাহ করেন। সেলা, সুমেধা প্রমুখ নারী বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত পিতৃগৃহে কুমারী কন্যারূপে অবস্থান করেন বলে জানা যায়।[১৭] তবে জাতকে বালিকা বিবাহের কথাও উল্লেখ পাওয়া যায়। কণ্‌হদীপায়নজাতক এবং অঙ্গুত্তর নিকায়েও[১৮] বালিকা বিবাহের কথা পাওয়া যায়। কণ্‌হদীপায়নজাতকে (IV. p. 28f) উল্লেখ আছে যে, মাণ্ডব্যের স্ত্রী জ্ঞানোদয়ের পূর্বেই শ্বশুরালয়ে এসেছিল। অঙ্গুত্তর নিকায়ে উল্লেখ আছে যে, নকুলপিতা নকুল মাতাকে বালিকা বয়সে বিবাহ করেছিলেন। ফলে ধারণা করা যায় যে, বৌদ্ধযুগে বাল্যবিবাহও প্রচলিত ছিল। রামায়ণে (বালকাণ্ড, ২০) রাম ষোল বছরের কিছু কম বয়সে দ্বাদশবর্ষীয়া সীতাকে বিবাহ করেন বলে উল্লেখ আছে। দ্বাদশ বর্ষীয়া হলেও সীতার তখন যৌবনের উন্মেষ ঘটেছিল (স্তনৌ চাবিরলৌ পীনৌ মগ্নচুচুকৌ)। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে নারীর দ্বাদশ হতে ষোল বছর বয়সে কন্যা দানের বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় পুরুষরা সাধারণত ষোলো বছরের অধিক বয়সে বিবাহ করতেন। কারণ, সামাজিক রীতি অনুসারে ষোল বছর পর্যন্ত তাঁদের বেদ অধ্যয়ন করতে হতো এবং বেদ অধ্যয়ন সমাপ্ত না হলে বিবাহ করতে পারতেন না।

Dhaka University Institutional Repository

এসব আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সাধারণত নারীরা দ্বাদশ থেকে ষোল বছর বয়সে এবং পুরুষরা ষোল থেকে ততোধিক বছর বয়সে বিবাহ করতেন।

৩.১.৩. পাত্র নির্বাচন

জাতক পাঠে জানা যায় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে পিতা-মাতা পাত্র পছন্দ করে কন্যার বিয়ে দিতেন। পাত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট, শিল্পগুণ এবং নানা গুণাবলী বিচার করে সুপাত্র নির্বাচন করতেন। সাধুসীলজাতকে (II. p. 137) উল্লেখ আছে যে, রাজগৃহের এক ব্রাহ্মণের চারজন বিবাহ উপযুক্ত কন্যা ছিল। তাঁদের বিবাহ করার জন্য চারজন বিবাহার্থী উপস্থিত হন। এদের মধ্যে শীলবান এবং সচ্চরিত্র ব্যক্তিকে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত পাত্র মনে করে ব্রাহ্মণ ঐ পাত্রকে চারকন্যা সম্প্রদান করেন। অনুরূপভাবে সূচিজাতকে (III. p. 283) বর্ণিত আছে, কাশীরাজ্যের একটি গ্রামের এক প্রধান কর্মকারের এক পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল। ঐ গ্রামের এক দরিদ্র কর্মকার পুত্র সূচীশিল্পে নৈপুন্য অর্জন করেন। তাঁর শিল্প নৈপুণ্য পর্যবেক্ষণ করে প্রধান কর্মকার তার হাতে কন্যা সম্প্রদান করেন। বুদ্ধচরিত এবং ললিতবিস্তর গ্রন্থেও এরূপ পাত্র নির্বাচন পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায়। গ্রন্থদ্বয়ে উল্লেখ আছে, বিবাহের পূর্বে রাজকুমার সিদ্ধার্থকে পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। পরীক্ষাকালীন সিদ্ধার্থ গৌতমের অসাধারণ শিল্পনৈপুন্যের পরিচয় পেয়ে দণ্ডপাণি শাক্য কন্যা গোপা দেবীকে তাঁর হাতে অর্পণ করেন।[১৯]

৩.১.৪. সতীত্ব রক্ষা

বিবাহের পূর্বে নারীদের চারিত্রিক সূচিতা ও সতীত্ব রক্ষা ভারতীয় সমাজের আদর্শিক প্রথা। যৌবনে পদার্পণ করলে মাতা-পিতা, পারিবারিক সদস্যবৃন্দ, আত্মীয়স্বজন তথা অভিভাবকগণ কন্যার ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। ধম্মপদট্ঠকথা[২০] হতে জানা যায় যে, রাজগৃহের এক শ্রেষ্ঠীকন্যা কুণ্ডলকেসী ১৬ বছর পর্যন্ত অবিবাহিত ছিলেন। এ বয়সে মেয়েরা পুরুষসঙ্গ লাভের জন্য উদগ্রীব থাকে। এ কারণে তাঁর উপর সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখা হতো। পণ্নিকজাতক (I. p. 412) এবং সেগ্গুজাতকে (II. p. 180) পাত্রস্থ করবার পূর্বে কন্যারা কুমারীধর্ম পালন করছে কিনা সে বিষয়ে খোঁজ খবর রাখা হতো বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।

৩.১.৫. বহুবিবাহ

একজন মাত্র স্ত্রী গ্রহণই প্রাচীন ভারতীয় সমাজের সাধারণ প্রথা ছিল। তবে রাজকুল, সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, শ্রেষ্ঠী এবং অভিজাত সম্প্রদায় সমাজে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল বলে পালি সাহিত্যে বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। রাজাদের বহু পত্নী থাকা গৌরবের ছিল। অনেক সময় রাজারা বিবাহের ক্ষেত্রে কুল, বংশ প্রভৃতিও অগ্রাহ্য করতেন। জাতক এবং বিভিন্ন পালি গ্রন্থে কোশলরাজ প্রসেনজিতের বহু স্ত্রীর নামোল্লেখ

Dhaka University Institutional Repository

পাওয়া যায়, যেখানে নিম্নবর্ণের নারীও বর্তমান ছিল। যেমন, মল্লিকা ছিলেন মালাকার কন্যা, বাসবখত্তিয়া ছিলেন দাসী কন্যা, উদ্বিরী ছিলেন শ্রাবস্তীর ধনীর কন্যা। মজ্ঝিম নিকায়ে[২১] তাঁর সোমা এবং সকুলা নামক আরো দুই স্ত্রীর উল্লেখ পাওয়া যায়। কট্ঠাহারিজাতক (I. p. 134ff), সুজাতাজাতক (III. p. 21) বাহিয়জাতক (I. p. 421) প্রভৃতিতে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের বহু বিবাহের উল্লেখ আছে। অনুরূপভাবে বৎসরাজ উদয়নেরও বহু বিবাহের উল্লেখ পাওয়া যায়। জানা যায় যে, অবন্তীরাজ চণ্ডোপ্রদ্যোতের কন্যা বাসুলদত্তা, কুরুরাজে কন্যা মাগন্দিয়া, শ্রেষ্ঠী ঘোষকের পালিত কন্যা শামাবতী, দরিদ্র বণিকের কন্যা গোপাল মাতা, মগধরাজ দর্শকের ভগিনী পদ্মাবদী, অঙ্গরাজ দৃঢ়বর্মনের কন্যা আরণ্যক প্রমুখ তাঁর স্ত্রী ছিলেন। কুণালজাতক (I. p. 205-206) কাশীর রাজকুমারী কৃষ্ণার সঙ্গে পঞ্চপাণ্ডবের বিবাহ বহু বিবাহ প্রথা প্রচলন থাকার সাক্ষ্য দেয়। ধম্মপদট্ঠকথায়[২২] চূল্লকাল, মজ্ঝিমকাল এবং মহাকাল নামক অবস্থাপন্ন শ্রেষ্ঠী ভ্রাতাত্রয়ের একাধিক পত্নীর উল্লেখ আছে। বিনয়পিটকে[২৩] দুর্বল আর্থিক অবস্থা সম্পন্ন এক ব্যক্তির দু'জন স্ত্রীর উল্লেখ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে একজন ছিল বন্ধ্যা। পেতবত্থু গ্রন্থে[২৪] বংশ রক্ষার্থে বন্ধ্যা স্ত্রী স্বামীকে অনুপ্রেরণা দিয়ে এবং অনুরোধ করে দ্বিতীয় বিবাহ করানোর কথা উল্লেখ আছে। ধম্মপদট্ঠকথার[২৫] কালিযক্ষিণীবত্থু অনুচ্ছেদে এক তন্তুবায়ের কথা উল্লেখ আছে যিনি স্ত্রীর দর্প চূর্ণ করার অভিপ্রায়ে দ্বিতীয় বিবাহ করেন। বব্বুজাতকে (I. p. 478f) উল্লেখ আছে যে, বারাণসীর এক গৃহস্থের স্ত্রী বাপের বাড়ী গিয়ে আসতে দেরী হওয়ায় ক্রোধবশত তার স্বামী দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করে। রুহকজাতকে (II. p. 113f) বারাণসীরাজের পুরোহিত রুহক ব্যাভিচারিণী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে দ্বিতীয় স্ত্রী গৃহে আনেন।

৩.১.৬. বিধবা বিবাহ

জাতক পাঠে জানা যায় যে, প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে বিধবা বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। অসাতরূপজাতক (I. p. 409) উল্লেখ আছে যে, কোশলরাজ বারাণসীরাজকে হত্যা করে তাঁর অগ্রমহিষীকে নিজের অগ্রমহিষীরূপে গ্রহণ করেন। কুণালজাতকেও এক রাজা অন্য রাজাকে হত্যা করে বিধবা এবং গর্ভবতী রানীকে নিজের মহিষীরূপে গ্রহণের কথা বর্ণিত আছে। নন্দজাতকে (I. p. 225) বর্ণিত কাহিনিও বিধবা বিবাহ প্রথা প্রচলন থাকার ইঙ্গিত বহন করে। এ জাতকে উল্লেখ আছে, বারাণসীর এক ধনী বৃদ্ধের এক তরুণী ভার্যা ছিল। বৃদ্ধ দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে চিন্তা করতে লাগলেন, "আমার স্ত্রী যুবতী, আমার মৃত্যু হলে সে অন্য পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে। তখন আমার পুত্রগণ ধনসম্পদ হতে বঞ্চিত হবে।" উচ্ছঙ্গজাতকের (I. p. 307) কাহিনীও বৈধব্য বিবাহের সাক্ষ্য বহন করে। এ জাতকে বর্ণিত আছে, একদা নিম্নস্তরের রমণীর স্বামী, পুত্র এবং ভ্রাতাকে ভুলক্রমে দণ্ড প্রদান করা হয়। রমণী তিনজনের মুক্তি দাবী

Dhaka University Institutional Repository

করলে রাজা তিনজনের মধ্যে যে কোনো একজনকে মুক্তি দিতে সম্মত হন। তখন রমণী ভ্রাতার মুক্তি দাবী করেন। রাজা এর কারণ জানতে চাইলে রমণী বলেন, পুত্র ও স্বামী সহজে পাওয়া যায়, কিন্তু ভ্রাতা দুর্লভ। রাজা রমণীর উত্তরে সন্তুষ্ট হয়ে তিনজনকেই মুক্তি দান করেন। পালি সাহিত্যে বৈধব্য জীবনের কষ্টকর অবস্থার উল্লেখ পাওয়া যায়। মিলিন্দ প্রশ্ন গ্রন্থে দশ প্রকার অবহেলিত লোকের বর্ণনা পাওয়া যায়। তন্মধ্যে বিধবা রমণীকে প্রথমে স্থান দেওয়া হয়েছে। অন্যান্যরা হলো : দুর্বল পুরুষ, জ্ঞাতিমিত্রহীন ব্যক্তি, পেটুক, গুরুহীন কুলোদ্ভব ব্যক্তি, কুসঙ্গীযুক্ত ব্যক্তি, ধনহীন ব্যক্তি, সদাচারহীন ব্যক্তি, নিষ্কর্মা ব্যক্তি, এবং উদ্যোগহীন ব্যক্তি। বেস্সন্তরজাতকের (VI. p. 521ff) গাথাসমূহে বৈধব্য রমণীর দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণায় জর্জরিত জীবনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। নিম্নে ঈশানচন্দ্র ঘোষ[২৬] কর্তৃক কৃত গাথাসমূহের বঙ্গানুবাদ তুলে ধরা হলো :

১। কত কষ্ট পায়, হায়, বিধবা যে নারী
করিতে তাহাকে হয় বার বার স্নান,
অগ্নিপরিচর্যা আর, ত্রিসন্ধ্যা প্রত্যহ।
এহেতু, হে রথিবর, যাব আমি বনে।

২। কত কষ্ট পায়, হায়, বিধবা যে নারী।
উচ্ছিষ্ট খাইতে তার যোগ্য যেই হয়
সেও চেষ্টা করে তারে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে,
হইতে নিজের সঙ্গে ব্যভিচারে রতা।
এহেতু, হে রথিবর, যাব আমি বনে।

৩। কত কষ্ট পায়, হায়, বিধবা যে নারী।
পরপুরুষেরা তারে তুলে চুল ধরে;
মাটিতে ফেলিয়া দেয়, এত দুঃখ দিয়া
তাহাকে নিঃশঙ্ক, মনে দেখে দাঁড়াইয়া।
এহেতু, হে রথিবর, যাব আমি বনে।

৪। কত কষ্ট পায়, হায়, বিধবা যে নারী।
সুন্দরী বিধবা কোন পাইলে দেখিতে
দিয়া তারে ধন কিছু ভাবে লোকে মনে,

হইয়াছি আমি এর প্রণয়ভাজন!
নাই তার ইচ্ছা, তবু করে জ্বালাতন,
পেচকে বায়সগণ করে যে প্রকার।
এহেতু, হে রথিবর, যাব আমি বনে।
৫। কত কষ্ট পায়, হায়, বিধবা যে নারী।
থাকে যদি জ্ঞাতিকুলে ঐশ্বর্য অপার,
সুবর্ণরজত পাত্রে গৃহ আভাময়,
তথাপি সোদর, সখী, সকলেই তারে
সতত গঞ্জনা দেয় বিধবা বলিয়া,
এহেতু, হে রথিবর, যাব আমি বনে।
৬। নগ্না জলহীনা নদী, নগ্ন সেই দেশ
শাসন করিতে যেথা নাই কোনো রাজা;
থাকে যদি বিধবার ভ্রাতা দশজন,
তবু সে অনাথা, নগ্না ! সহায়বিহীনা।
অহো কি বা দুর্বিষহ বৈধব্য যন্ত্রণা।
এহেতু, হে রথিবর, যাব আমি বনে।

উপর্যুক্ত বিষয় পর্যালোচনা করে বলা যায়, বৈধব্য জীবন ছিল দুঃসহ যন্ত্রাদায়ক এবং বিধবা বিবাহ প্রচলিত থাকলেও তা সচরাচর এবং সহজ ছিল না।

৩.১.৭. পণ ও যৌতুক

পালি সাহিত্যে বরপণ নেওয়ার কথা উল্লেখ না থাকলেও কনেপণের কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। জাতক,[২৭] মিলিন্দ প্রশ্ন[২৮] এবং থেরীগাথায়[২৯] কন্যাপণের উল্লেখ পাওয়া যায়। এতে উল্লেখ আছে যে, বিশেষত সম্ভ্রান্ত বংশীয় কন্যার বিবাহের সময় মহার্ঘবস্ত্র ও নানাবিধ বস্তু যৌতুক হিসেবে প্রদান করতেন। বেস্‌সন্তরজাতকে (VI. p. 480) উল্লেখ আছে যে, একদা বন্ধুমতী নগরের রাজার দু'কন্যাকে বিবাহ করার জন্য এক রাজা চন্দনসার এবং লক্ষমুদ্রা মূল্যে স্বর্ণমালা প্রেরণ করেন। ধম্মপদট্‌ঠকথা[৩০] হতে জানা যায় যে, কন্যার বিবাহের সময় পিতা-মাতা সাধ্যমত বস্ত্র অলংকার যৌতুক হিসেবে কন্যাকে প্রদান করতেন।

Dhaka University Institutional Repository

বিশাখার বিবাহের সময় পিতা ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী যৌতুক হিসেবে পাঁচশত ঘোড়ার গাড়ী পূর্ণ মুদ্রা, পাঁচশত ঘড়া স্বর্ণ, পাঁচশত ঘড়া রৌপ্য, ব্রোঞ্জ, বিভিন্ন রকম সিল্কের কাপড়, ঘি, চাল, খই, কুলা, লাঙ্গল, বলদ, চাষের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, ষাট হাজার ষাড় এবং ষাট হাজার দুগ্ধবতী গুরু, ঘোড়ার গাড়ী এবং তিনজন দাসী দাস যৌতুক হিসেবে প্রদান করেন বলে জানা যায়। এ গ্রন্থে আরো উল্লেখ আছে যে, ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী একশত গ্রাম থেকে একশত প্রকার উপঢৌকন আদায় করে বিবাহের সময় কন্যাকে প্রদান করেন। হরিতমাতজাতকে (II. p. 237) উল্লেখ আছে, কোশলরাজ প্রসেনজিত ভগ্নি কোশলাদেবীকে রাজা বিম্বিসারের নিকট বিবাহ দেওয়ার সময় কাশি রাজ্য যৌতুক হিসেবে উপঢৌকন প্রদান করেছিলেন। ফলে বৌদ্ধযুগে পণ প্রথা প্রচলিত ছিল বলে ধারণা করা যায়। তবে বুদ্ধ কন্যাপণ প্রথা নিন্দনীয় হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

৩.১.৮. অন্যান্য বিধি নিষেধ

বর্তমানকালের মতো প্রাচীনকালে বিবাহের ক্ষেত্রে নানা বিধি নিষেধ প্রচলিত ছিল। স্বজাতি, কুল এবং বংশ হতে বিবাহ করা ছিল সামাজিক ও শাস্ত্রসঙ্গত রীতি। জাতক সাক্ষ্য দেয় যে, তখন সবর্ণের সঙ্গে অসবর্ণের বিবাহ অনুৎসাহিত করা হতো। অননুসোচিয়জাতকে (III. p. 93) উল্লেখ আছে যে, বারাণসীর এক ব্রাহ্মণ তাঁর পুত্রের জন্য সবর্ণের পাত্রী খুঁজে না পেয়ে সমগ্র জম্বুদ্বীপ অনুসন্ধান করেন এবং অবশেষে সবর্ণের পাত্রীর সন্ধান পাওয়ার পর তার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দেন। ভদ্দসালজাতক (IV. p. 153) সাক্ষ্য দেয় যে, শাক্যগণ স্বগোত্রীয় ব্যতীত বিবাহ করতেন না। তবে এ প্রথার ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করা যায়, যা 'বহু বিবাহ' অনুচ্ছেদে কিছুটা বর্ণনা করা হয়েছে। থেরীগাথার অট্ঠকথায়[৩১] উল্লেখ আছে যে, বঙ্কহার প্রদেশের শিকারীদের দলনেতার কন্যা চাপা উপক নামক এক আজীবিককে বিবাহ করেন। ধম্মপদট্ঠকথায়[৩২] রাজগৃহের এক শ্রেষ্ঠীপুত্র দড়াবাজির খেলায় পারদর্শী এক নারীকে বিবাহ করার কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। কটাহকজাতকে (I. p. 452) এক দাসী পুত্রের বারাণসীর শ্রেষ্ঠী কন্যাকে বিবাহের কথা বর্ণিত আছে। মহাউম্মাগ্গজাতক (VI. p. 330f) পাঠে জানা যায় যে, বাসুদেব চণ্ডাল কন্যা জাম্ববতীকে অগ্রমহিষীপদে অধিষ্ঠিত করেন। সহোদর ভাই-বোনের বিবাহ সামাজিক ও শাস্ত্রমতে নিষিদ্ধ থাকলেও পালি সাহিত্যে বৈমাত্রেয়ভ্রাতা এবং রক্ত-সম্পর্কীয় কাছের আত্মীয়ের সঙ্গে বিবাহের কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। উদয়জাতকে (৪৫৮) কাশীরাজের পুত্র উদয় বৈমাত্রেয় ভগিনী উদয়ভদ্রাকে বিবাহের কথা বর্ণিত আছে। বর্দ্ধকসূকরজাতক (২৮৩), তক্কসূকরজাতক (৪৯২) প্রভৃতি মতে, মগধরাজ অজাতশত্রু

Dhaka University Institutional Repository

মাতুলকন্যা ব্রহ্মাদেবীকে বিবাহ করেন। বেস্‌সন্তরজাতক (৫৪৭) মতে, বেস্‌সান্তর মাতুল কন্যা মাদ্রীকে বিবাহ করেন। অসিলক্‌খনজাতকে (১২৬) এবং মুদুপাণিজাতকে (২৬২) রাজারা ভাগিনার সঙ্গে রাজকন্যা বিবাহ দিতেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।

পালি সাহিত্যে বিবাহ বিচ্ছেদের কথা উল্লেখ থাকলেও বিধি-বিধান সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায় না। থেরীগাথা[৩৩] গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, ইসিদাসীর দু'বার বিবাহ হয়েছিল। কিন্তু দু'বারই তিনি স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা হন। প্রথমবার স্বামী তাঁর উপর বিরক্ত হয়ে তাঁকে গৃহ থেকে বহিষ্কৃত করেন। দ্বিতীয়বার তিনি স্বামীর মনোরঞ্জনে ব্যর্থ হওয়ায় পরিত্যাক্তা হন। রুহকজাতকে (১৯১) উল্লেখ আছে, রুহক নামক এক রাজপুরোহিত স্ত্রীর কারণে রাজসভায় উপহাসের পাত্র হওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে স্ত্রীকে গৃহ থেকে বের করে দেন। পালি সাহিত্যে সতীদাহ কথা উল্লেখ না থাকলেও মহাকবি অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত গ্রন্থে এ প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায়। ফলে বুদ্ধচরিত গ্রন্থ রচনার সময় বা তৎপূর্বে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল বলে ধারণা করা যায়।

৩.১.৯. বিবাহের দিনক্ষণ বা উৎসব

সাধারণত অভিভাবক কর্তৃক স্থিরকৃত বিবাহে কন্যার গৃহে বিবাহ সম্পন্ন হতো। বিবাহের পূর্বে পাত্র-পাত্রীর অভিভাবকগণ মিলিত হয়ে বিবাহের জন্য একটি শুভ দিন ধার্য করতেন। নির্দিষ্ট দিনে বরসহ বর-যাত্রিগণ কন্যার অভিভাবকের গৃহে উপস্থিত হতেন। কন্যাপক্ষ পরম যত্নসহকারে পুষ্প ও সুগন্ধিদ্রব্য দিয়ে তাঁদের আহ্বান জানাতেন এবং উত্তম খাদ্য-দ্রব্যে আপ্যায়িত করতেন। তবে বিবাহ উৎসবে উদ্‌যাপিত আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে পালি সাহিত্যে তেমন একটা উল্লেখ পাওয়া যায় না। ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর কন্যা বিশাখার বিবাহ অতি উৎসব সহকারে উদ্‌যাপিত হয়েছিল বলে ধম্মপদট্ঠকথায় বর্ণিত আছে। বীণাথুণজাতক (II. p. 225) মতে, বুদ্ধের অনুসারীগণ কন্যার বিবাহের সময় বুদ্ধ এবং তাঁর শিষ্যদের আমন্ত্রণ পূর্বক উত্তম খাদ্য ও পানীয়ে আপ্যায়িত করতেন। ভোজনান্তে ভিক্ষুগণ সংসার ধর্মে কর্তব্যাকর্তব্য সম্পর্কে উপদেশ দিতেন। ধম্মপদট্ঠকথা[৩৪] সাক্ষ্য দেয় যে, পতিগৃহে যাবার পূর্বে পিতা কন্যাকে নানা উপদেশ দিতেন। এ গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, বিশাখা পতিগৃহে যাবার কালে ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী বিশাখাকে দশটি উপদেশ দিয়েছিলেন, যা বর্তমানে বাংলাদেশে প্রত্যেক বিবাহের দিন প্রদান করা হয়। দশটি উপদেশ হলো :

১। "অম্ম সসুরকুলে বসন্তিয়া নাম অন্তো অগ্‌গি ন বহি নীহরিতব্বো" - মা! শ্বশুরকুলে বাস করার সময় ঘরের আগুন বাইরে নিও না অর্থাৎ শ্বশুর বাড়ীর কারো দোষ দেখলে, তা বাইরে প্রকাশ

Dhaka University Institutional Repository

করবে না।

২। "বহি অগ্গি অন্তো ন পবেসেতব্বো"- বাইরের আগুন ভিতরে আনিও না অর্থাৎ প্রতিবেশী কোন স্ত্রী বা পুরুষ তোমার শ্বশুর বাড়ীর কারো দোষের কথা তোমাকে বললে, তা তোমার শ্বশুর বাড়ীর কারো নিকট তুমি প্রকাশ করিও না।

৩। "দদন্তস্‌স যেব দাতব্বং"- যে দেয়, তাহাকে দিবে অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোনো গৃহোপকরণ ধার নিয়ে যথাসময়ে তা ফেরত দেয়, তাকে ধার দিবে।

৪। "অদদন্তস্‌স ন দাতব্বং"- যে দেয় না, তাকে দিওনা অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোনো প্রকার গৃহোপকরণ ধার নিয়ে যথাসময়ে তা ফেরত দেয় না, তাকে ধার দিওনা।

৫। "দদন্তস্‌সাপি অদদন্তস্‌সাপি দাতব্বং"- যে দেয় অথবা না দেয় তাকেও দিবে অর্থাৎ তোমার স্বগোত্রীয়, সম্পর্কিত আত্মীয় দরিদ্র হলে ধার নিয়া ফেরত দেবার সামর্থ্য না থাকলেও তাকে ধার দিবে।

৬। "সুখং নিসীদিতব্বং"- সুখে উপবেশন করবে অর্থাৎ যে স্থানে বসলে শ্বশুর-শ্বাশুরী, স্বামী ও অন্যান্য গুরুজনকে দেখে ব্যস্তভাবে উঠতে হয়, তেমন স্থানে বসিও না।

৭। "সুখং ভুঞ্জিতব্বং"- সুখে আহার করবে অর্থাৎ শ্বশুর-শ্বাশুড়ী ও স্বামী প্রভৃতি গুরুবর্গের আহার শেষ হলে বাড়ীস্থ অন্যান্যদের আহারের সংবাদ নিয়ে স্বয়ং আহার করবে।

৮। "সুখং নিপজ্জিতব্বং"- সুখে শয়ন করবে অর্থাৎ শ্বশুর-শ্বাশুড়ী, স্বামী ও অন্যান্য গুরুজনের শয়নের পূর্বে শয়ন না করে, শয়নের পূর্বেই তাদের যাবতীয় কার্য সমাপ্ত করে নিশ্চিন্ত মনে শয়ন করবে।

৯। "অগ্গি পরিচরিতব্বং"- অগ্নির পরিচর্যা করবে অর্থাৎ শ্বশুর-শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজন কনিষ্ঠর প্রতি দুঃখিত হয়ে যদি অভিশাপ প্রদান করে, তা হলে আগুনে জ্বলার মতো অতিশয় দুঃখ ভোগ করতে হয়। সেজন্য তাঁদেরকে অগ্নিতুল্য মনে করে যথাসম্ভব তাঁদের সেবা-পূজা করবে।

১০। "অন্তো দেবতা নমস্‌সিতব্বো"- অন্তরে শ্বশুর-শ্বাশুড়ী ও স্বামী প্রভৃতি গুরুবর্গকে দেবতা জ্ঞানে ভক্তি করবে। এই উপদেশসমূহ সযত্নে প্রতিপালন করলে তোমার পক্ষেও মঙ্গল।

৩.২. জাতিভেদ বা বর্ণপ্রথা

ঐতিহাসিক আকর গ্রন্থ, পালি এবং সংস্কৃত সাহিত্য সাক্ষ্য দেয় যে, জাতিভেদ বা বর্ণপ্রথা ছিল প্রাচীন ভারতের সমাজ জীবনের মূল ভিত্তি। ঐতিহাসিকদের মতে, ভারতবর্ষে আর্যদের আগমনে পর সমাজে বর্ণপ্রথা বা জাতিভেদ প্রথা সৃষ্টি হয়েছিল। সমাজের সকল মানুষকে তারা চারটি বর্ণ বা শ্রেণিতে বিভক্ত

Dhaka University Institutional Repository

করে ব্রাহ্মণ্য সমাজ কাঠামো নির্মাণ করেছিল। এ চারটি বর্ণ বা শ্রেণি হচ্ছে : ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। সমীক্ষায় দেখা যায়, আর্যদের বর্ণ ব্যবস্থার মধ্যে তিন বর্ণের লোক ছিল। যথা : ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য। অনার্যরা বা এদেশের স্থানীয়রা শূদ্র বলে বিবেচিত হতো। এভাবে আর্য-অনার্যের সমন্বয়ে প্রাচীনকালে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা চতুবর্ণে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তারা এ বিভাজনকে ঈশ্বরের বিধান বলে প্রচার করতো। ঋকবেদের ১০ম মণ্ডলের ৯০ সূক্তের ১২ নং শ্লোকে চতুবর্ণের সৃষ্টি সম্পর্কে নিম্নরূপ উল্লেখ আছে :

"ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।

উরু তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত।।

অর্থাৎ ব্রহ্মার মুখ থেকে সৃষ্টি হয়েছে ব্রাহ্মণ, দু'বাহু থেকে রাজন্যবর্গ বা ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য এবং পদযুগল থেকে শূদ্র।

বেদের ন্যায় মনুসংহিতায়ও সমাজের প্রধান ভিত্তি হিসেবে বর্ণপ্রথা বা বর্ণাশ্রমের উল্লেখ আছে। এ গ্রন্থের ১ম অধ্যায়ের ৮৮-৯১ নং শ্লোকে চতুবর্ণের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে এরূপ উল্লেখ আছে :

অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।

দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ ॥

প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।

বিষয়েষ্বপ্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ ॥

পশুনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।

বণিক্পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ ॥

একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম সমাদিশৎ।

এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া ॥

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের কাজ হলো অধ্যাপনা, স্বয়ং অধ্যয়ন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ। ক্ষত্রিয়ের কাজ হলো প্রজা রক্ষণ, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন এবং নৃত্যগীতবনিতাদি-বিষয়ভোগে অনাসক্তি। বৈশ্যের কাজ হলো পশুদের রক্ষা, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বাণিজ্য (স্থলপথ ও জলপথ প্রভৃতির মাধ্যমে বস্তু আদান-প্রদান ক'রে ধন উপার্জন), কুসীদ (বৃদ্ধিজীবিকা- টাকা সুদে খাটানো) এবং কৃষিকাজ। আর শূদ্রের কাজ হলো কোনো অসূয়া অর্থাৎ নিন্দা না করে (অর্থাৎ অকপটভাবে) তিন বর্ণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের শুশ্রূষা করা।

Dhaka University Institutional Repository

তবে মনু তাঁর সংহিতায় চার বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণকে উচ্চ আসনে বসিয়েছেন। তাঁর যুক্তি, ব্রহ্মার মুখ থেকে উৎপন্ন হওয়ায় এবং বেদসমূহ ব্রাহ্মণ কর্তৃক রক্ষিত হওয়ায় - ব্রাহ্মণরাই এই সৃষ্ট জগতের একমাত্র প্রভু।[৩৫] কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে চতুবর্ণের কর্তব্য সম্পর্কে নিম্নরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় :

"স্বধর্মো ব্রাহ্মণস্যাধ্যয়নমধ্যাপনং যজনং যাজনং দানং প্রতিগ্রহশ্চেতি। ক্ষত্রিয়স্যাধ্যয়নং যজনং দানং শস্ত্রাজীবো ভূতরক্ষণং চ। বৈশ্যস্যাধ্যয়নং যজনং দানং কৃষিপাশুপাল্যে বণিজ্যা চ। শূদ্রস্য দ্বিজাতিশুশ্রূষা বার্তা কারুকুশীলবকর্ম চ।"[৩৬]

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের কর্তব্য হল অধ্যয়ন (বেদাদি পাঠ), অধ্যাপনা (অন্যকে পাঠদান), যজন (স্বহিতার্থে যজ্ঞসম্পাদন), যাজন (পরহিতার্থে যজ্ঞানুষ্ঠান), দান (অন্যকে দানকর্ম) এবং প্রতিগ্রহ (অন্যের থেকে দানগ্রহণ)। ক্ষত্রিয়দের স্বধর্ম হল অধ্যয়ন, যজন, দান, শস্ত্রোপজীবিত্ব (শস্ত্র দ্বারা জীবিকার্জন) এবং প্রাণিগণকে রক্ষা করা। বৈশ্যের কাজ হচ্ছে অধ্যয়ন, যজন, দান, কৃষিকাজ, পশুপালন এবং বাণিজ্যকর্ম। আর শূদ্রকের দায়িত্ব হলো ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতির সেবা, কৃষিকার্য, পশুপালন ও বাণিজ্যকরণ এবং কারুকর্ম (শিল্পীর কাজ) ও কুশীলবকর্ম (চারণাদির কাজ)। শ্রীমদ্ভগবদগীতা এবং পদ্মপুরাণেও বর্ণপ্রথার উল্লেখ আছে। পদ্মপুরাণ মতে, সূক্ষদর্শী মুনিঋষিগণ দিব্যদৃষ্টি দ্বারা মানুষের দেহের বর্ণ নির্ণয়ে সমর্থ। এ প্রসঙ্গে এ গ্রন্থের স্বর্গখণ্ডের ২৭তম অধ্যায়ে উল্লেখ আছে যে, ব্রাহ্মণের বর্ণ সাদা, ক্ষত্রিয়ের লোহিত, বৈশ্যের পীত এবং শূদ্রের কালো। এখানে শরীরের রঙ এর মাধ্যমে চার বর্ণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ব্রাহ্মণাদি চার প্রকার মানুষের প্রত্যেকের সূক্ষ্ম শরীরের বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় বর্ণের মাধ্যমে[৩৭] তাদের পরিচয় নির্ধারণ করা হয়েছিল।

শ্রীমদ্ভগবদগীতায়ও বর্ণপ্রথার সৃষ্টি সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। এ গ্রন্থের ৪র্থ অধ্যায়ের ১৩ নং শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই চতুবর্ণের সৃষ্টি ও কর্তব্য সম্পর্কে বলেছেন - 'চাতুবর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।' অর্থাৎ গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে আমি চতুবর্ণ সৃষ্টি করেছি। এখানে গুণ বলতে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণকে বুঝানো হয়েছে। সত্ত্বপ্রধান ব্রাহ্মণ - তাদের কর্ম অধ্যাপনাদি। অল্পসত্তগুণ-বিশিষ্ট রজঃপ্রধান ক্ষত্রিয় - তাদের কর্ম যুদ্ধাদি। অল্পতমোগুণ-বিশিষ্ট রজঃপ্রধান বৈশ্য - তাদের কর্ম কৃষি-বাণিজ্যাদি। আর তমঃপ্রধান শূদ্র- তাদের কর্ম অন্য তিন বর্ণের সেবা। এরূপে গুণানুসারে কর্ম বিভাগ করে চতুবর্ণ্যের সৃষ্টি হয়েছে।[৩৮]

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্রসমূহেই কেবল বর্ণভেদ প্রথার উল্লেখ সীমাবদ্ধ ছিল না। পালি সাহিত্য এবং প্রাচীন কবি সাহিত্যিকেরাও তাঁদের কাব্য ও নাটকে এ বিষয়ে নানা চরিত্র উপস্থাপন করেছেন। কবি শূদ্রক তাঁর মৃচ্ছকটিক নাটকেও নানা চরিত্রের মাধ্যমে তখন সমাজে যে বর্ণভেদ প্রথা প্রচলিত ছিল তা উল্লেখ করেছেন।[৩৯]

বৈদিক-ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সৃষ্টিকর্তাই মানুষকে চতুবর্ণে বিভক্ত করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। এই বিভাজন কর্ম বা পেশা ভিত্তিক। সৃষ্টিকর্তা প্রত্যেকের পেশা নির্দিষ্ট করে দিয়েই মানুষ সৃষ্টি করেছেন। এই বিভাজন স্থায়ী এবং বংশানুক্রমিক। ফলে ব্রাহ্মণের সন্তান হবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের সন্তান ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের সন্তান বৈশ্য এবং শূদ্রের সন্তান হবে শূদ্র। মানুষ যে বর্ণে জন্মেছে সে বর্ণে মৃত্যু পর্যন্ত জীবন অতিবাহিত করাই ছিল তার নিয়তি। পালি সাহিত্যের ছত্রে ছত্রে বর্ণপ্রথায় নিষ্পেষিত জনগণের উল্লেখ পাওয়া যায়। ফলে ধারণা করা যায় যে, বুদ্ধের আবির্ভাবকালে বর্ণপ্রথা সমাজে চরম আকার ধারণ করেছিল। এই অনুচ্ছেদে পালি সাহিত্য, বিশেষত জাতকে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে প্রাচীন ভারতের সমাজ ব্যবস্থায় প্রচলিত বর্ণপ্রথার স্বরূপ উদঘাটন করা হবে।

ব্রাহ্মণ্য ও বৈদিক সামাজিক অবকাঠামোতে ব্রাহ্মণের স্থান ছিল সর্বোচ্চ। তাঁরা সমাজে চারটি বিশেষ সুবিধা ভোগ করতেন। যথা : অবধ্যতা, অধ্যয়ন-অধ্যপনা, যাজন এবং যজন (পৌরহিত্য এবং পূজাচার)। জাতকে পৌরহিত্য এবং অধ্যয়ন-অধ্যাপনাই ব্রাহ্মণদের মূল কাজ হিসেবে উল্লেখ আছে। জাতক পাঠে জানা যায় যে, ব্রাহ্মণদের মধ্যে জাত্যাভিমান বোধ প্রখর ছিল। উপাসাল্হজাতক (II. p. 55) পাঠে জানা যায় যে, উপসাল্হ নামক এক ব্রাহ্মণ নিকটবর্তী শ্মশানে শূদ্রের শবদাহ হওয়ার ভয়ে সর্বদা ভীত থাকতেন এবং পবিত্র শ্মশান খুঁজে বেড়াতেন। ব্রাহ্মণের পরেই ছিল ক্ষত্রিয়দের অবস্থান। জাতক মতে, যুদ্ধবিদ্যা ছিল ক্ষত্রিয়দের প্রধান কাজ। কিন্তু যোদ্ধা বললে তাঁদের প্রকৃত পরিচয় দেওয়া হয় না, কারণ জাতকে অন্যান্য বর্ণের লোকেরাও যুদ্ধবৃত্তি অবলম্বন করতে দেখা যায়। জাতকে ক্ষত্রিয়দের 'রাজন্য' শ্রেণিভুক্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে, কারণ তাঁরা রাজকার্য নির্বাহের জন্য রাজার দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলেন। তেসকুণজাতক (V. p. 110f), সুমঙ্গলজাতক (III. p. 440), সোমদত্তজাতক (II. p. 165f), মণিকুণ্ডলজাতক (III. p. 153), গণ্ডতিণ্ডুজাতক (V. p. 99), কুম্মাসপিণ্ডজাতক (III. p. 407) রথলট্ঠিজাতক (III. p. 105) প্রভৃতিতে 'রাজা' ও 'ক্ষত্রিয়' শব্দ একার্থে প্রযুক্ত হয়েছে। জাতকে ব্রাহ্মণদের ন্যায় ক্ষত্রিয়গণও জাত্যাভিমান করতেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। ভীমসেনজাতকে (I. p. 357)

Dhaka University Institutional Repository

মহাক্ষত্রিয় কুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে জেতবন বিহারের এক ভিক্ষু গৌরব ও আস্পর্দ্ধা করতেন। জম্বুখাদকজাতকে (II. p. 439) দেবদত্ত এবং কোকালিক ব্রাহ্মণের কথোপকথনের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের জাত্যাভিমান সম্পর্কে উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মণ্য সামাজিক অবকাঠামোতে বৈশ্যের স্থান হচ্ছে তৃতীয় স্তরে। জাতকে বৈশ্য শব্দের খুব কম উল্লেখ পাওয়া যায়। দসব্রাহ্মণজাতকে (IV. p. 361f) উল্লেখ আছে যে, বৈশ্যরা কৃষি, বাণিজ্য ও ছাগ পালন করে জীবিকা নির্বাহ করতো এবং সুবর্ণের লোভে নিজেদের কন্যাকে অন্যের ভোগে নিয়োজিত করতো। বেস্সন্তরজাতকে (VI. p. 480f) বৈশ্যবীথির উল্লেখ আছে। এতে বোঝা যায়, বৈশ্যরা আলাদাভাবে বসবাস করতো। ব্রাহ্মণ্য সামাজিক ব্যবস্থায় চতুর্থ স্তরে ছিল শূদ্ররা। শূদ্রের জন্ম কেবল উচ্চবর্ণের সেবা করার জন্য। শূদ্ররা তাদের সেবক বা দাস। এ সম্পর্কে শাস্ত্রের বিধান হলো "ঈশ্বর শুধুমাত্র একটি কর্তব্য সাধনের জন্যই শূদ্রদের নির্দেশ দিয়েছেন। তা হলো বিনয়াবনত চিত্তে উচ্চবর্ণের লোকদের সেবা করা। উচ্চবর্ণের লোক সম্পর্কে যদি কোনো শূদ্র অপমানজনক বাক্য বলে, তার মুখ উত্তপ্ত লৌহপিণ্ডপুরে বন্ধ করে দাও। ব্রাহ্মণদের সাথে তর্ক করলে তার মুখ ও কানে ফুটন্ত তেল ঢেলে দাও। ব্রাহ্মণকে লাঠি দ্বারা প্রহার করলে তার হাত কেটে ফেলো। রাগান্বিত হয়ে পা দিয়ে ব্রাহ্মণদের আঘাত করলে পা কেটে ফেলো।"[৪০] জাতকে শূদ্র শব্দের প্রয়োগ তেমন একটা পাওয়া যায় না। তবে 'বৃষল' শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়, যার দ্বারা শূদ্র এবং চণ্ডাল প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতিও বোঝায়। মনুসংহিতা মতে, বেণ, পুক্কস, চণ্ডাল শূদ্র নহে, বর্ণসঙ্কর। ফলে খাটি শূদ্র বলতে কি বোঝাত তা নির্ণয় করা কঠিন।

পালি সাহিত্যে 'হীন বা অন্ত্যজ' শ্রেণি নামক আরো একটি বর্ণের বা জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়, যারা উপরে বর্ণিত চতুবর্ণের কোনোটির মধ্যে পড়ে না। সুত্তবিভঙ্গ, তেরীবাদজাতক (I. p. 283), শঙ্খধমনজাতক (I. p. 284), মাতঙ্গজাতক (IV. p. 376f), চিত্তসম্ভূতজাত (IV. p. 391), সিগালজাতক (I. p. 503), ভীমসেনজাতক (I. p. 357), গঙ্গমালজাতক (III. p. 445f) প্রভৃতিতে নলকার, কুম্ভকার, তন্তুবায় (পেসকার), চর্মকার, নাপিত, বেণ, রথকার, চণ্ডাল, নিষাদ ও পুক্কুস বিভিন্ন পেশার লোককে অন্ত্যজ শ্রেণিভুক্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এদের মধ্যে প্রথম পাঁচটি 'হীনশিল্পী' এবং শেষের পাঁচটি 'হীনজাতি' বলে অভিহিত করা হয়েছে। আর্যগণ সভ্য ও সঙ্গতিপন্ন হওয়ার পর অনার্যদের দ্বারা 'হীন' ব্যবসাগুলো সম্পাদিত হতো। সম্ভবত বংশপরাম্পরায় ঐ ব্যবসা করতো বলে জাতি বিভাজন ব্যবসামূলক হয়ে পড়েছিল। সমাজে সকল ব্যবসার উপযোগিতা থাকা সত্ত্বেও ক্রমে এই হীন ব্যবসায় লিপ্ত ব্যবসায়ীগণ

Dhaka University Institutional Repository

'হীন' জাতির অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়ে। অন্ত্যজ শ্রেণির্ভূক্ত দশটি জাতির মধ্যে নলকার, চর্মকার এবং চণ্ডাল এখনো সমাজে নিম্নস্তরে অবস্থিত। কুম্ভকার, তন্তুবায় এবং নাপিত উন্নতি লাভ করে আচরণীয় শ্রেণিভূক্ত হয়। জাতকে কুম্ভকার শিল্পের হীনতা সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায় না। ভীমসেনজাতকে (I. p. 356-357) বোধিসত্ত্ব তন্তুবায়শিল্পকে 'লামক কর্ম' বলে অভিহিত করেন। কিন্তু সিগালজাতকে (II. p. 6-7) এক নাপিত নিজেকে 'হীনজাতি' বলে আখ্যায়িত করতে দেখা যায়। গঙ্গামালজাতকে (III. p. 445) নাপিত বংশজাত গঙ্গামালকে 'হীনজাত' বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই জাতকে উল্লেখ আছে যে, একদা গঙ্গামাল নামক এক নাপিত গৃহত্যাগ পূর্বক প্রব্রজ্যাগ্রহণ করেন এবং সাধনা বলে প্রত্যেক বুদ্ধত্ব অর্জন করেন। তিনি একদা রাজা উদয়কে নাম ধরে সম্বোধন করেন। এতে রাজমাতা ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে 'হীনজাত নাপিতপুত্র (হীন জচ্চো মলমজ্জনো নহাপিতপুত্তো)' বলে গালাগাল করেন। অন্ত্যজ শ্রেণিভূক্ত অন্যান্য জাতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নির্ণয় করা কঠিন। মনুর মতে, 'বেণ' জাতি খোল, করতাল ইত্যাদি নিয়ে বাদ্য করে ঘুরে বেড়াতো। ভেরীবাদজাতকে (I. p. 284f) এ শ্রেণির লোকের বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে উক্ত জাতকে তাদের 'ভেরীবাদক' নামে অভিহিত করা হয়েছে। যে সকল জন্তু গর্তে থাকে (গোধা, শল্লকী ইত্যাদি) সেগুলো ধরে ও হত্যা করে পুক্কুসরা জীবিকা নির্বাহ করতো বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। মূলত এই বৃত্তি ছিল নিষাদ-বৃত্তির মতো। এছাড়াও পুক্কুসরা মন্দির বা দেবালয় পরিষ্কারের কাজেও নিয়োজিত থাকতেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবত বেণ, পুক্কস, নিষাদ এবং চণ্ডাল এক সাধারণ পর্য্যায়র্ভূক্ত হয়ে 'চণ্ডাল' নামেই বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে অভিহিত হয়ে আসছিল। মনুসংহিতা এবং জাতকে চণ্ডালকে 'হীনজাত' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

শূদ্রদের চেয়েও চণ্ডাল বা অন্ত্যজদের জীবন ছিল কষ্টের ও লাঞ্চনার। মুনসংহিতায় চণ্ডালদের করণীয় সম্পর্কে উল্লেখ আছে। এ শাস্ত্রমতে,"এরা গ্রামের বাইরে বসবাস করবে; সাধুগণ এদের সরাসরি অন্ন দিবেন না, ভৃত্য দ্বারা ভগ্ন পাত্রে দেওয়াবেন; দৈবকর্মাদির অনুষ্ঠানকালে এদের মুখ দর্শন করতে নেই; এরা রাত্রিকালে কদাচ গ্রামে বা নগরে প্রবেশ করতে পারবে না; এরা নগরাদি হতে অনাথ শব বাইরে নিয়ে যাবে; প্রাণদণ্ডগ্রস্ত ব্যক্তিদের শূলারোপনাদি করবে।"[৪১] মূলত তারা ছিল অচ্ছ্যুত। তাদের স্পর্শে অন্যরা অপবিত্র হতো। তাদের সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার মুহূর্ত থেকেই অশুচি ভাবা হতো। তারা সবচেয়ে কঠিন এবং নোংরা কাজগুলো করতো। নোংরা আর্বজনা, মলমূত্রাদি পরিস্কার, মৃত পশুর চামড়া ছাড়ানো, মৃত সৎকার প্রভৃতি ছিল তাদের কাজ। সমাজে এদের মানবিক কোনো মর্যাদা ছিল না। সাধারণ মানুষের বসতি থেকে তাদের বসবাস ছিল দূরে প্রত্যন্ত গ্রামে। তাদের ভাষাও ছিল ভিন্ন। চণ্ডালদের এরূপ কষ্টকর

Dhaka University Institutional Repository

ও লাঞ্ছনাময় জীবনের প্রতিচ্ছবি জাতকে ছত্রে ছত্রে পাওয়া যায়। চিত্তসম্ভূতজাতক (IV. p. 391f), মাতঙ্গজাতক (IV. p. 377f) এবং অম্বজাতক (IV. p. 201f) সাক্ষ্য দেয় যে, চণ্ডাল বা অন্ত্যজগণ নগরের বাইরে বসবাস করতো। চিত্তসম্ভূতজাতক পাঠে জানা যায় যে, একদা চিত্ত এবং সম্ভূত নামক চণ্ডাল উজ্জয়িনী নগরে বাঁশ নৃত্য দেখাতে যান। কিন্তু তাদের নগরের বাইরে অবস্থান করে সেই নৃত্য প্রদর্শন করতে হয়েছিল। সেতকেতুজাতক (III. p. 233) সাক্ষ্য দেয় যে, চণ্ডাল স্পৃষ্ট বায়ু স্পর্শে অপবিত্র হবার আশঙ্কায় উদীচ্য ব্রাহ্মণ শ্বেতকেতু সর্বদা উদ্বিগ্ন থাকতেন। মাতঙ্গজাতক হতে জানা যায়, একদা ষোল হাজার ব্রাহ্মণ না জেনে চণ্ডালের উচ্ছিষ্ট অন্ন ভোজন করেন। এ কারণে সেই ব্রাহ্মণদের সমাজচ্যুত করা হয়েছিল। এ জাতক (IV. p. 392f) পাঠে আরো জানা যায় যে, চণ্ডালের মুখ দর্শনেও অমঙ্গল হতো। এ জাতকে উল্লেখ আছে যে, একদা দৃষ্টমঙ্গলিকা নামক এক শ্রেষ্ঠী কন্যা উদ্যানকেলির জন্য যাবার সময় মাতঙ্গ নামক এক চণ্ডালকে দর্শন করেন। তিনি অমঙ্গল নিবারণের জন্য সঙ্গে সঙ্গে গন্ধোদক দিয়ে চক্ষু ধৌত করে গৃহে ফিরে আসেন এবং তাঁর অনুচরেরা মাতঙ্গকে দারুণ প্রহার করে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় রাস্তায় ফেলে চলে যান। চিত্তসম্ভূতজাতকেও অভিন্ন কাহিনী পাওয়া যায়। এ কাহিনী মতে, একদা উজ্জয়িনীর এক পুরোহিত কন্যা চিত্ত এবং সম্ভূত নামক চণ্ডালকে দেখে গন্ধোদক দিয়ে চক্ষু ধৌত করেন এবং তাঁর সঙ্গে থাকা খাদ্য-দ্রব্যও চণ্ডালদ্বয় দেখেছিল বলে অপবিত্র এবং অভোজনীয় হওয়ায় ময়লা-আবর্জনায় নিক্ষেপ করেছিল। এ জাতকে আরো উল্লেখ আছে যে, চিত্ত এবং সম্ভূত নামক চণ্ডালদ্বয় ব্রাহ্মণ সেজে তক্ষশিলার এক ব্রাহ্মণ গৃহে বিদ্যা শিক্ষা করছিলেন। অসাবধানতা বশত চণ্ডালভাষায় কথা বলায় তাদের জাতি পরিচয় প্রকাশিত হয়ে পড়ে। ফলে তাদের বিদ্যা-শিক্ষা বন্ধ হয়ে যায়। নিতান্ত দায়ে পড়েও চণ্ডাল অন্ন ভোজন করলে ব্রাহ্মণরা মনের দুঃখে প্রাণ ত্যাগ করতেন – এরূপ কথাও বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে উল্লেখ পাওয়া যায়।

কিন্তু পালি সাহিত্যে ক্ষত্রিয়দের প্রাধান্য অধিক লক্ষ্য করা যায়। সম্ভবত বুদ্ধের সময়কালে নানা কারণে ব্রাহ্মণদের ক্ষমতা ও অধিকার অনেকক্ষেত্রে লোপ পেয়ে গিয়েছিল। বিনয়পিটক, উদ্দালকজাতক (IV. p. 298f) এবং সীলমীমাংসাজাতকে (III. p. 194) ব্রাহ্মণের আগে ক্ষত্রিয়ের নামোল্লেখ দেখা যায়। তাছাড়া, পালি সাহিত্যে ক্ষত্রিয় কর্তৃক ব্রাহ্মণদের অবজ্ঞা করার কথাও উল্লেখ পাওয়া যায়। পালি দীর্ঘনিকায়[৪২] গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, কোশলরাজ প্রসেনজিত ব্রাহ্মণ কর্মচারীদের মুখ দর্শন করতে দিতেন না। শাক্যজাতি ক্ষত্রিয় বলে গর্ব করতেন। শাক্যদের সম্পর্কে উক্ত আছে যে, একদা ব্রাহ্মণ অম্বট্ঠ শাক্যদের সভাগৃহে প্রবেশ করলে তাঁকে কোনো আসনে বসতে না দিয়ে এবং নিজেরা উচ্চাসনে বসে উপহাস করে সভাকক্ষ

Dhaka University Institutional Repository

থেকে বের করে দেন। সোণকজাতকে (V. p. 248f) সোণক ব্রাহ্মণকে 'হীনজাত ব্রাহ্মণ' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। এসব বিষয় ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্য ঘোষণা করে। তবে এ দ্বন্দ্বের মূল কারণ হিসেবে সামাজিক আধিপত্যকে চিহ্নিত করা যায়। কারণ জ্ঞানে ও মর্যাদায় ক্ষত্রিয়রা ব্রাহ্মণদের প্রায় সমতুল্য ছিলেন। কিন্তু বৈদিক-ব্রাহ্মণ্য যুগে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য ঘোষিত হলে এ দ্বন্দ্ব সূচিত হয়। ফলে অতি প্রাচীনকাল থেকেই এ দ্বন্দ্ব চলে আসছিল বলে ধারণা করা যায়। কিন্তু উপর্যুক্ত আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, বৌদ্ধযুগে ব্রাহ্মণ্য আধিপত্য খর্ব হয়ে ক্ষত্রিয় আধিপত্য সূচিত হয়েছিল।

এর কারণ হিসেবে ব্রাহ্মণদের অনাচার, সমাজে ক্ষত্রিয়দের আধিপত্য, বিভিন্ন প্রতিবাদী ধর্ম এবং শ্রমণসঙ্ঘের আবির্ভাবকে চিহ্নিত করা যায়। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বুদ্ধ এমন এক সময় ধর্মপ্রচার করেন যখন ভারতের ধর্ম-জীবনে বিপ্লবের দানা বেঁধে উঠছিল। উচ্চ সম্প্রদায়ের গণ্ডির মধ্যে উপনিষদের অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা থাকলেও সাধারণ জনগণ ছিল জাতিভেদ প্রথার নিগড়ে আবদ্ধ এবং বেদোক্ত ব্যয়বহুল ক্রিয়াকলাপ ও অনুশাসনে নিষ্পেষিত। তখন প্রতিবাদী ধর্মরূপে জন্ম নেয় বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম, আজীবিক এবং ষড়তীর্থঙ্কর নামে খ্যাত ছয়টি শ্রমণ সংঘ।[৪৩] এ বিষয়ে পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। বৈদিক ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে জাতিভেদ প্রথার যে উল্লেখ পাওয়া যায় তাতে দেখা যায়, বৈদিক সমাজ ব্যবস্থায় জন্মসূত্রে বর্ণপ্রথা নির্ধারিত হতো। গৌতম বুদ্ধ জন্মসূত্রে নির্ধারিত বর্ণপ্রথার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি জন্মকে প্রাধান্য দেননি, প্রাধান্য দিয়েছেন কর্মকে। তাই বুদ্ধের প্রচারিত ধর্মকে কর্মবাদী ধর্ম হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। তাঁর প্রচারিত ধর্মে কর্মের মাধ্যমেই মানুষের পরিচয় নির্ধারণের কথা বলা হয়েছে। জন্মসূত্রে নির্ধারিত বর্ণপ্রথাকে অস্বীকার করে তিনি বলেন, 'জন্মের দ্বারা কেউ চণ্ডাল হয় না, কর্মের দ্বারাই চণ্ডাল হয়।'[৪৪] তিনি আরো বলেন, মানুষের চরিত্রে যা কিছু নিন্দনীয় তা যারা চর্চা করেন তারাই চণ্ডাল বা নিম্নজ। তিনি তাঁর ধর্মে সকল জাতি-শ্রেণি-পেশার লোককে প্রবেশের অধিকার দিয়ে বর্ণপ্রথার কলংকের তিলক মুছে দিতে চেয়েছেন এবং মানবতার আদর্শকে উর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "গঙ্গা, যমুনা, সরযু, অচিরবতী প্রভৃতি মহানদী যেমন সাগরে পতিত হয়ে নিজ নিজ নাম হারিয়ে ফেলে এবং সমুদ্রেরই অংশীভূত হয়, সেরূপ ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সঙ্ঘে প্রবিষ্ট হলে তাদের আর জাতিগত পার্থক্য থাকে না, তখন তারা সকলেই 'শ্রমণ' পদবাচ্য হয়।"[৪৫] ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণী সংঘের বাইরেও বুদ্ধ অনুরূপ নিয়ম চালু করার প্রয়াস নেন। জানা যায় যে, কপিলাবস্তুর সভাগৃহে এরূপ নিয়ম অনুসৃত হতো। বৌদ্ধধর্মে মনুষ্য সৃষ্ট জাতিভেদ প্রথার অসারতা নানাভাবে তুলে ধরা হয়েছে। ভীমসেনজাতক (I. p. 357) এবং জম্বুখাদকজাতকে (II. p. 439f)

Dhaka University Institutional Repository

জাতিভেদ প্রথার ঔদ্ধত্য ও ক্ষতিকর দিক উপস্থাপন করা হয়েছে। বুদ্ধের কর্মবাদী ধর্ম জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে তীব্রভাবে কুঠারাঘাত করে। বুদ্ধপূর্ব যুগে বংশ পরম্পরায় ব্রাহ্মণ পদবাচ্য লাভ করতো। কিন্তু বুদ্ধ জন্মসূত্রে নির্ধারিত এ পদবাচ্য প্রত্যাখ্যান করে নতুনভাবে ব্রাহ্মণের সংজ্ঞা নির্ধারণ করেন। তিনি কর্মকে প্রাধান্য দিয়ে মানুষের পরিচয় নির্ধারণ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, [৪৬]

" ন জটাহি ন গোত্তেন ন জচ্চা হোতি ব্রাহ্মণো
যম্হি সচ্চঞ্চ ধম্মো চ সো সুচী সো চ ব্রাহ্মণো।

অর্থাৎ জটা, গোত্র বা জন্ম দ্বারা কেহ ব্রাহ্মণ হয় না। যাঁর মধ্যে সত্য ও ধর্ম বিদ্যমান তিনিই পবিত্র এবং তিনিই ব্রাহ্মণ।

"ন চা'হং ব্রাহ্মণং ব্রূমি যোনিজং মত্তিসম্ভবং
ভো'বাদি নাম সো হোতি সচে হোতি সকিঞ্চনো
অকিঞ্চনং অনাদানং তম্হং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।"

অর্থাৎ যদি কেহ রাগ-দ্বেষাদি কলুষযুক্ত হয়, তবে ব্রাহ্মণ মাতৃসম্ভূত বলে তাকে আমি ব্রাহ্মণ বলি না। সে কেবল 'ভো'বাদি' নামে অভিহিত হতে পারে। যিনি অকিঞ্চন ও অনাদান তাঁকে আমি ব্রাহ্মণ বলি।

তিনি ব্রাহ্মণ বর্গে প্রকৃত ব্রাহ্মণে স্বরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তুলে ধরেছেন। তিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণের সংজ্ঞা নির্দেশ করেন এরূপে :

"অক্কোধনং যতবন্তং সীলবন্তং অনুস্সদং
দন্তং অন্তিমসারীরং তম্হং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।"

অর্থাৎ যিনি ক্রোধহীন, ব্রতপরায়ণ, শীলবান, তৃষ্ণামুক্ত, সংযত ও পুর্ণজন্ম ক্ষয়কারী তাঁকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

বুদ্ধের কর্মবাদ সমাজ জীবনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে বুদ্ধের সামাজিক প্রতিবাদের কারণে এবং কর্মের মাধ্যমে সমাজে মানুষের পরিচয় স্বীকৃত হওয়ায় সমাজে পতিত বলে স্বীকৃত নিম্নশ্রেণির জনগোষ্ঠী নতুনভাবে বাঁচার প্রেরণা লাভ করে। ফলে সমাজ পরিত্যক্ত গণিকার ছেলেও আপন কর্ম প্রচেষ্টায় উচ্চ সামাজিক মর্যদা লাভে সক্ষম হয়েছিল। বিনয়পিটক,[৪৭] চুল্লসেটঠিজাতক (I. p. 116), সত্তিগুম্বজাতক (IV. p. 430) এবং সংকিচ্চজাতক (V. p. 262) প্রভৃতি সাক্ষ্য দেয় যে, বুদ্ধের

Dhaka University Institutional Repository

সময়কালে রাজগৃহের নগর-শোভিনী সালবতীর ছেলে জীবক চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শীতা অর্জন করে রাজবৈদ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন এবং সমাজে প্রচুর সুখ্যাতি লাভ করেছিলেন। জাতক এবং বিভিন্ন পালি গ্রন্থে বুদ্ধের সময়ে আপন কর্মগুণে ও প্রচেষ্টায় বহু অস্পৃশ্য ও অচ্ছুত শ্রেণিভূক্ত নর-নারী বৌদ্ধসংঘে উচ্চ আসন লাভের কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : গণিকা আম্রপালি, চণ্ডাল সুনীথ ও মাতঙ্গ এবং নাপিতপুত্র উপালী প্রমুখ। বুদ্ধের কর্মবাদ ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। ফলে বুদ্ধের সময়কালে সমাজে বৈশ্যদের সামাজিক মর্যাদা পূর্বাপেক্ষা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাঁরা শ্রেষ্ঠী, স্বার্থবাহ এবং জৈষ্ঠক প্রভৃতি পদমর্যাদা লাভ করে এবং সমাজে তাঁদের মর্যাদা উচ্চবর্ণের লোকদের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না। ক্ষেত্র বিশেষে তারা সেনাপতি, পুরোহিত এবং উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তারূপে বিবেচিত হতেন।[৪৮] এখানে শ্রাবস্তী শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিকের নামোল্লেখ করা যেতে পারে। অপণ্ণকজাতক (I. p. 95), তিত্থিরজাতক (I. p. 217), কুণ্ডককুচ্ছসিন্ধবজাতক (II. p. 287), সুজাতজাতক (II. p. 347), পীঠজাতক (III. p. 119), কেসবজাতক (III. p. 141), ভদ্দসালজাতক (IV. p. 144) প্রভৃতিতে অনাথপিণ্ডিকের প্রভাব প্রতিপত্তি এবং সামাজিক মর্যাদার কথা বর্ণিত আছে। রোমিলা থাপারের মতে, ব্যবসা বাণিজ্যে আধিপত্যের কারণে বুদ্ধের সময়ে বৈশ্যরাও ক্রমে অর্থনীতিতে বলীয়ান হয়ে ওঠেছিল।[৪৯] অপরদিকে, জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে বুদ্ধের অবস্থানের কারণে সমাজে ব্রাহ্মণের প্রভাব প্রতিপত্তি ও আধিপত্য নানাভাবে কমতে শুরু করে। ব্রাহ্মণরা যে চারটি বিশেষ সুবিধা ভোগ করতেন তন্মধ্যে অন্যতম হলো ব্রাহ্মণের অবধ্যতা অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে হত্যা করা যাবে না। কিন্তু পদকুসলমানবজাতকে (III. p. 504f) এবং বন্ধনমোক্খজাতকে (I. p. 437f) রানীর সঙ্গে পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগের ভিত্তিতে ব্রাহ্মণকে প্রাণদণ্ডাদেশ দেয়ার কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। মৃচ্ছকটিকম্ নাটকেও ব্রাহ্মণের প্রাণদণ্ডাদেশ দিতে দেখা যায়। এতে উল্লেখ আছে যে, নায়ক চারুদত্তের বিচারকালে বিচারক রাজাকে ব্রাহ্মণ অবধ্য- এ বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেন। তথাপি রাজা তাঁর প্রাণদণ্ডাদেশ প্রদান করেন।[৫০]

তাছাড়া, সমাজে বিশেষ সুবিধা ভোগ করায় ব্রাহ্মণরা ক্রমে লোভ-মোহে আবিষ্ট এবং নানা অনাচারে যুক্ত হয়ে পড়ে। ফলে অধিক মুনাফা লাভের আশায় তাঁরা নানা পেশা ও জীবিকা উপায় হিসেবে অবলম্বন করতে থাকেন। জাতকের আর্থিক সুবিধার লাভের জন্য ব্রাহ্মণদের নানা বৃত্তি বা পেশা অবলম্বনের কথা উল্লেখ আছে। খণ্ডহালজাতকে (VI. p. 131f) অর্থ লালসার দরুন ব্রাহ্মণের অর্থধর্মানুশাসকের পদ লাভ এবং উৎকোচ গ্রহণ করার কথা উল্লেখ আছে। কিংছন্দজাতকে (V. p. 2) উল্লেখ আছে যে, পুরোহিত

Dhaka University Institutional Repository

ব্রাহ্মণ উৎকোচগ্রাহক ও অবিচারক ছিলেন। পদকুসলমানবজাতক (III. p. 503), খণ্ডহালজাতক (VI. p. 132) এবং মহাউম্মাগ্‌গজাতক (VI. p. 330ff) প্রভৃতি সাক্ষ্য দেয় যে, অর্থলোভে এবং ঈর্ষাবশে ব্রাহ্মণরা সময় সময় দুষ্কার্য্য করতেন। সরভঙ্গজাতকে (V. p. 128f) অসিজীবি হিসেবে ব্রাহ্মণের সৈনিকের পদ অবলম্বনের কথা উল্লেখ আছে। উরগজাতকে (III. p. 162f) এবং সোমদত্তজাতকে (II. p. 165f) বৈশ্যদের ন্যায় ব্রাহ্মণ কর্তৃক হলকর্ষকের পেশা এবং গগ্‌গজাতকে (II. p. 15f) ফেরিওয়ালার পেশা গ্রহণ করে জীবিকা নির্বাহের কথা বর্ণিত আছে। ধূমকারীজাতকে (III. p. 400-401) ব্রাহ্মণ কৃর্তক ছাগ ও মেষ পালনের কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। ফন্দনজাতকে (IV. p. 208) সূত্রধরের পেশা এবং চূল্লনন্দিকজাতকে (II. p. 199f) ব্যাধবৃত্তি গ্রহণের কথা আছে। মহাকণ্‌হজাতকে (IV. p. 181f) ব্রাহ্মণ কর্তৃক পথিকের সর্বস্ব হরণের কথা বর্ণিত আছে। দসব্রাহ্মণজাতকে (IV. p. 361ff) দস্যু হতে পথিককে রক্ষা তথা প্রহরীর কাজে নিয়োজিত থাকার কথা বর্ণিত আছে। এ জাতকে ব্রাহ্মণরা যেসব হীনবৃত্তি অবলম্বন করতেন তারও তালিকা পাওয়া যায়।

সুরুচিজাতক (IV. p. 316), গামণিচণ্ডজাতক (II. p. 297f), অসিলক্‌খণজাতক (I. p. 456), অলীনচিত্তজাতক (II. p. 18f), কুণালজাতক (V. p. 413), মহাসুপিণজাতক (I. p. 335), পঞ্চাবুধজাতক (I. p. 273), নানচ্ছন্দজাতক (II. p. 427) প্রভৃতি সাক্ষ্য দেয় যে, ব্রাহ্মণরা জ্যোতিষবিদ্যা, ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা প্রভৃতি ব্যবহার বা অপব্যবহার করেও ধনোপার্জন করতেন।

ব্রাহ্মণদের অধিকারলোপ এবং হীনবৃত্তি গ্রহণের কারণ হিসেবে বৌদ্ধযুগে প্রতিবাদী ধর্মসমূহের সামাজিক প্রভাব এবং ক্ষত্রিয়দের আধিপত্যকে চিহ্নিত করা যায়। পরম্পরা প্রথা অনুয়ায়ী ক্ষত্রিয়রা রাজ্য শাসন করতেন। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য ব্রাহ্মণগণ তাঁদের উপর নির্ভর করতেন। এ কারণে বৈদিক পুরোহিতদের উত্তরসুরি হিসেবে দাবি করলেও ব্রাহ্মণদের পরম্পরালব্ধ সামাজিক প্রভাব অনেকাংশে বিনষ্ট হয়ে যায়, যার ফলে তাঁরা সমাজে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত হন। ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্ধ প্রাচীনকাল থেকেই বিরাজমান ছিল। ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি, পরম্পরা প্রথা অনুসারে ব্রাহ্মণদের অন্যতম কাজ ছিল পৌরহিত্য, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা। কিন্তু বৌদ্ধযুগে এ পেশাও ক্ষত্রিয়দের দখলে চলে যেতে দেখা যায়। পালি, সংস্কৃত এবং জৈন সাহিত্যে ক্ষেত্র বিশেষে ক্ষত্রিয়রা ব্রাহ্মণদের তাত্ত্বিক বিষয় শিক্ষা দিতে দেখা যায়। বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক বুদ্ধ এবং জৈন ধর্মের প্রবর্তক মহাবীর ছিলেন ক্ষত্রিয় বংশজাত। খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের দিকে এই দু'জন ক্ষত্রিয়ের বহু

Dhaka University Institutional Repository

ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিলেন বলে পালি ও জৈন সাহিত্য সাক্ষ্য দেয়। এখানে বুদ্ধের অন্যতম শিষ্য সারিপুত্র এবং মৌদগল্যায়ন কথা উল্লেখ করা যায়, যাঁরা ছিলেন ব্রাহ্মণ।

বুদ্ধের পরবর্তীকালেও ব্রাহ্মণ্য অনুশাসন ও বর্ণপ্রথার বিধি-বিধান ভঙ্গ করে সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। মৃচ্ছকটিকম্ নাটকে এ প্রবণতার বিশেষ সাক্ষ্য পাওয়া যায়। নাটকটি খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতকে রচিত হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। নাটকটির রচয়িতা শূদ্রক। এ নাটকে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের বিধি-বিধান মান্য করা হয়নি। এ নাটকের দেখা যায়, নায়ক চারুদত্ত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও বাণিজ্যকে পেশা গ্রহণ করেছেন। ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রানুসারে বাণিজ্য ব্রাহ্মণের পেশা হতে পারে না, এটি বৈশ্যের পেশা। শুধু তাই নয়, আর্থিক অস্চ্ছলতার কারণে শাস্ত্রের বিধান পরিপন্থি বৈশ্য পরিবারের সঙ্গে তিনি বিবাহ বন্ধনেও আবদ্ধ হন। তাঁর বন্ধু মৈত্রেয় ছিলেন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ। কৃপা না করায় মৈত্রেয় ঈশ্বরকে পূজা দিতে অস্বীকার করেন। ব্রাহ্মণের নিকট পূজা একটি নিত্য কর্মের বিধি। এ নাটকে অপর বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ শর্বিলককে চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন এবং প্রেমে আসক্ত হয়ে গণিকা বিবাহ করতে দেখা যায়, যা ছিল বেদ, মনুসংহিতা এবং অর্থশাস্ত্রের বিধি-বিধানের পরিপন্থি। এ নাটকে শূদ্রদের প্রতি অবহেলার পরিবর্তে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে দেখা যায়। এভাবে মৃচ্ছকটিকম্ নাটকে বর্ণপ্রথায় আবদ্ধ সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে।

উপর্যুক্ত আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, ব্রাহ্মণ্য ধর্মশাস্ত্র এবং স্মৃতিশাস্ত্রে চতুবর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণদের মর্যাদার স্থান ছিল সমাজের উচ্চ আসনে। অন্যান্য বর্ণকে সামাজিক ভাবে ক্রমান্বয়ে নিম্নমুখী করে রাখা হয়েছে। কিন্তু মৃচ্ছকটিকম্ নাটকে নাট্যকার ব্রাহ্মণদের সমাজের উচ্চ আসনে বসালেও অন্যান্য বর্ণকেও সমাজের বিভিন্ন স্তরে সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। পালি সাহিত্য তথা জাতকের তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বৌদ্ধযুগে ব্রাহ্মণদের একচ্ছত্র আধিপত্য খর্ব হয়ে ক্ষত্রিয়ের আধিপত্য সূচিত হয়েছিল। এ সময় বৈদিক বর্ণাশ্রম প্রথা পরিত্যাগ করে কর্মগত ও গুণগত উৎকর্ষতার উপরই সমাজের ভিত্তি স্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে।

৩.৩. দাস প্রথা

ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, প্রাচীন ভারতের সমাজ জীবনের আর এক অভিশপ্ত অধ্যায় বা প্রথা ছিল দাস প্রথা। দাস বলতে এক ধরণের মানুষকে বোঝায়, যারা শারীরিক এবং মানসিক বৈশিষ্ট্যে অন্য সকল

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের মতো, অথচ সামাজিক মর্যাদায় অধস্তন, পরাধীন, অন্যের আজ্ঞাধীন, অন্যের সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হয় এবং যিনি যৎ সামান্য অর্থ বা খাদ্যের বিনিময়ে অত্যন্ত কষ্টকর অবস্থায় জীবনযাপন করে।[৫১] এরূপ শ্রেণিভুক্ত লোককে দাসত্বে পরিণত করার সামাজিক প্রথাকে 'দাস প্রথা' বলে। দাস প্রথা মানুষের সমাজে এক বৈষম্যমূলক অমানবিক প্রথা। আদিম মানুষের সমাজ ছিল সরল। সেই সরল সমাজে সকল মানুষ ছিল সমমর্যাদা সম্পন্ন, সেই সমাজ ছিল শোষণহীন এবং বৈষম্যহীন। দাস প্রথার কোনো অস্তিত্ব সে সমাজে ছিল না। সবাই মিলে খাদ্য সংগ্রহ করে এক সঙ্গে ভাগ করে খেত। কিন্তু মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জীবনধারায় পরিবর্তন সূচিত হয়। মানুষ ক্রমে পশুপালন ও প্রকৃতি হতে খাদ্য সংগ্রহ করে জীবন ধারণ পদ্ধতি থেকে সরে এসে কৃষিনির্ভর জীবন শুরু করে। মানুষ এভাবে যখন উৎপাদনমুখী হলো তখন থেকে আদিম সরল সমাজে বৈষম্য সৃষ্টি হতে থাকে এবং সমাজ ক্রমশ জটিলতর হয়ে ওঠে। কৃষি উদ্ভাবনের ফলে জমির মালিকানা তথা ব্যক্তিগত ভূসম্পত্তির ধারণার সৃষ্টি হয়। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উদ্বৃত্ত উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ফলে ভূমির মালিক অন্য মানুষদের সাহায্যে উদ্বৃত্ত উৎপাদন করে ধনবান হতে শুরু করলো। তারা উপলব্ধি করলো অধিক মানুষ নিয়োজিত করে অধিক ফসল উৎপাদন ও সম্পদ বাড়ানো সম্ভব। এ কারণে মানুষ অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যমূলক সমাজ গঠনে উজ্জিবীত হয়। ফলে অসমান্তরাল এক সমাজ ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। সমাজে ধন বৈষম্য সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সবল মানুষ অপেক্ষাকৃত দুর্বল মানুষকে নানা কৌশলে অধীনস্ত করে সম্পদ আহরণ করতে শুরু করে। এভাবে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে সমাজে দাসপ্রথা সৃষ্টি হয়। ধারণা করা হয় যে, দাস প্রথার প্রথম প্রচলন হয়েছিল সভ্যতার আদিপীঠস্থল হিসেবে খ্যাত গ্রীসে। গ্রীকগণ ছিলেন যুদ্ধবাজ জাতি। পরাজিতদের প্রথমে তারা হত্যা করতো। পরে তারা উপলব্ধি করলো যে, হত্যা না করে উৎপাদনশীল কাজে লাগালে লাভবান হওয়া যাবে। এরপর থেকে তারা তাদের কৃষি, গৃহকর্ম এবং নানা উৎপাদনশীল কর্মে নিয়োজিত করতে থাকে। এভাবে দাস প্রথা সৃষ্টি হলে তারা চিরস্থায়ীভাবে অধস্তন দলে পরিণত হয়। গ্রীক তত্ত্ববিদ্গণ এ প্রথাকে প্রাকৃতিক নিয়ম বলে যুক্তিসিদ্ধ করে নিলে দাস প্রথা ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র বিশ্বে।

প্রাচীনকালে মানুষকে নানাভাবে দাসত্বে পরিণত করা হতো। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত উপায়গুলো ছিল উল্লেখ যোগ্য :

১) দারিদ্রতা : বিত্ত ও ভূমিহীন দরিদ্র মানুষ নিজের ও পরিবারের সদস্যদের খাদ্য সংস্থানের জন্য ভূমি মালিকদের দাসত্ব বরণ করতেন।

২) যুদ্ধে পরাজয় : যুদ্ধে পরাজিত সৈনিকদের দাসত্বে পরিণত করা হতো।

Dhaka University Institutional Repository

৩) ঋণের কারণে: গরিব বা অল্পবিত্ত মানুষেরা মহাজনের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করতো। এ ঋণ সুদসহ পরিশোধে ব্যর্থ হলে তাদের দাসত্বে পরিণত করা হতো।

৪) কেনা-বেচার মাধ্যমে: প্রথম দিকে যুদ্ধে আটক বন্দিদের বিক্রি করার রেওয়াজ চালু হয়। পরবর্তীতে দাসত্ব বরণকারী মানুষ মালিকদের ব্যক্তিগত সম্পদ বিবেচিত হওয়ায় দাসদের কেনা বেচা শুরু হয়। পরবর্তীতে দুর্বল মানুষদের ধরে এনে দাস হিসেবে বিক্রি করা হতো। এভাবেও দাসে পরিণত করা হতো।

৫) অপহরণ ও পাচার: দুর্বৃত্তরা সাধারণ মানুষকে ধরে এনে বিক্রি পূর্বক দাসত্বে পরিণত করা হতো।

৬) দণ্ডাদেশের মাধ্যমে: অপরাধীদের দণ্ডদানের মাধ্যমেও দাসত্বে পরিণত করা হতো।

ভারতবর্ষে কখন দাস প্রথার সূচনা হয়েছিল তা সঠিক ভাবে জানা না গেলেও বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য সাহিত্য সাক্ষ্য দেয় যে, খ্রিষ্টপূর্ব দুই হাজার বছর পূর্বে অর্থাৎ এদেশে আর্যদের আগমনের পর বর্ণপ্রথা সৃষ্টি হয় এবং এই বর্ণপ্রথাই ভারতবর্ষে দাস প্রথার উন্মেষ ঘটায়। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য সাহিত্য সাক্ষ্য দেয় যে, খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের অনেক আগেই ভারতে দাসপ্রথা চরম আকার ধারণ করেছিল। মনুসংহিতায়[৫২] সাত প্রকার দাসের প্রচলন উল্লেখ পাওয়া যায়, যা উপরে বর্ণিত দাস প্রথার সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে মিল পাওয়া যায়। মনুসংহিতার মতে, প্রাচীন ভারতে যুদ্ধে আটককৃত বন্দিদের দাসত্বে পরিণত করা হতো, এদের বলা হয় ধ্বজাহৃত। খাদ্য সংস্থানের জন্য দাসত্ব বরণ করা হতো, এদের বলা হয় ভক্ত দাস। দাসীর গর্ভজাত সন্তান দাসে পরিণত করা হতো, এদের বলা হয় গৃহজ। রাজদণ্ড শোধ করতে ব্যর্থ হলে দাসত্ব বরণ করতো, এদের বলা হয় দণ্ডদাস। এছাড়া, ক্রীত, দরিদ্র এবং পৈতৃক – এই তিন প্রকার দাসেরও উল্লেখ আছে। জাতকেও দাস প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায়। বিধুরপণ্ডিতজাতকে (VI. p. 255ff) চার প্রকার দাসের উল্লেখ আছে। যথা : গর্ভদাস, ক্রীতদাস, গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য ইচ্ছাকৃত দাসত্ব বরণ এবং দস্যুর ভয়ে অন্যের আশ্রয় নিয়ে দাসত্ব বরণ প্রভৃতি। জাতকে উল্লিখিত পরবর্তী দু'টি দাস প্রথা মনুসংহিতায় উল্লেখিত ভক্তদাসের ভিন্ন ভিন্ন শাখা বলে প্রতীয়মান হয়। কুলাবকজাতকে (I. p. 199f) এক অত্যাচারী গ্রামভোজককে রাজা দণ্ডস্বরূপ দাসত্বে পরিণত করার কথা উল্লেখ আছে। এ প্রথার সঙ্গে মনুসংহিতায় বর্ণিত দণ্ডদাস প্রথার মিল রয়েছে। চুল্লনারদজাতকে (IV. p. 221) এবং তক্কজাতকে (I. p. 296f) জোর পূর্বক দাসত্বে পরিণত করার কথা উল্লেখ আছে। জাতকদ্বয়ে বর্ণিত আছে যে, ডাকাতরা গ্রামসমূহে লুণ্ঠন করে চলে যাবার সময় গ্রামবাসীদেরও জোরপূর্বক ধরে নিয়ে গিয়ে দাসত্বে পরিণত করতো। পালি সাহিত্যে এরূপ হতভাগ্য ব্যক্তিদের 'ভাতক' এবং 'কম্মকর' নামে অভিহিত করতে দেখা যায়। এরূপ দাসকে মনুসংহিতায় বর্ণিত ধ্বজাহৃত দাসের সঙ্গে তুলনা করা যায়। কুম্মাসপিণ্ডজাতক (III. p. 407) এবং

Dhaka University Institutional Repository

সুতনোজাতক (III. p. 326) হতে জানা যায় যে, কম্মকরেরা কাজের বিনিময়ে নগদ বেতন নিত। গঙ্গামালজাতকে (III. p. 446) কম্মকরেরা কখনো কখনো পেটেভাতে শ্রম দিতো বলেও উল্লেখ পাওয়া যায়। এ জাতকে কম্মকর এবং দাস উভয় প্রকার শ্রমজীবি মানুষের উল্লেখ আছে। নামসিদ্ধিকজাতকে (I. p. 402f) উল্লেখ আছে যে, ধনপাল নাম্নী এক দাসীকে তার প্রভু অন্যের গৃহের কাজে নিয়োগ করে ধনোপার্জন করতো। উক্ত জাতকে আরো উল্লেখ আছে, একদা সেই দাসী ধনোপার্জন করতে ব্যর্থ হলে প্রভু তাকে ব্যাপক প্রহার করেন। তক্কজাতকে (I. p. 295) উল্লেখ আছে যে, বারাণসীর শ্রেষ্ঠী দুহিতা দুষ্টকুমারী দাসদের কটুকথা বলতেন এবং প্রহার করতেন। জাতকে দাসদের কষ্টকর জীবনের উল্লেখ পাওয়া গেলেও কোনো কোনো জাতকে দাসদের প্রতি প্রভুদের সহানুভূতি ও সদয় আচরণের বর্ণনাও পাওয়া যায়। কটাহকজাতকে (I. p. 452) এক গর্ভদাসের উল্লেখ আছে যাকে প্রভু স্বীয় পুত্রের সঙ্গে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করতেন। ফলে সেই গর্ভদাস প্রভূত বিদ্যার্জনে সক্ষম হয়েছিল। নন্দজাতকে (I. p. 225) নন্দ নামক এক দাসের উল্লেখ আছে, যিনি প্রভুর এতই বিশ্বস্ত ছিল যে মৃত্যুকালে প্রভু তাকে লুকিয়ে রাখা গুপ্তধন দিয়ে যান। নানাচ্ছন্দজাতক (II. p. 428), সিরিকালকণ্নিজাতক (III. 258), উরগজাতক (III. p. 163), গঙ্গামালজাতক (III. p. 446) প্রভৃতিতে দাস-দাসীদের প্রতি প্রভুর সদয় আচরণ এবং সুখে সাচ্ছন্দে থাকার নানা কাহিনি পাওয়া যায়। থেরীগাথা[৩] গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, শ্রাবস্তীর বিখ্যাত শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিকের দাসী পূর্ণিকা এক উদকশুদ্ধি ব্রাহ্মণকে স্বমতে আনতে সক্ষম হলে শ্রেষ্ঠী পূর্ণিকাকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দান করেন।

জাতকে দাসদের নানা রকম মজুরীর কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। এতে ধারণা করা যায় যে, বয়স, কর্মদক্ষতা এবং শারীরিক শক্তি বিবেচনা করে তাদের মজুরী নির্ধারণ করা হতো। নন্দজাতক (I. p. 225) এবং দুরাজানজাতকে (I. p. 300) শ্রাবস্তীর শতমুদ্রার এক দাসী কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। সত্তুভস্তজাতক (III. p. 342f) পাঠে জানা যায় যে, বারণসীর এক ব্রাহ্মণ অপর এক ব্রাহ্মণের প্রাপ্য সাতশত কাহাপণ ফেরত দিতে ব্যর্থ হলে নিজ কন্যাকে সেই ব্রাহ্মণের নিকট দান করেন। বেস্‌সন্তরজাতকেও (VI. p. 480f) অনুরূপ কাহিনী পাওয়া যায়। এ জাতকে উল্লেখ আছে যে, জূজক নামক এক ব্যক্তি দাসী ক্রয় করার জন্য এ ব্রাহ্মণের নিকট একশত কাহাপণ জমা রাখেন। ব্রাহ্মণ সেই অর্থ ব্যয় করে ফেলায় সেই অর্থ ফেরত দিতে ব্যর্থ হন। ফলে সেই অর্থের বিনিময়ে জূজককে তিনি নিজ কন্যা দান করেন। তিনি নিজ পুত্র এবং কন্যাকে উক্ত ব্রাহ্মণের দাসত্বে নিয়োজিত করার কালে পুত্রকে বলেন, "সহস্র কাহাপণ নিষ্ক্রয় বা ফেরত দিলে দাসমুক্ত হবে।" বুদ্ধ দাসপ্রথার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি মানবসহ প্রাণি, বিষ এবং অস্ত্র বাণিজ্য নিষধ করে বিধি-বিধান নির্দেশ করেন।

৪. উপসংহার

উপর্যুক্ত আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, বুদ্ধের সময়কালে বা জাতকের রচনাকালীন সময়ে প্রাচীন ভারতে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। জাতক সমীক্ষায় দেখা যায়, বৌদ্ধধর্মের আর্বিভাবকালে মানুষ পশুপালনের স্তর অতিক্রম করে কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় প্রবেশ করেছিল। কৃষিভিত্তিক উৎপাদনমুখী সমাজে কঠোর শারীরিক পরিশ্রমের প্রয়োজন ছিল বিধায় উৎপাদন ব্যবস্থায় পুরুষের প্রাধান্য সৃষ্টি হয় এবং অপরদিকে মেয়েরা পিছিয়ে পড়ে। তাছাড়া, পুরুষরা সমাজে তাদের প্রাধান্য বৃদ্ধি করতে নানা অনুশাসন তৈরি করে। এসব অনুশাসন সংস্কাররূপে নারী সমাজ মেনে নিতে থাকলে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠে। সেসময় পরিবার ছিল সমাজের মূল কেন্দ্রবিন্দু। পরিবার গঠনের সামাজিক ও শাস্ত্রসম্মত প্রথা ছিল বিবাহ। প্রাচীন শাস্ত্রে আট প্রকার বিবাহ প্রথার উল্লেখ আছে। যথা : ব্রহ্মবিবাহ, দৈববিবাহ, আর্যবিবাহ, প্রজাপত্য-বিবাহ, অসুর-বিবাহ, রাক্ষস-বিবাহ, পৈশাচ-বিবাহ এবং গান্ধর্ব-বিবাহ। তন্মধ্যে ব্রাহ্মবিবাহ, দৈববিবাহ, আর্যবিবাহ এবং প্রজাপত্য-বিবাহ শাস্ত্রীয় বিবাহবিধিরূপে স্মৃতিশাস্ত্রকারগণের দ্বারা প্রশংসিত এবং অপরগুলো নিন্দিত হয়েছে। আট প্রকার বিবাহ প্রথার সবগুলো জাতকে এবং অন্যান্য পালি সাহিত্যে উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে জাতকে নিম্নরূপ পাঁচ প্রকার বিবাহ প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায় : অভিভাবক কর্তৃক স্থিরকৃত বিবাহ, স্বয়ম্বর বিবাহ, গান্ধর্ব-বিবাহ, রাক্ষস-বিবাহ এবং অসুর-বিবাহ। বর্তমানকালের মতো প্রাচীনকালে বিবাহের ক্ষেত্রে নানা বিধি নিষেধ প্রচলিত ছিল। স্বজাতি, কুল এবং বংশ হতে বিবাহ করা ছিল সামাজিক ও শাস্ত্রসঙ্গত রীতি। জাতকে বালিকা বিবাহের কিছু কিছু উল্লেখ পাওয়া গেলেও মেয়েরা সাধারণত ১২-১৬ বছর বয়সের মধ্যে বিবাহ করতো। তবে অধিকাংশ জাতকে ১৬ বছর বয়সকে বিবাহের আদর্শ বয়স হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বহুবিবাহ, বিধবা বিবাহ এবং কণেপণ প্রথা প্রভৃতিও প্রচলিত ছিল। তাছাড়া, সবর্ণের সঙ্গে অসবর্ণের বিবাহ অনুৎসাহিত করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

জাতক গ্রন্থ সাক্ষ্য দেয় যে, জাতি বা বর্ণপ্রথা ছিল প্রাচীন ভারতের সমাজ জীবনের মূল ভিত্তি। সমাজের সকল মানুষকে চারটি বর্ণ বা শ্রেণিতে বিভক্ত করে ব্রাহ্মণ্য সমাজ কাঠামো নির্মিত হয়েছিল। ব্রাহ্মণ্য সামাজিক অবকাঠামোতে ব্রাহ্মণের স্থান ছিল সর্বোচ্চ। তাঁরা সমাজে চারটি বিশেষ সুবিধা ভোগ করতেন। যথা : অবধ্যতা, অধ্যয়ন-অধ্যপনা, যাজন এবং যজন। পশুবলী এবং ব্যয়বহুল যাগযজ্ঞ ছিল ব্রাহ্মণ্য পূজাচারের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ব্রাহ্মণের পরেই ছিল ক্ষত্রিয়ের স্থান। রাজ্যশাসন এবং যুদ্ধবিদ্যা ছিল ক্ষত্রিয়দের পেশা। ক্ষত্রিয়ের পরে ছিল বৈশ্যের স্থান, ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল বৈশ্যদের পেশা। শূদ্ররা ছিল সর্ব নিম্নস্তরে, অন্য তিন শ্রেণির লোকের সেবা করাই ছিল তাঁদের পেশা। জাতকে 'অন্ত্যজ' শ্রেণিভুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

একশ্রেণির লোকের উল্লেখ পাওয়া যায়, যারা মানবেতর জীবন-যাপন করতো। কিন্তু ষড়তীর্থঙ্কর, বৌদ্ধধর্ম, আজীবিকধর্ম, জৈনধর্ম প্রভৃতির উদ্ভবের ফলে সমাজে ব্রাহ্মণদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও মর্যাদা হ্রাস পেতে থাকে। ক্ষত্রিয়রা রাজ্যশাসন প্রক্রিয়ার সাথে এবং বৈশ্যরা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত থাকার কারণে ক্রমে সমাজে তাঁদের প্রাধান্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। বুদ্ধ বর্ণপ্রথার বিরোধিতা এবং বৌদ্ধসংঘে সকল শ্রেণি-পেশার লোকদের স্থান দেওয়ার কারণে বর্ণপ্রথা ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে এবং অন্ত্যজ বা অস্পৃশ্য শ্রেণির মানুষ মানবিক অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার লাভ করতে থাকে।

জাতক পাঠে আরো জানা যায় যে, প্রাচীন ভারতের সমাজ জীবনের আর এক অভিসপ্ত অধ্যায় ছিল দাস প্রথা। কৃষিভিত্তিক সমাজে মানুষ উৎপাদনমুখী হলে জমির মালিকানা তথা ব্যক্তিগত ভূসম্পত্তির ধারণার সৃষ্টি হয় এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উদ্বৃত্ত উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ফলে ভূমির মালিক অন্য মানুষদের সাহায্যে উদ্বৃত্ত উৎপাদন পূর্বক ধনবান হওয়ার স্বপ্ন দেখে। ফলশ্রুতিতে ধন বৈষম্য সৃষ্টি হয় এবং অসমন্তরাল এক সমাজ ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। সমাজে ধন বৈষম্য সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সবল মানুষ অপেক্ষাকৃত দুর্বল মানুষকে নানা কৌশলে অধীনস্ত করে সম্পদ আহরণ করতে শুরু করে। এভাবে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে সমাজে দাসপ্রথা সৃষ্টি হয়। দাস প্রথা প্রথম সৃষ্টি হয় গ্রীকে। বর্ণপ্রথার মাধ্যমে তা ভারতবর্ষেও বিস্তৃতি লাভ করে। অতএব, বলা যায়, দাসপ্রথা উদ্ভব ও অব্যাহত থাকার পেছনে যে প্রলুব্ধকারী কারণ, তা ছিল অথনৈতিক। মানুষের সভ্যতার অগ্রগতি হয়েছে. কিন্তু উদ্বৃত্তের ধারণা জীবন্ত থেকেছে। কৃষিকর্মের বিস্তর ঘটেছে। কিন্তু এই সূত্র সব ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়েছে। বর্তমানেও দাসত্ব ও দাস প্রথা পৃথিবীর মানুষের জীবনের অনিবার্য অঙ্গ হয়ে বিরাজ করছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

[১] নিজাম উদ্দিন আহ্‌মেদ, *পৃথিবীর আদিম সমাজ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭০, পৃ. ১১।

[২] রাহুল সাংকৃত্যায়ন, *মানব সমাজ* (ভূমিকা ও সম্পাদনা, যতীন সরকার), রুব্রু শাহ্ ক্রিয়েটিভ পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৪৪।

[৩] Swami Madhavananda and R. C. Majumder (ed.), *The Great Womwn of India*, p. 87.

[৪] A. K. Basham, *The Wonder that was India*, p. 160.

[৫] সিরাজ উদ্দিন সাথী, *মানুষের পৃথিবী আদিম মানুষের কথা*, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৬১; *মানব সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫-৬৮।

[৬] সুনীল চট্টোপাধ্যায়, *প্রাচীন ভারতের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৯০।

[৭] *Saṃyutta Nikāya*, op. cit., vol. I, pp. 111.

[৮] *Aṅguttara Nikāya*, op. cit., vol. I., pp. 42.

[৯] *Aṅguttara Nikāya*, op. cit., vol. III., pp. 43.

[১০] I. B. Horner, *Women under Primitive Buddhism*, pp. 3-4; R. C. Majumder (ed.), *The Age of Imperial Unity*, p. 569.

[১১] *The Wonder that was India*, op. cit., p. 166.

[১২] K. M. Kapadia, *Marriage and Family in India, p. 136.*

[১৩] *Paramattha-dīpanī, Udānaṭṭhakathā (Udāna Commentary) of Dhammapālācāriya*, op. cit., vol. V, p. 99.

[১৪] *The Commentary on the Dhammapada*, op. cit., Vol. I, op. cit., p. 191.

[১৫] *মিলিন্দ প্রশ্ন*, পৃ. ২, ৬.

[১৬] *The Wonder that was India*, op. cit., p. 168.

[১৭] I. B. Horner, *Women under the Primitive Buddhism*, Routledge & Kegan Paul Ltd, London, 1930, pp. 28-29.

[১৮] *Aṅguttara Nikāya*, op. cit., vol. II., pp. 61.

[১৯] তারাপদ ভট্টাচার্য (অনু.), *বুদ্ধচরিতম্*, (সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার, নির্বাহী সম্পাদক প্রসুন বসু, খণ্ড, ১, কলিকাতা, ১৯৮৯ (তৃতীয় সংস্করণ), পৃ. ৪৫-৪৯।

[২০] *The Commentary on the Dhammapada*, op. cit., Vol. II, op. cit., p. 217.

Dhaka University Institutional Repository

[২১] *Majjhima Nikāya*, op. cit., vol. II, p. 125.

[২২] *The Commentary on the Dhammapada*, op. cit., Vol. I, op. cit., p. 5.

[২৩] *Vinaya Pitaka*, op. cit., vol. III, pp. 83-84.

[২৪] *Petavatthu*, op. cit., p. 6.

[২৫] *The Commentary on the Dhammapada*, op. cit., Vol. IV, op. cit., p. 2-10.

[২৬] ঈশানচন্দ্র ঘোষ (অনু.), *জাতক*, ষষ্ঠ খণ্ড, করুণা প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৩৯৯ (বাংলা), পৃ. ৩৫৭-৩৫৮।

[২৭] *The Jataka*, vol. Vi, p. 270.

[২৮] *মিলিন্দ প্রশ্ন*, পৃ. ২, ৬.

[২৯] ভিক্ষু শীলভদ্র (অনু), *থেরীগাথা*, মহাবোধি সোসাইটি, কলিকাতা, ১৩৫৭ বাংলা, পৃ. ৮২।

[৩০] *The Commentary on the Dhammapada*, op. cit., Vol. I, op. cit., p. 397.

[৩১] *Paramatthadīpanī, Dhammapāla's Commentary on the Therīgāthā*, (ed.) E. Muller, London, P. T. S. 1893, p. 220.

[৩২] *The Commentary on the Dhammapada*, op. cit., Vol. IV, op. cit., pp. 59-60.

[৩৩] *থেরীগাথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮।

[৩৪] *The Commentary on the Dhammapada*, op. cit., Vol. I, op. cit., pp. 403-404.

[৩৫] মানবেন্দু বন্দোপাধ্যায়, *মনুসংহিতা*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, ১৪১০ বাংলা, ৯৩ নং শ্লোক।

"উত্তমাঙ্গোদ্ভবাজ্জৈষ্ঠ্যাদ্ ব্রহ্মণশ্চৈব ধারণাৎ।

সর্বস্যৈবাস্য সর্গস্য ধর্মতো ব্রাহ্মণঃ প্রভুঃ ।।"

[৩৬] মানবেন্দু বন্দোপাধ্যায়, *কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, ২০০২, পৃ. ৬১-৬২।

[৩৭] মানবেন্দু বন্দোপাধ্যায়, *মনুসংহিতা*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, ১৪১০ বাংলা, পৃ. ১-২ (ভূমিকা)

"ব্রাহ্মণনাং সিতো বর্ণঃ ক্ষত্রিয়াণাং চ লোহিতঃ।

বৈশ্যানাং পীতকশ্চৈব শূদ্রাণামস্মি স্মথা ॥

[৩৮] গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ, *শ্রীমদ্ভগবদগীতা*, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৯৭৭, পৃ. ৯৪।

[৩৯] সুকুমারী ভট্টাচার্য, *শূদ্রক বিরচিত মৃচ্ছকটিক*, সাহিত্য আকাদেমী, নতুন দিল্লী, ১৯৮০, ১/১০; ৩/৮।

[৪০] *মনুসংহিতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫-৬৬।

[৪১] ঐ।

[৪২] *Digha Nikāya*, vol. III., p. 26.

Dhaka University Institutional Repository

[৪৩] *প্রাচীন ভারতের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯-৯০।

[৪৪] *সুত্তনিপাত*, পৃ. ৩৫, 'বসল সুত্ত', গাথা নং: ১৪২।

[৪৫] সংযুক্ত নিকায়ে 'ব্রাহ্মণ সংযুক্ত' নামক অধ্যায়ে প্রকৃত ব্রাহ্মণের স্বরূপ উপস্থাপন করা হয়েছে, বিস্তারিত, শীলানন্দ ব্রহ্মচারী, *সংযুক্ত নিকায়*, প্রথম খণ্ড, ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৪০০ বাংলা, পৃ. ১১০-১২৭।

[৪৬] *ধর্মপদ*, ব্রাহ্মণবর্গ।

[৪৭] *Vinaya Pitaka*, op. cit., vol. I, p. 268.

[৪৮] *Buddhist India*, op. cit., pp. 96-97.

[৪৯] রোমিলা থাপার, *ভারতবর্ষের ইতিহাস*, ওরিয়েন্ট লংম্যান প্রা. লি., কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ৫৫ ।

[৫০] *শূদ্রক বিরচিত মৃচ্ছকটিক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০-২৪।

[৫১] সিরাজ উদ্দিন সাথী, *দাস প্রথা*, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ১৯।

[৫২] *মনুসংহিতা*, প্রাগুক্ত, ৮ম অধ্যায় ৪১৫ নং শ্লোক।

[৫৩] *থেরীগাথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রাচীন ভারতের ধর্মীয় মতাদর্শ

১. ভূমিকা

ধর্ম সমাজ জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। জাতক গ্রন্থে প্রাচীন ভারতের ধর্মীয় মতাদর্শ সম্পর্কে বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। এসব ধর্মীয় মতাদর্শ প্রাচীন ভারতের সমাজ জীবনে কীরূপ প্রভাব বিস্তার করেছিল তা এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে। বিশেষত, জাতকে প্রাপ্ত তথ্যের সঙ্গে অন্যান্য পালি, সংস্কৃত ও ঐতিহাসিক আকর গ্রন্থে প্রাপ্ত তথ্যের সমন্বয় সাধন করে জাতকের রচনাকালীন সময়ে ভারতবর্ষে প্রচলিত ধর্মীয় অবস্থার স্বরূপ উন্মোচন করাই এ অধ্যায়ের মূল উদ্দেশ্য।

২. বুদ্ধের সমকালীন ধর্মীয় অবস্থা

ভারতবর্ষ নানা জাতি ও ধর্মমতের দেশ। ধর্মের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ এবং সংসারের বন্ধন ছিন্ন কেবল ভারতবর্ষেই দেখা যায়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, বুদ্ধের সমকালীন সময়ে তথা খ্রিষ্টীয় সপ্তম-ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতীয় ধর্ম এবং চিন্তার জগতে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। এর অন্যতম পটভূমি হচ্ছে - এ সময় ভারতীয়গণ উপজাতি জীবন অতিক্রম করে সমাজ জীবনে প্রবেশ করেছিল। অর্থনীতিতে তখন পশুপালন পর্ব অতিক্রম করে কৃষিভিত্তিক জীবন শুরু হয়েছিল। অনেক নগর গড়ে ওঠেছিল এবং নগরসমূহের মধ্যে বাণিজ্য প্রসার লাভ করেছিল।[১] আর্যরা তখন বৈদিক সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র মধ্যদেশ অতিক্রম করে পূর্ব ভারতে বিস্তার লাভ করেছিল। এ সময় প্রত্যন্ত প্রদেশে এবং প্রধানত অব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রতিবাদী ধর্ম আন্দোলনের সূচনা হয়। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে বৈদিক সমাজ ব্যবস্থা এবং ধর্মীয় আচার। বিশেষত ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য, বর্ণবৈষম্য প্রথা এবং জটিল যজ্ঞকেন্দ্রিক ধর্মাচার। ইতিহাসে পরিব্রাজক এবং শ্রমণ নামে পরিচিত একদল সন্ন্যাসী এই নতুন চিন্তার অগ্রদূত ছিলেন। তাঁরা সংসার ও কর্মফলে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু তাঁরা বেদের অধিকার ও তার উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থা ও জটিল রক্তক্ষয়ী ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকে অস্বীকার করেছিলেন। চরম সত্যের একমাত্র বাহক ব্রাহ্মণদের দাবী তাঁরা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এসব শ্রমণ সন্ন্যাসীদের অধিকাংশই অব্রাহ্মণ ছিলেন। ব্রাহ্মণদের বর্ণ শ্রেষ্ঠত্বের দাবীও তাঁরা প্রত্যাখ্যান করেন। শুধু তা নয়, ব্রাহ্মণদের প্রাধান্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বর্ণভেদ ব্যবস্থাও তাঁরা মানেননি। দেব-দেবীর অস্তিত্বে তাঁরা অবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। তাই মানুষের জীবনে স্বর্গীয়

Dhaka University Institutional Repository

দাক্ষিণ্যের উপযোগিতাও তাঁরা অস্বীকার করেন। সমাজ এবং প্রকৃতিতে মানুষের স্থান কোথায়? এ প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে তাঁরা সৎ আচরণের উপর প্রাধান্য দেন এবং সদাচরণের দ্বারা সংসার ও কর্মের জাল ছিন্ন করার ধর্মাদর্শ প্রচার করতে থাকেন।

পালি সাহিত্য তথা সঞ্জীবজাতক (V. p. 246), মহাবোধিজাতক (V. 227), সংকিচ্চজাতক (V. p. 261), তেলোবাদজাতক (II. p. 262), মহানারদকস্‌সপজাতক (V. 177, VI. 219), দীর্ঘনিকায়ের[২] শ্রামণ্যফল সূত্র এবং ব্রহ্মজাল সূত্রে উপর্যুক্ত শ্রমণ-সন্ন্যাসী সৃষ্ট ধর্মীয় মতাদর্শের বর্ণনা পাওয়া যায়। এসব শ্রমণ, পরিব্রাজক এবং সন্ন্যাসীরা কোনো সামাজিক আন্দোলন বা কর্মসূচি ঘোষণা করেননি। কিন্তু তাঁদের চিন্তাচেতনা ব্রাহ্মণ্য ভাবধারা ও প্রভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সৃষ্টি করেছিল, যা প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক অঙ্গনে তাঁদের বিভিন্ন শাসকদের সম্ভাব্য মিত্র করে তুলেছিল। এই শাসকগণ তখন ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাপুষ্ট উপজাতীয় অনৈক্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ব্রতী হয়েছিল। অর্থাৎ তাঁদের মাধ্যমে ভারতের রাজনীতিতে কেন্দ্রীকরণের নীতি প্রবর্তিত হয়েছিল। এরূপ বিবর্তনের বাতাবরণে সেসব শ্রমণ-পরিব্রাজক ব্যক্তি সত্তা বিসর্জন দিয়ে কয়েকটি সমভাবাপন্ন গোষ্ঠি গঠন করেছিল। এভাবে প্রাচীন ভারতে ধর্মে এবং রাজনীতিতে সমান্তরাল দু'টি ধারা পরস্পরের পরিপূরক হয়ে ওঠেছিল।

বৈদিক ধর্মের বিরুদ্ধে এই প্রতিক্রিয়ারও দু'টি ধারা ছিল। একটি ধারা নাস্তিকতামূলক। এ ধারাটি বৈদিক দেব-দেবী এবং ব্রাহ্মণ্য-প্রাধান্যের প্রয়োজনীয়তা সরাসরি অস্বীকার করে। অপর ধারাটি আস্তিকতামূলক, যাকে একেশ্বরবাদীও বলা হয়। দ্বিতীয় এ ধারায় ব্যক্তিগত ভক্তিকেই প্রাধান্য দেয়া হয়।

এই দ্বিবিধ প্রতিক্রিয়ার ফলে প্রাচীন ভারতে বৌদ্ধ, জৈন, শৈব এবং বৈষ্ণব - এ চারটি প্রতিবাদী ধর্ম সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিল। এরা আধ্যাত্মিক সত্যের উৎস হিসেবে বেদের অব্যর্থতার এবং মুক্তির উপায় হিসেবে বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানের দাবীকে একবাক্যে নাকচ করেছিল। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম বৈদিক দেব-দেবীকে অস্বীকার করায় এদের বলা হয় প্রতিবাদী ধর্ম বা প্রচলিত ধর্মমত বিরোধী। অপরদিকে শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম বৈদিক দেবতা শিব এবং বিষ্ণুকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেছিল, তাই এদের বলা হয় সংস্কারবাদী। বিরোধী ধর্ম সম্প্রদায় হিসেবে বৌদ্ধ ও জৈনরা ছিল প্রধান। এ সময় আরো একটি সম্রপদায় সৃষ্টি হয়, যা আজিবিক সম্প্রদায় নামে পরিচিত। এ সম্প্রদায়টি পুরোপুরি নাস্তিক্যবাদী। তাঁরা কঠোর অদৃষ্টবাদ বিশ্বাস করতেন। অশোকের শিলালেখতে আজিবিকদের সম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতার কথা উল্লেখ আছে। খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতকে রচিত মিলিন্দ প্রশ্ন গ্রন্থেও আজিবিকদের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মণ্যধর্মের সমালোচনার কারণে খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতক হতে খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক পর্যন্ত আজিবিক ধর্ম জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা মক্‌খলিগোসাল শ্রেণিকাঠামো বা বর্ণপ্রথার সমালোচনা করায় এবং কর্মফল সম্পর্কে তাঁর নতুন ব্যাখ্যা নিম্নশ্রেণির এবং সদ্য ধনীদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। এ ধর্মের সারল্যও সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিল। তবে বৌদ্ধধর্ম এবং আজিবিকদের মধ্যে বিশেষ প্রতিযোগিতা ছিল। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম-দর্শনের দাপটে আজিবিক সম্প্রদায় প্রতিযোগিতায় বেশিদিন ঠিকে থাকতে পারেনি। এর অন্যতম কারণ ছিল আজিবিকদের একপেশে শিক্ষা। তাঁরা ব্রাহ্মণ্য মতবাদ প্রত্যাখ্যান করলেও সাধারণ মানুষের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে স্পষ্ট এবং দার্শনিক ভিত্তিযুক্ত কোনো মতবাদ প্রচার করতে পারেনি। আজিবিকদের তুলনায় জৈনধর্ম ভারতে অনেক বেশি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। তবে জৈনধর্ম ভারতে সুপ্রতিষ্ঠা পেলেও ভারতের বাইরে তেমন প্রসার লাভ করেনি, যা বৌদ্ধধর্ম করতে সক্ষম হয়েছিল। কারণ জৈনধর্ম ব্রাহ্মণ্য জাতিভেদ প্রথা এবং আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে আপোষ করেছিল, যা বৌদ্ধধর্ম করেনি। বুদ্ধের সঙ্গে জৈন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মহাবীরের পার্থক্য হলো, বুদ্ধ নতুন একটা ধর্মমত প্রবর্তন করেছিলেন, কিন্তু মহাবীর তা করেননি। তিনি পার্শ্ব প্রবর্তিত ধর্মমতের সংস্কার সাধন করেছিলেন। ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের যুগে জৈনধর্ম, বৌদ্ধধর্ম এবং আজিবিক ধর্ম ভারতের ধর্মীয় জগতে নতুন চিন্তা-চেতানার উন্মেষ ঘটায়।[৩] বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ এবং জৈন ধর্মের প্রবর্তক মহাবীর ছিলেন ক্ষত্রিয় বংশ জাত। ফলে ধারণা করা যায় যে, প্রাচীন ভারতের ধর্মীয় জগতে ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্য ক্রমশ ম্লান হয়ে আসছিল এবং ক্ষত্রিয়গণের প্রাদান্য বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছিল।

৩. বুদ্ধের সমকালীন ধর্মীয়সংঘ ও ধর্মীয়-মতাদর্শ

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় গৌতম বুদ্ধের পূর্বেই ভারতে অনেক সন্ন্যাসী সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়েছিল। পালি সাহিত্যে বুদ্ধের সমকালীন সময়ে ভারতবর্ষে মোট তেষট্টি প্রকার[৪] ধর্মমত প্রচলিত ছিল বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। তেষট্টি প্রকার ধর্মমতের মধ্যে বৌদ্ধধর্মও বর্তমান ছিল। কারণ বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ *দীর্ঘনিকায়ের* 'ব্রহ্মজাল সূত্রে' বাষট্টি প্রকার ধর্মমতের উল্লেখ আছে। জাতকে এসব ধর্মমতের সংক্ষিপ্ত এবং বিক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়।

জাতক পাঠে জানা যায় যে, যাগ-যজ্ঞ, হোম, পশুবলি, অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড, পূজা অর্চনা প্রভৃতি ছিল তখনকার ধর্মমতের প্রধান অঙ্গ। তাছাড়া বনাচরন, নির্জনবাস, শারীরিক কৃচ্ছ্রতাসাধন প্রভৃতি সাধন প্রণালীও প্রচলিত ছিল। জাতকে প্রাচীনভারতের ধর্মমতের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায় তার সঙ্গে

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য পালি গ্রন্থে প্রাপ্ত তথ্য যুক্ত করে বুদ্ধের সমকালীন সময়ে ভারতবর্ষে প্রচলিত ধর্মীয় অবস্থার স্বরূপ উন্মোচন করা যায়। এ অনুচ্ছেদে জাতক, অন্যান্য পালি এবং ঐতিহাসিক আকর গ্রন্থে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বুদ্ধের সমকালীন ভারতের ধর্মীয় সংঘ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হবে।

জাতকে ব্রাহ্মণ, নিগ্রন্থ (উলঙ্গ সন্ন্যাসী), তীর্থক, পরিব্রাজক, শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, মণিঋষি, তপস্বী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উল্লেখ থাকলেও ধর্মীয় সংঘের সংখ্যা এবং সুস্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে দীর্ঘনিকায় গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, বুদ্ধের সময়কালে বৌদ্ধ শ্রমণ সংঘ অপেক্ষা বড় আরও ছয়টি শ্রমণ সংঘ ছিল। দীর্ঘনিকায়ের সামঞ্ঞফল বা শ্রামণ্যফল সূত্রে[৫] এই ছয়টি শ্রমণ সংঘের প্রধান এবং তাঁদের ধর্ম দর্শনের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ সূত্র অনুসারে ছয়টি ধর্মীয় সংঘের প্রধান হলেন : (১) পূরণ কশ্যপ (২) মক্‌খলি গোসাল (৩) অজিত কেশকম্বলি (৪) পকুধ কচ্চায়ন (৫) নিগণ্ঠনাথ পুত্র এবং (৬) সঞ্চয়বেলটঠ পুত্র। এ ছয়জন শ্রমণ 'ষড়তীর্থঙ্কর' নামে পরিচিত ছিলেন। সঞ্জীবজাতক (V. p. 246), মহাবোধিজাতক (V. 227), সংকিচ্চজাতক (V. p. 261) এবং তেলোবাদজাতকে (II. p. 262) উপর্যুক্ত ছয়জন সংঘ প্রধানের কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে এঁদের জীবনী অস্পষ্ট। জনসাধারনের মধ্যে এই ছয়জনের যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। বুদ্ধের সময়কালে তাঁরা সংঘী, গণী, গণাচার্য, যশস্বী, তীর্থঙ্কর, সাধু প্রভৃতি অভিধায় খ্যাত ছিল। মজ্ঝিমনিকায়[৬] নামক গ্রন্থে তাঁদের সম্পর্কে এরূপ উল্লেখ আছে : "যে মে ভো গোতম সমণব্রাহ্মণো, সংঘিনো, গণিনো, গণাচরিয়া, ত্রাতা, যসস্সিনো তীত্থঙ্করা, সাধুসম্মতা বহুজনসস সেয্যথীদং পুরণো কসসপো, মক্‌খলি গোসালো, অজিত কেসকম্বলো, পুকধো কচ্চায়নো, সঞ্জয়ো বেলটঠপুত্তো, নিগণ্ঠনাথ পুত্তো।" অর্থাৎ "হে গৌতম, যে সকল শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, সংঘনায়ক, গণনায়ক, গণাচার্য, ত্রাতা, যশস্বী, তীর্থঙ্কর এবং বহুজনের দ্বারা সাধু বলে স্বীকৃত ছিলেন তাঁরা হলেন পূরণ কশ্যপ, মক্‌খলি গোসাল, অজিত কেশকম্বলি, পকুধ কচ্চায়ন, নিগণ্ঠনাথ পুত্র এবং সঞ্চয়বেলটঠ পুত্র।" ব্রাহ্মণ্য সমাজ ব্যবস্থা ও বর্ণ প্রথার চিন্তা-চেতনা হতে তাঁদের চিন্তা চেতনা ছিল বিশেষভাবে ভিন্ন। সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং অভিমতের জন্য তাঁদের মুক্ত চিন্তার দার্শনিক হিসেবে গণ্য করা হয়।[৭] এই ছয় জন সংঘ প্রধানের জীবন দর্শনের বর্ণনা হতে বুদ্ধের সমকালীন প্রাচীন ভারতের ধর্মীয় মতবাদের স্বরূপ সর্ম্পকে ধারণা করা যায়। নিম্নে উপরোক্ত ছয় সংঘ প্রধান বা ধর্মোপদেষ্টার জীবন ও মতাদর্শ সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

৩.১. আচার্য পূরণ কশ্যপ

পূরাণ কশ্যপ ছিলেন ছয় জন শাস্তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বয়স্ক আচার্য। শ্রামণ্যফল সূত্রানুসারে[৮] তিনি মগধরাজ অজাতশত্রুর সমসাময়িক ছিলেন। বৌদ্ধ সাহিত্যে তাঁকে তীর্থঙ্কর বলে অভিহিত করা হয়েছে। তাঁর জীবনী সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে কিংবদন্তি বা জনশ্রুতি মিশ্রিত যে জীবনী পাওয়া যায় তা হতে জানা যায় যে, এক ভদ্রলোকের ঔরসে কোনো বিজাতীয় স্ত্রী গর্ভে তাঁর জন্ম হয়।[৯] তাঁর পারিবারিক নাম ছিল কশ্যপ। বেণীমাধব বড়ুয়ার[১০] মতে, 'কশ্যপ' উপাধি প্রমাণ করে যে তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি জন্ম গ্রহণ করার পর তাঁর বংশে একশত জন পূর্ণ হয়। এ কারণে তিনি পূরণ নামে আখ্যা লাভ করেন। পূরণ নামকরণের অন্য ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়। অট্ঠকথাচার্য বুদ্ধঘোষের [১১] মতে, তিনি যে বাড়িতে কাজ করতেন, সে বাড়িতে তাঁকে নিয়ে একশত জন দাস পূর্ণ হওয়ায় তিনি 'পূরণ' নামে খ্যাত হন। অন্যমতে, একশত জন্ম ক্রীতদাস রূপে জন্মগ্রহণ করায় তিনি পূরণ নামে অভিহিতি হন। সুত্তনিপাত-অট্ঠকথায়[১২] তাঁকে আজিবিক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। পেশায় ছিলেন দারোয়ান। একদিন তাঁর কাজে বিরক্ত উৎপন্ন হওয়ায় তিনি বনে পলায়ন করেন। সে বনে কতিপয় দস্যু তাঁর বস্ত্রাদি কেড়ে নিয়ে বিবস্ত্র করে ছেড়ে দেয়। বিবস্ত্র হয়ে তিনি নিকটবর্তী গ্রামে প্রবেশ করেন এবং গ্রামবাসীদের বলেন, "আমি সমস্ত বিদ্যায় পূর্ণতা লাভ করেছি বলে লোকে আমাকে 'পূরণ' বলে এবং ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেছি বিধায় লোকে আমাকে 'কশ্যপ' বলে।" তখন গ্রামবাসীরা তাঁকে বস্ত্র দান করলে তিনি বলেন, "লজ্জা নিবারণের জন্য বস্ত্র ব্যবহৃত হয়, পাপ হতে লজ্জার উৎপত্তি। আমি সমস্ত পাপ প্রবৃত্তি নির্মূল করেছি। অতএব আমার বস্ত্রের প্রয়োজন নাই।"[১৩] অতঃপর তিনি তুচ্ছ নামক বনে অবস্থান পূর্বক সন্ন্যাস জীবন অবলম্বন করেন। সেখানে লোকেরা তাঁকে নানাভাবে পূজা-অর্চনা করতে শুরু করে এবং তিনি অচেলক বা নগ্ন প্রব্রজিত সন্ন্যাসী হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। কালক্রমে তাঁর পাঁচশত প্রধান শিষ্য এবং আশি হাজার অনুসারী হয়, যা তখনকার সময়ে একটি বৃহৎ সংঘে পরিণত হয়। সামঞ্ঞফল সূত্রে তিনি অক্রিয়বাদের সমর্থক ছিলেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। কথিত আছে যে, তিনি গৌতম বুদ্ধের জন্মের ষোড়শ বর্ষে কোশলের রাজধানী শ্রাবস্তীর নিকটে জলে ডুবে আত্মহত্যা করেন।[১৪]

৩.১.১. পূরণ কশ্যপের মতবাদ

"দান, ধ্যান, সংযম, সত্যভাষণ, যাগযজ্ঞ প্রভৃতি সৎকর্ম দ্বারা কোনোরূপ পূণ্য অর্জন করা যায় না। হত্যা, চুরি, মিথ্যাভাষণ, মিথ্যা-কামাচার, দস্যুবৃত্তি, পীড়ন প্রভৃতি অসৎ কর্ম সম্পাদন করলেও

কোনোরূপ পাপ হয় না। আত্মা নিষ্ক্রিয়। ভালো-মন্দ কাজ আত্মা সংশ্লিষ্ট নয়। দেহই কর্মের ফল ভোগ করে। বস্তুর উৎপত্তি পশ্চাতে কোনো হেতু বা কারণ নাই।"[১৫]

উপরে বর্ণিত বিষয় পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, পূরণ কশ্যপের ধর্ম দর্শনের সাথে সাংখ্য দর্শনের মিল রয়েছে। পূরণ কশ্যপের সঙ্গে সাংখ্য দর্শনের "আত্মা প্রকৃতি হতে ভিন্ন এবং কর্মের পরিণাম আত্মাতে হয়না " - এ অভিমতের সঙ্গে যথেষ্ট মিল লক্ষ্য করা যায়।

৩.২. আর্চয মক্খলি গোসাল

বুদ্ধের সমসাময়িককালে অপর প্রখ্যাত সংঘ প্রধান ছিলেন মক্খলি গোসাল। জৈন ভাগবতী সূত্রে [১৬] উল্লেখ আছে যে, তিনি প্রথমে মহাবীরের শিষ্য ছিলেন। পরে নিজে একটি সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। এ সূত্রে তাঁর নাম 'গোসাল মঙ্খলি পুত্ত' অর্থাৎ 'মঙ্খলির পুত্র গোসাল' বলে উল্লেখ আছে। এতে আরো উল্লেখ আছে যে, তিনি শ্রাবস্তীর সরবণ নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল মঙ্খলি এবং মাতার নাম ছিল ভদ্দা। তাঁর পিতা চিত্র বিক্রি করতেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে পিতার বৃত্তি অনুযায়ী তিনি চিত্র বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। অন্যমতে, তিনি কোনো এক পরিব্রাজকের ঔরসে এবং এক পরিব্রাজিকার গর্ভে তাঁর জন্ম হয়। সুমঙ্গলবিলাসিনী[১৭] গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে নিম্নরূপ তথ্য পাওয়া যায়, "তিনি কোশলের অধিবাসী ছিলেন এবং গোশালায় এক দাসীর গর্ভে জন্ম হওয়ায় তিনি গোসাল নামে অভিহিত হন। তিনি পেশায় ছিলেন একজন দাস। একদিন প্রভুর আদেশে তিনি একটি ঘৃতকুম্ভ মাথায় বহন করে নিয়ে যাচিছলেন। পথের মধ্যে এক কদর্মাক্ত স্থানে তাঁর পদস্খলন হয়ে সমস্ত ঘৃত নষ্ট হয়ে যায়। পদস্খন হওয়ায় তিনি মক্খলি নামে অভিহিত হন বলে ধারণা করা হয়। প্রভুর দণ্ড ও শাস্তির ভয়ে তিনি পলায়ন করার সময় প্রভু তার সমস্ত বস্ত্র কেড়ে নিয়ে বিবস্ত্র করে ছেড়ে দেন।" বিবস্ত্র হয়ে প্রথমে তিনি এক বনে আশ্রয় নেন। অতঃপর কোনো এক গ্রামে প্রবেশ করে সন্ন্যাস জীবন যাপন শুরু করেন এবং নিজেকে সন্ন্যাসী হিসাবে পরিচয় দিতে থাকেন। তিনি অচেলক বা নগ্ন প্রব্রজিত সন্ন্যাসী হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। লোকে তাঁকে বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে পূজা-অর্চনা করতে শুরু করেন। কালক্রমে তাঁরও পাঁচশত প্রধান শিষ্য এবং আশি হাজার অনুসারী হয়, যা সে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ছিল বৃহৎ ধর্মীয় সংঘ।[১৮] তিনি আজীবিক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা পার্শ্বনাথের শিষ্য ছিলেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি সংসার শুদ্ধিবাদ বা নিয়তিবাদ সমর্থন করতেন। মধ্যমনিকায় নামক গ্রন্থে তিনি অহেতুক বা অক্রিয়বাদের অনুসারী ছিলেন বলে উল্লেখ আছে।[১৯] তাঁর সম্প্রদায়ভূক্ত শ্রমণগণ আজীবিক বা আজিবক নামে

Dhaka University Institutional Repository

পরিচিত।[২০] উত্তর ভারতে এ সম্প্রদায়টি মৌর্যযুগ পর্যন্ত বর্তমান ছিল। কোশল, অবন্তি এবং বঙ্গে - এ সম্প্রদায়টি প্রচার-প্রসার লাভ করেছিল। বাসামের মতে এই সম্প্রদায়টি দক্ষিণ ভারতেও খুব জনপ্রিয় ছিল এবং মধ্যযুগ পর্যন্ত সম্প্রদায়টির অস্তিত্ব খুব ভালভাবে বজায় ছিল।[২১] অঙ্গুত্তর নিকায়[২২] গ্রন্থ হতে জানা যায় যে, পূরণ কশ্যপের সম্প্রদায়টি মক্‌খলি গোসালের আজীবক সম্প্রদায়ের সাথে মিশে যায়।

৩.২.১. মক্‌খলি গোসালের মতবাদ

"প্রাণিগণের পবিত্র-অপবিত্র হওয়ার পশ্চাতে কোনো হেতু বা কারণ নেই। নিজের, পরের এবং পুরুষ শক্তিতে কিছু হয় না। বল, বীর্য, পুরুষশক্তি, পুরুষ পরাক্রম প্রভৃতির অস্তিত্ব নেই। সর্বসত্ত্ব, সর্বভূত, সর্বপ্রাণী অবশ, দুর্বল, নিবীর্য। নিয়তি বা অদৃষ্ট, সঙ্গতি বা পরিস্থিতি এবং স্বভাবের বশে প্রাণিগণ বিভিন্ন গতি প্রাপ্ত হয়। ছয় অভিজাতিতে[২৩] থেকে প্রাণিগণ সুখ-দুঃখ ভোগ করে থাকে। বুদ্ধিমান মূর্খ উভয়েই চুরাশি লক্ষ মহাকল্পের চক্রের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার পর দুঃখের নাশ হয়। শীতক, ব্রত, তপস্যা অথবা ব্রহ্মচর্য দ্বারা অপরিপক্ক কর্ম যেমন পরিপক্ক হয় না, তেমনি পরিপক্ক কর্মের ফল নষ্ট হয় না। এই সংসারে বিরাজমান সুখ-দুঃখের পরিমান সসীম। এই সুখ-দুঃখ কমানো কিংবা বাড়ানো যায় না। বুদ্ধিমান এবং মূর্খ উভয়েই সংসারের সবগুলো চক্রের ভেতর দিয়ে যাওয়ার পর দুঃখের শেষ হবে।"[২৪]

উপর্যুক্ত তথ্য সমীক্ষায় দেখা যায়, মক্‌খলি গোসালের দর্শনের সঙ্গে অক্রিয়বাদ দর্শনের যথেষ্ট মিল রয়েছে। যদিও তিনি বলেছেন, আত্মা প্রকৃতি হতে অলিপ্ত থাকে, তথাপি তাকে নির্দিষ্ট সংখ্যক জন্ম নিতে হয় এবং তারপর সে আপনা আপনিই মুক্ত হয়।

৩.৩. আর্চায অজিত কেশকম্বলি

অজিত কেশকম্বলী বুদ্ধের সমসাময়িক আচার্যগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন বলে ধারণা করা হয়। তাঁর জীবনী কুয়াশাচ্ছন্ন। তাঁর পিতা মাতার পরিচয় অজ্ঞাত। তিনি পেশায় দাস বা গৃহভৃত্য ছিলেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রভুর ভৎর্সনা সহ্য করতে না পেরে সন্ন্যাস জীবন অবলম্বন করেন। তাঁর ব্যক্তিগত নাম ছিল অজিত।[২৫] সুমঙ্গলবিলাসিনী[২৬] গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, সন্ন্যাস অবলম্বন করার পর সব সময় মনুষ্য কেশ নির্মিত কম্বল পরিধান করতেন বলে তিনি অজিত কেশকম্বলি নামে পরিচিতি লাভ করেন। কম্বলখানি শীতকালে শীতল, গরমকালে গরম থাকত এবং এটি দুর্গন্ধযুক্ত ও কুৎসিত ছিল। এছাড়া, তিনি সব সময় মস্তক মুণ্ডন করতেন। তাঁরও অনেক শিষ্য ছিলেন। তিনি ছিলেন উচ্ছেদবাদী। বস্তুবাদী এবং নাস্তিক

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবেও তিনি পরিচিত ছিলেন।[২৭] সংযুক্ত নিকায়[২৮] গ্রন্থে তাঁকে তীর্থিক, গণনায়ক, গুণবান এবং জনগনের শ্রদ্ধার পাত্র হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। সামঞ্ঞফল বা শ্রামণ্যফল সূত্র অনুসারে তিনি মগধরাজ অজাতশত্রুর সমসাময়িক ছিলেন। মহাবোধিজাতক (V. p. 246) পাঠে জানা যায়, বুদ্ধ পূর্বজন্মেও অজিত কেশকম্বলির মতাদর্শন খণ্ডন করেছিলেন। সংযুক্ত নিকায়[২৯] সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি বুদ্ধ অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ ছিলেন। কারণ কোশলরাজ প্রসেনজিত তাঁর সঙ্গে তুলনা করে বুদ্ধকে তরুণ সন্ন্যাসী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

৩.৩.১. অজিত কেশকম্বলি মতবাদ

"দান, যজ্ঞ, হোম প্রভৃতি দ্বারা পূণ্য অর্জিত হয় না। ভাল-মন্দ কোনো কর্মই ফল প্রদান করে না। ইহলোক এবং পরলোক নেই। মাতা, পিতা কিংবা ঔপপাতিক (মাতা পিতার সংযোগ উৎপন্ন) প্রাণীর অস্তিত্ব নেই। ইহলোক এবং পরলোক সর্ম্পকে শিক্ষা দিতে পারে এমন তত্ত্বজ্ঞ ও সত্য পথের সন্ধান দাতা শ্রমণ ব্রাহ্মণ এই পৃথিবীতে নেই। মানুষ চার মহাভূতে গড়া। মৃত্যুর পর সে চার মহাভূতেই মিশে যায় এবং শরীর নষ্ট হয়ে গেলে বুদ্ধিমান ও মূর্খ উভয়েরই উচ্ছেদ হয়। মৃত্যুর পর তাদের অশেষ কিছুই থাকেনা।"[৩০]

উপর্যুক্ত দর্শন পর্যালোচনা করে বলা যায়, অজিত কেশকম্বলির দর্শন বা অভিমতের সঙ্গে চার্বাক দর্শনের সাদৃশ্য রয়েছে। তিনি যাগ-যজ্ঞ, তপস্যা, ব্রত প্রভৃতি মানতেন না। এতে তিনি যে উচ্ছেদবাদী এবং নাস্তিক ছিলেন তা অনুমান করা যায়। ধর্মানন্দ কোসাম্বী[৩১] মনে করেন, অজিত কেশকম্বলির এই দার্শনিক তত্ত্ব হতেই লোকায়ত অর্থশাস্ত্রের বিকাশ ঘটেছিল।

৩.৪. আর্চায পুকুধ কচ্চায়ণ

সামঞ্ঞফল[৩২] সূত্রানুসারে তিনি রাজা অজাত শত্রুর সমসাময়িক ছিলেন। বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁকে ককুধ কচ্চায়ন নামেও উল্লেখ করা হয়েছে। কিংবদন্তি মতে, তিনি ব্রাহ্মণ বংশে কোনো এক বিধবার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। পকুধ বৃক্ষমূলে তাঁর জন্ম হয়েছিল বিধায় তিনি পুকুধ কচ্চায়ন নামে পরিচিতি লাভ করেন।[৩৩] অন্যমতে, তাঁর গলদেশে একটি কুঁজ ছিল বলে তিনি পকুদ কচ্চায়ন নামে অভিহিত হন।[৩৪] বুদ্ধঘোষের[৩৫] মতে, 'পকুধ' ছিল তাঁর প্রকৃত নাম এবং 'কচ্চায়ন' ছিল পারিবারিক বা গোত্রের নাম। এ কারণে ধারণা করা হয় যে, তিনি ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। জানা যায় যে, তাঁকে এক ব্রাহ্মণ

Dhaka University Institutional Repository

লালন পালন করতেন। ব্রাহ্মণের মৃত্যুর পর তিনি জীবিকা নির্বাহের জন্য কোনো উপায় না পেয়ে সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। সংযুক্ত নিকায়[৩৬] মতে, তাঁর অনেক অনুসারী ছিলেন। সমসাময়িক কালের অন্যান্য সংঘের চেয়ে তাঁর সংঘ বেশ বড় ছিল। কিন্তু বুদ্ধের পরবর্তীকালে সেই সংঘের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়। সুমঙ্গল বিলাসিনী[৩৭] গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, তিনি সবসময় গরম জল ব্যবহার করতেন এবং ঠাণ্ডা জল এড়িয়ে চলতেন। গরম জল পাওয়া না গেলে তিনি শরীর ধৌত করতেন না। মজ্ঝিমনিকায়ের সন্দক সূত্রে[৩৮] তাঁর দর্শনের উল্লেখ পাওয়া যায়। মজ্ঝিম নিকায়ে[৩৯] উল্লেখ আছে যে, বুদ্ধের শিষ্যগণ বুদ্ধকে যেভাবে শ্রদ্ধা করতেন পুকধ কচ্চায়নের শিষ্যগণ তাঁকে সেরূপ শ্রদ্ধা করতেন না। তিনি প্রশ্ন করা পছন্দ করতেন না। প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে তিনি বিরক্ত হতেন। সংযুক্ত নিকায়ে[৪০] তিনি গণচার্য, খ্যাতিবান এবং জনগণের শ্রদ্ধার পাত্র হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ গ্রন্থে আরো উল্লেখ আছে যে, তাঁর বহু সংখ্যক অনুসারী ছিল। সামঞ্ঞফল সূত্রে[৪১] তাঁকে বস্তুবাদী হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

৩.৪.১. পকুধ কচ্চায়নের মতবাদ

" ক্ষিতি, অপ, তেজ, বায়ু, সুখ, দুঃখ এবং জীব – এ সাতটি বস্তু অকৃত, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, উৎপাদিকাশক্তিহীন, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ, গতিহীন, বিকারহীন, পরিবর্তনহীন। এদের হন্তা নেই, ঘাতয়িতা নেই, জ্ঞাতা নেই, ব্যাখ্যাতা নেই। এগুলো পরস্পর বিরোধিতা করে না। পরস্পরের সুখ, দুঃখে হেতু হয় না। যদি কেউ ধারালো অস্ত্র দিয়ে মাথা কাটে, তাহলেও তার মৃত্যু হয় না। শুধু এই সাতটি পদার্থের মধ্যে যে ফাঁকা জায়গা আছে তার মধ্যে অস্ত্রটি প্রবেশ করে –এরকম বুঝতে হবে।"[৪২]

পুকুধ কচ্চায়নের মতবাদকে অন্যোন্যবাদ বলা হয়। তাঁর ধর্ম দর্শনের সঙ্গে বৈশেষিক দর্শনের কিছুটা সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। তবে তাঁর বর্ণিত সাতটি পদার্থের সঙ্গে বৈশেষিক দর্শনের সাতটি পদার্থের সামান্য বৈসাদৃশ্য রয়েছে। বৈশেষিক দর্শনের সাতটি পদার্থ হচ্ছে : দ্রব্য গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় এবং অভাব। বৈশেষিকরা দ্বৈতবাদী। তাঁরা ঈশ্বর এবং পরমাযু উভয়ের সহাবস্থানের কথা স্বীকার করে কিন্তু পুকুধ কচ্চায়নের দর্শনে বর্ণিত সাতটি পদার্থ স্বয়ং উদ্ভূত এবং ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক বর্জিত।[৪৩]

৩.৫. আচার্য নিগণ্ঠনাথ পুত্র

তিনি জৈনধর্মের প্রবর্তক ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহাবীর বলে ধারণা করা হয়।[৪৪] কথিত আছে যে, তিনি প্রথমে পার্শ্বনাথের শিষ্য ছিলেন। কিন্তু তিনি পার্শ্বনাথের ন্যায় নগ্ন সন্ন্যাসী ছিলেন না। তিনি শ্বেতবস্ত্র পরিধান

Dhaka University Institutional Repository

করতেন। তিনি প্রধানত রাজগৃহ, চম্পা, বৈশালী ও পাবা প্রভৃতি অঞ্চলে ধর্ম প্রচার করেন। তবে তাঁর জীবনী অস্পষ্ট। সুত্তনিপাত অট্‌ঠকথা[৪৫] মতে, তিনি নাথ নামক এক কৃষকের পুত্র ছিলেন। মালালাসেকেরার মতে, 'নাথ' ছিল তাঁর গোত্রের নাম। তিনি নির্গ্রন্থ নামেও খ্যাত ছিলেন। তিনি বলতেন, "এমন কোনো গ্রন্থ নেই যা আমি পড়িনি।"এ কারণে এবং সকল ক্লেশাদি ছিন্ন করে সিদ্ধ হয়েছিলেন বলে তিনি নির্গ্রন্থ বা নিগণ্ঠ অভিধায় ভূষিত হয়েছিলেন। তিনি বৈশালীর অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পাঁচশত শিষ্য এবং বহু সংখ্যক অনুসারী ছিল বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।[৪৬] মজ্ঝিম নিকায়ে[৪৭] উল্লেখ আছে যে, তাঁরা মুক্তিলাভের জন্য কঠোর কৃচ্ছতা সাধন করতেন। ক্ষুদ্রদুঃখস্কন্ধ সূত্রে বুদ্ধ এবং তাঁর সম্প্রদায়ের কতিপয় শিষ্যের কথোপকথন বিশ্লেষণ করলে এ অভিমতের সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায়। এ সূত্রে উল্লেখ আছে, একদা রাজগৃহে কয়েক জন নির্গ্রন্থ দণ্ডায়মান অবস্থায় তপস্যা করেছিলেন। এমন সময় বুদ্ধ তাঁদের নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, "হে বন্ধুগণ, এভাবে তোমরা নিজের শরীরকে কষ্ট দিচ্ছ কেন?" উত্তরে তাঁরা বলেন, "নিগণ্ঠনাথপুত্র সবর্জ্ঞ। তিনি বলেন, চলার সময়, দাঁড়ানো থাকা অবস্থায়, ঘুমানোর সময় অথবা জাগ্রত অবস্থায় আমার জ্ঞানদৃষ্টি অক্ষুন্ন থাকে।" তিনি আমাদের উপদেশ স্বরূপ আরো বলেন, "হে নির্গ্রন্থগণ! তোমরা পূর্বজন্মে পাপ করেছ, তা এরূপ কৃচ্ছতা সাধনে জীর্ণ কর এবং এই জন্মে কায়-মনো-বাক্যে কোনো রকম পাপ করো না। এভাবে পূর্বজন্মের পাপ তপস্যার দ্বারা নাশ হওয়ায় ও নতুন পাপ না হওয়ায় আগামী জন্মে কর্মক্ষয় হবে। আর তাতে সর্ব দুঃখের অবসান হবে।"[৪৮] নিগণ্ঠনাথ পুত্র ছিলেন চতুর্যাম সংবরবাদী। জৈন গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, পার্শ্বমুনি অহিংসা সত্য, অস্তেয় ও অপরিগ্রহ - এ চারটি যামের শিক্ষা দিয়েছিলেন। বুদ্ধের সময়কালে নির্গ্রন্থদের এই চারটি যামের বিশেষ গুরুত্ব ছিল।[৪৯] বাবেরুজাতেক (III. p. 126ff) উল্লেখ আছে যে, অতীতের এক জন্মে তিনি কাক হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন। সে সময় বোধিসত্ত্ব ময়ূর রূপে জন্ম গ্রহণ করেন। বোধিসত্ত্বরূপী ময়ূরের আগমনে তার সকল সকল লাভ ঐশ্বর্য নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

৩.৫.১. নিগণ্ঠনাথ পুত্রের মতবাদ

"সর্বপ্রকার জলের ব্যবহারে সংযত, সর্বপাপে সংযত, সর্বপাপ বিধৌত এবং সর্বপাপ দূরীকরণে একাগ্র চিত্ত হওয়া উচিত। নির্গ্রন্থ এই চারটি সংবর দ্বারা সংযত। সে কারণে তিনি গতাত্মা, যথাত্মা এবং স্থিতাত্মা।"[৫০]

Dhaka University Institutional Repository

৩.৬. আচার্য সঞ্জয় বেলট্ঠপুত্র

বেলাস্থি নামক এক দাসীর গর্ভে জন্ম হয় বলে তিনি 'বেলট্ঠ বা বেলাস্থি পুত্র' নামে পরিচিত ছিলেন।[৫১] তাঁর মাথায় সঞ্চ ফলের ন্যায় মাংসপিণ্ড থাকায় তিনি সঞ্জয় বেলটঠপুত্র নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। সুমঙ্গল বিলাসিনী[৫২] গ্রন্থে তাঁর পিতার নাম বেলট্ঠ ছিল বলে উল্লেখ আছে। দিব্যাবদান[৫৩] গ্রন্থে তাঁকে সঞ্জয় বৈরাটিপুত্র নামে অভিহিত করা হয়েছে। তাঁরও অনেক শিষ্য এবং অনুসারী ছিলেন। তিনি বিক্ষেপবাদীর ন্যায় আচরণ করতেন। কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলতেন, "এরূপ আমি বলি না, সেরূপও আমি বলি না, অন্যথাও আমি বলি না।"[৫৪] এরূপ উত্তর দিয়ে তিনি বাক্য বিক্ষেপ করতেন। মিথ্যা বলার ভয় থেকে তিনি এরূপ বলতেন। বুদ্ধের সমকালীন ছয়টি সংঘ প্রধানের মধ্যে মগধরাজ অজাতশত্রু তাঁকে সবচেয়ে বেশি অজ্ঞানী মনে করতেন। বিনয়পিটক[৫৫] সাক্ষ্য দেয় যে, বুদ্ধের অন্যতম শিষ্য সারিপুত্র এবং মৌদ্গল্যায়ন প্রথমে সঞ্জয় বেলট্ঠপুত্রের শিষ্য ছিলেন। পরবর্তীতে তাঁরা দুইশত পঞ্চাশজন সঙ্গীসহ বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁরা যখন সঞ্জয়কে পরিত্যাগ করে চলে যাচ্ছিলেন তখন তিনি রক্তবমি করেন এবং তাঁর শরীর ফ্যাকাশে হয়ে যায়। সারিপুত্র এবং মৌদগল্যায়ন তাঁকে বুদ্ধের ধর্মে দীক্ষা দেওয়ার জন্য বহু চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁরা ব্যর্থ হন।

৩.৬.১. সঞ্চয় বেলট্ঠপুত্রের মতবাদ

"পরলোক আছে কি? আমাকে এরূপ জিজ্ঞাসা করলে যদি আমার মনে হয় যে তা আছে, তাহলে আমি বলবো পরলোক আছে। কিন্তু আমার সে রকম মনে হয় না। পরলোক নেই এরকমও মনে হয় না। ঔপপাতিক প্রাণী আছে বা নেই, মরণের পর তথাগত থাকেন কিংবা থাকেন না, সুকৃত বা দুষ্কৃত কর্মের ফল আছে বা নেই, সত্ত্বগণ মৃত্যুর পর বিদ্যমান থাকে বা থাকেনা - এসব আমার কিছুই মনে হয় না।"[৫৬]

৪. বুদ্ধের সমকালীন দার্শনিক মতবাদ

বুদ্ধের সমকালীন এই ছয়টি শ্রমণ সংঘের ধর্মমত ছাড়া ত্রিপিটকের অন্তর্গত দীর্ঘনিকায়ের ব্রহ্মজাল সূত্রে বুদ্ধের পূববর্তী এবং সমকালীন সময়ে প্রচলিত ধর্ম-দর্শনের বর্ণনা দৃষ্ট হয়। পণ্ডিতগণ মনে করেন, এই সূত্রে বুদ্ধের পূর্ববতী সকল ধর্মের দার্শনিক তত্ত্ব ও বাণী অন্তনির্হিত আছে। তাই এ সূত্রটি প্রাক বৌদ্ধযুগীয় ধর্ম ও দর্শনের দর্পণ হিসেবে পরিচিত।[৫৭] এ সূত্রে আত্মা ও জীব সম্পর্কে সকল প্রকার ধারণা লাভ করা যায়। টি. ডব্লিউ. রীচ ডেবিড্স এবং উইলিয়াম স্টিড[৫৮] 'ব্রহ্মজাল' শব্দের অর্থ করেছেন উত্তম জাল,

পরিপূর্ণ জাল অথবা পরিশুদ্ধ জাল। জলাশয়ে জাল বিস্তার করার পর যেভাবে জলাশয়ে বিচরণরত সমস্ত প্রাণী জালের আবেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ হয়, ঠিক সেভাবে এ সূত্রে বুদ্ধের পূর্ববর্তী এবং সমকালীন সময়ে প্রচলিত সমস্ত ধর্মীয় মতবাদ গথিত আছে। তাই এ সূত্রটিকে ব্রহ্মজাল সূত্র বলা হয়। বৌদ্ধধর্ম ব্যতীত বুদ্ধের সমকালীন সময়ে প্রচলিত দার্শনিক মতবাদসমূহকে ব্রহ্মজাল সূত্রে বাষট্টিভাবে বিভক্ত করা হয়েছে। জাতকে এসব দার্শনিক তত্ত্ব বিক্ষিপ্তভাবে পাওয়া যায়। নিম্নে বুদ্ধের সমকালীন সময়ে প্রচলিত ধর্ম-দর্শন উপস্থাপন করা হলো।

৪.১. বুদ্ধের সমসাময়িককালে প্রচলিত বাষট্টি প্রকার দার্শনিক মতবাদ

৪.১.১. পূর্বান্তকল্পিক : ১৮ প্রকার[৫৯]

(১) শাশ্বতবাদ : ৪ প্রকার

(২) একাংশ শাশ্বতবাদ : ৪ প্রকার

(৩) অন্তানন্তবাদ : ৪ প্রকার

(৪) অমরাবিক্ষেপবাদ : ৪ প্রকার

(৫) অধীত্যসমুৎপাদবাদ : ২ প্রকার

৪.১.২. অপরান্তকল্পিক : ৪৪ প্রকার

(১) ঔদ্ধাঘাতনিকা : ৩২প্রকার

(২) উচ্ছেদবাদ : ৭ প্রকার

(৩) দৃষ্টধর্মনির্বাণবাদ : ৫ প্রকার

৪.১.১. পূর্বান্তকল্পিক

পূর্বান্ত কল্পনাকারিগণ রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান –এই পাঁচটি বিষয়ের বা এদের যে কোনো একটিকে তৃষ্ণাজনিত দৃষ্টিতে আত্মা এবং লোক (পৃথিবী) বলে ধারণা করে। তাঁরা আত্মা এবং জগতকে শাশ্বত, নিত্য এবং ধ্রুব বলে গ্রহণ করেন। এই মতবাদের অনুসারীরা পাঁচটি প্রধানভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রথম চারটি ভাগের প্রতিটি ভাগ ৪ প্রকার এবং শেষ ভাগটি ২ প্রকার দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন। এভাবে তাঁরা ১৮ প্রকার মতবাদে বিশ্বাসী।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১.১.১. শাশ্বত বাদ[৬০]

'শাশ্বত' অর্থ নিত্য, ধ্রুব এবং অপরিবর্তনীয়। আত্মা এবং লোককে যাঁরা এ মত দিয়ে গ্রহণ করে তাঁরা শাশ্বতবাদী। তাঁদের ধারণা "আত্মা ও জগৎ শাশ্বত। এ গুলো বন্ধ্যা, কুটস্থ নগর তোরণের স্তম্ভের মত স্থির।" শাশ্বতবাদীরা চারটি কারণ প্রয়োগে আত্মা এবং লোক বা জগতকে শাশ্বত বলে ধারণা করেন। তাঁরা প্রবলতম বীর্যে, একনিষ্ট সাধনায় অদম্য চেষ্টাশীলতায়, সম্যকভাবে মনোনিবেশপূর্বক সমাধি লাভ করেন। অতঃপর সেই আধ্যাত্মিক সাধনা দিয়ে অর্জিত জ্ঞানে আত্মা এবং জগৎ-কে শাশ্বত হিসাবে গ্রহণ করেন।

৪.১.১.২. একাংশ শাশ্বতবাদ

এই মতের অনুসারীগণ আত্মা এবং জগতের একাংশ শাশ্বত এবং অপরাংশ অশাশ্বত বলে বিশ্বাস করেন। তাঁদের অভিমত, "তিন প্রকার দেবতার মধ্যে এক প্রকার দেবতা শাশ্বত ও অপরিবর্তনশীল। অপর সকল প্রাণী অপরিণামধর্মী। তাঁরা আরো বলেন, কেবল চিত্ত বা মন বা বিজ্ঞানই অপরিবর্তনীয়, শরীরের অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গসমূহ পরিবর্তনশীল। কালের গতিতে সব বিষয়বস্তুর পরিবর্তন হয়। একাংশ শাশ্বতবাদ চারভাগে বিভক্ত : ১. আভাস্বর ২. ক্রীড়া প্রদোষিক ৩. মনোপ্রদোষিক এবং ৪. তার্কিক ।[৬১] তার্কিকেরা তর্কের মাধ্যমে অভিমত পোষণ করেন যে,'আত্মা শাশ্বত, অপরিবর্তনীয়, স্থির। শরীরের অন্যান্য অংশ অশাশ্বত।'

৪.১.১.৩. অন্তানন্তবাদ

এই মতবাদীরা চার প্রকার কারণ প্রয়োগে লোক বা জগতকে সান্ত (সসীম) এবং অনন্ত বলে প্রচার করেন। তাঁরা পৃথিবীকে ধ্যানের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে বলেন, "পৃথিবী গোল, বেশ বিস্তৃত এবং উঁচু নীচু।" এই মতবাদীরা কোনো কোনো সময় যুক্তির খাতিরে অন্ত, কোনো কোনো সময় অনন্ত বাদের পক্ষে মত পোষণ করেন। তাঁরা চার ভাগে বিভক্ত। এঁদের মধ্যে যারা পৃথিবীকে ধ্যানের বিষয় হিসাবে গ্রহণ করেন এবং ধ্যান চিত্তকে পৃথিবীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন তাঁরা বলেন "পৃথিবী গোল এবং সান্ত"। যাঁরা ধ্যান চিত্তকে পৃথিবীতে সীমাবদ্ধ না রেখে অনন্তায়তন ভাবনা করেন তাঁরা বলেন, "পৃথিবী অনন্ত এবং বেশ বিস্তৃত।" যাঁরা চিত্তকে উর্ধ্ব-অধঃ ভাবনায় নিবিষ্ট রাখেন তাঁরা বলেন, "পৃথিবী উঁচু-নীচু এবং সান্ত। কিন্তু আড়াআড়িভাবে অসীম।" অন্যরা কেবল তর্কের খাতিরেই বলেন, "পৃথিবী হয় সসীম না হয় অসীম।"[৬২]

Dhaka University Institutional Repository

৪.১.১.৪. অমরা বিক্ষেপবাদ

এই মতবাদের অপর নাম সংশয়বাদ। এই মতের অনুসারীরা ভাল মন্দ কোনোটার পক্ষে মত পোষণ করতে দ্বিধাবোধ করেন। তাঁরা মনে করেন, ভালোর পক্ষে মত প্রকাশ করলে এক দল অসন্তুষ্ট হতে পারে। আবার মন্দের পক্ষে মত প্রকাশ করলে অন্যদল অসন্তুষ্ট হতে পারে। পণ্ডিত ব্যক্তিদের দ্বারা নিন্দিত হবার ভয়েও তাঁরা সুস্পষ্টভাবে মতামত ব্যক্ত করেন না। তাদের সংশয় কখনোই দূর হয় না। দীর্ঘনিকায়ের ব্রহ্মজাল সূত্রে তাঁদের সংশয়ের চারটি কারণ উল্লেখ পাওয়া যায়। কারণগুলো হল : ১. যথার্থ জ্ঞানের অভাব ২. বিদ্বেষ বা ঝগড়া বৃদ্ধির ভয় ৩. জ্ঞানী ব্যক্তিদের দ্বারা নিন্দিত হবার ভয় এবং ৪. অভিজ্ঞতার অভাব।[৬৩]

৪.১.১.৫. অধীত্যসমুৎপন্নবাদ

"অধীত্যসমুৎপন্ন" শব্দের অর্থ হেতু প্রত্যয় বা কারণ ব্যতীত উদ্ভব। "লোক বা জগৎ বা অন্যান্য সবকিছু অকারণের উদ্ভব" – এরূপ দর্শনই অধীত্যসম্যুৎপন্নবাদ। যাঁরা এরূপ মতবাদে বিশ্বাসী তাঁরা অধীত্যসমুৎপন্নবাদী নামে খ্যাত। ইহা বৌদ্ধ প্রতীত্যসমুৎবাদ তত্ত্বের বিপরীত দর্শন। অধীত্যসমুৎপন্নবাদীদের অভিমত "আত্মা এবং জগৎ সৃষ্টির কোন কার্যকারণ সম্পর্ক নেই । অহেতুক বা অকারণবশত ইহা উৎপন্ন হয়েছে।" এই মতবাদীদের অনেকেই আবার বলেন, "অরূপ হতে রূপের সৃষ্টি। জগৎ সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্ম ছিল অসৎ (অবিদ্যমান)।" আবার কেউ কেউ মনে করেন, "আদিম জীব সৎও ছিল না , অসৎও ছিল না। সমস্ত জীব জগৎ সেই আদিম পুরুষ হতে উৎপন্ন হয়েছে।"[৬৪]

৪.১.২. অপরান্তকল্পিক

এই মতবাদীরা রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান – এই পাঁচটি বিষয় বা এদের যে কোনো একটিকে তৃষ্ণাজনিত দৃষ্টিতে আত্মা এবং জগৎ হিসেবে ধারণা করেন। এ মতবাদের অনুসারীরা তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রথমটি ৩২ প্রকার, দ্বিতীয়টি ৭ প্রকার এবং তৃতীয়টি ৫ প্রকার মতবাদে বিশ্বাসী। এভাবে অপরান্তকল্পিক এর অনুসারীরা ৪৪ মতাদর্শ অনুসরণ করেন।[৬৫]

৪.১.২.১. ঔদ্ধঘাতনিকা [৬৬]

"আঘতন"শব্দের অর্থ মৃত্যু, চ্যুতি বা লয়। মৃত্যুর উর্ধ্বে অর্থাৎ মৃত্যুর পর আত্মা নির্বিকার – এরূপ মতবাদ উদ্ধাঘাতনিকা নামে পরিচিত। এই মতবাদীরা তিন ভাগে বিভক্ত । যথা : ১. সংজ্ঞাবাদী ২. অসংজ্ঞাবাদী এবং ৩. নৈবসংজ্ঞা না সংজ্ঞীবাদী।

ঔদ্ধাঘাতনিক সংজ্ঞাবাদীরা ষোল প্রকার কারণ প্রয়োগে আত্মাকে মৃত্যুর পর নিত্য সংজ্ঞাশীল বলে নির্দেশ করেন। তাঁদের দর্শন হচ্ছে :

১. মরণের পর রূপী বটে, কিন্তু সর্বদা সংজ্ঞাযুক্ত।

২. মরণের পর আত্মা অরূপী, কিন্তু সর্বদা সংজ্ঞাযুক্ত।

৩. মরণের পর আত্মা রূপী-অরূপী উভয়ই, কিন্তু সর্বদা সংজ্ঞাযুক্ত।

৪. মরণের পর আত্মা না রূপী, না অরূপী, কিন্তু সর্বদা সংজ্ঞাযুক্ত।

৫. মরণের পর আত্মা সান্ত, কিন্তু সর্বদা সংজ্ঞাযুক্ত।

৬. মরণের পর আত্মা অনন্ত, কিন্তু সর্বদা সংজ্ঞাযুক্ত।

৭. মরণের পর আত্মা সান্ত-অনন্ত উভয়ই, কিন্তু সর্বদা সংজ্ঞাযুক্ত।

৮. মরণের পর আত্মা না সান্ত, না অনন্ত কিন্তু সর্বদা সংজ্ঞাযুক্ত।

৯. মরণের পর আত্মা বহুরূপী বা নানা, কিন্তু সর্বদা সংজ্ঞাযুক্ত।

১০. মরণের পর আত্মা প্রমাণ, কিন্তু সর্বদা সংজ্ঞাযুক্ত।

১১. মরণের পর আত্মা অপ্রমাণ, কিন্তু সর্বদা সংজ্ঞাযুক্ত।

১২. মরণোর পর আত্মা একান্ত দুঃখী, কিন্তু সর্বদা সংজ্ঞাযুক্ত।

১৩. মরণের পর আত্মা সুখী, দুঃখী, কিন্তু সর্বদা সংজ্ঞাযুক্ত।

১৪. মরণের পর আত্মা না সুখী, না দুঃখী, কিন্তু সর্বদা সংজ্ঞাযুক্ত।

১৫. মরণের পর আত্মা না সুখী দুঃখী উভয় প্রকার সংজ্ঞাযুক্ত।

১৬. মরণের পর আত্মা না সুখী, না দুঃখী উভয় প্রকার সংজ্ঞাযুক্ত।

ঔদ্ধাঘাতনিকা অসংজ্ঞীবাদীরা আট প্রকার কারণ প্রয়োগে মৃত্যুর পর বা আত্মা নির্বিকার অসংজ্ঞী বলে মত প্রকাশ করেন। তাঁদের দর্শন হচ্ছে :

১. মরণের পর আত্মা রূপী, কিন্তু সর্বদা অসংজ্ঞাশীল।

২. মরণের পর আত্মা অরূপী , কিন্তু সর্বদা অসংজ্ঞাশীল।

৩. মরণের পর আত্মা রূপী-অরূপী উভয়ই, কিন্তু মর্বদা অসংজ্ঞাশীল।

৪. মরণের পর আত্মা না রূপী, না অরূপী, কিন্তু সর্বদা অসংজ্ঞাশীল ।

৫. মরণের পর আত্মা সান্ত, কিন্তু সর্বদা অসংজ্ঞাশীল।

৬. মরণের পর আত্মা অনন্ত, কিন্তু সর্বদা অসংজ্ঞাশীল।

৭. মরণের পর আত্মা সান্ত-অনন্ত উভয়ই, কিন্তু সর্বদা অসংজ্ঞাশীল।

৮. মরণের পর আত্মা না সান্ত, না অনন্ত, কিন্তু সর্বদা অসংজ্ঞাশীল।

ঔদ্ধাঘাতনিক নৈবসংজ্ঞী না সংজ্ঞাবাদীরা আট প্রকার কারণ প্রয়োগে মৃত্যুর পর আত্মা নৈবসংজ্ঞী না সংজ্ঞী বলে মত প্রকাশ করেন । তাঁদের দর্শন হচ্ছে :

১. মরণের পর আত্মা রূপী, কিন্তু নৈবসংজ্ঞী না সংজ্ঞী।

২. মরণের পর আত্মা রূপী-অরূপী উভয়ই, কিন্তু নৈবসংজ্ঞী না সংজ্ঞী।

৩. মরণের পর আত্মা না রূপী, না অরূপী, কিন্তু নৈবসংজ্ঞী না সংজ্ঞী ।

৪. মরণের পর আত্মা সান্ত, কিন্তু নৈবসংজ্ঞী না সংজ্ঞী ।

৫. মরণের পর আত্মা অনন্ত, কিন্তু নৈবসংজ্ঞী না সংজ্ঞী।

৬. মরণের পর আত্মা না সান্ত, না অনন্ত, কিন্তু নৈবসংজ্ঞী না সংজ্ঞী।

৪.১.২.২. উচ্ছেদবাদ [৬৭]

উচ্ছেদবাদীরা বলেন, "পাপ পুণ্যের কোনো ভেদাভেদ নেই। ভাল মন্দ কেবল ইহলোকে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকার জন্য। মৃত্যুর পর মানুষের কোনো প্রকার অস্তিত্ব থাকে না।" তাঁরা সাতটি কারণ প্রয়োগে বিদ্যমান সত্ত্বের আত্মার বিচ্ছেদ, বিনাশ এবং বিভব নির্দেশ করেন। তাঁদের দর্শন হচ্ছে :

১. দেহাত্মারূপী, চতুর্মহাভুতিক এবং মাতৃ পিতৃজাত। সেই কারণে দেহ ভিন্ন হলে উচ্ছিন্ন হয়, বিনাশ হয়। মৃত্যুর পর আর উৎপন্ন হয় না ।

২. অন্য আত্মা আছে, যা দিব্য রূপী, কামবিহারী, গ্রাস বশে আহার ভোগী। দেহ ভিন্ন হলে সে আত্মা উচ্ছিন্ন, বিনষ্ট হয় এবং মৃত্যুর পর আর উৎপন্ন হয় না ।

৩. অন্য আত্মা আছে, যা দিব্য রূপী, মনোময়, সর্ব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পন্ন এবং পরিপূর্ণেন্দ্রিয়। দেহ ভিন্ন হলে সে আত্মা উচ্ছিন্ন, বিনষ্ট হয়। মৃত্যুর পর আর উৎপন্ন হয় না ।

৪. অন্য আত্মা আছে, যা সর্ব প্রকার রূপ, সংজ্ঞা সম্যকভাবে অতিক্রম করে প্রতিঘ সংজ্ঞার বিলয় করত নানাত্ব সংজ্ঞার মনস্কার পরিহার পূর্বক অনন্ত আকাশ বলে ভাবনা করত আকাশনান্তায়ন ভাবনা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু দেহ ভিন্ন হলে সে আত্মা উচ্ছিন্ন হয়, বিনষ্ট হয়। মৃত্যুর পর আর উৎপন্ন হয় না ।

৫. অন্য আত্মা আছে, যা বিজ্ঞানন্তায়তন স্তর প্রাপ্ত হয়, সেহেতু দেহ ভিন্ন হলে উচ্ছিন্ন হয়, বিনষ্ট হয়। মৃত্যুর পর আর উৎপন্ন হয় না ।

৬. অন্য আত্মা আছে, যা অকিঞ্চায়তন সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু দেহ ভিন্ন হলে সে আত্মা উচ্ছিন্ন হয়, বিনষ্ট হয়। মৃত্যুর পর আর উৎপন্ন হয় না ।

৭. অন্য আত্মা আছে, যা নৈবসংজ্ঞা না সংজ্ঞা স্তর প্রাপ্ত হয়, কিন্তু দেহ ভিন্ন হলে সে আত্মা উচ্ছিন্ন হয়, মৃত্যুর পর আর উৎপন্ন হয় না ।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১.২.৩. দৃষ্টধর্ম নিবার্ণবাদ[৬৮]

‘দৃষ্টধর্ম’ শব্দের অর্থ হচ্ছে বর্তমান দেহ। যাঁরা বর্তমান দেহে নির্বাণ প্রাপ্তি বা প্রত্যক্ষ উপশমে বিশ্বাস করেন তাঁরা দৃষ্টধর্ম নিবার্ণবাদী নামে অভিহিত। তাঁদের দর্শন ‘দৃষ্টধর্ম নির্বাণবাদ’ নামে পরিচিত। তাঁরা পাঁচ প্রকার কারণ প্রয়োগে দৃষ্টধর্ম বিদ্যমান সত্ত্বের পরম নির্বাণ প্রাপ্তি প্রজ্ঞপ্তি করেন। পাঁচটি কারণসম্ভূত তাঁদের দর্শন হচ্ছে :

(১) পাঁচ প্রকার কাম্যবস্তু পরিভোগ করত আত্মা পরিতৃপ্ত হলে ইহজীবনে বা বর্তমান দেহে নির্বাণ প্রাপ্ত হয়।

(২) আত্মা বির্তক, বিচার, সমাধিজাত প্রীতি সুখ, একাগ্রতা সমন্বিত প্রথম ধ্যান প্রাপ্ত হয়ে বিহার করলে দৃষ্টধর্মে নির্বাণ প্রাপ্ত হয়।

(৩) আধ্যাত্মিক সাধনা সমন্বিত চিত্তের একাগ্রতার সঙ্গে অবির্তক, অবিচার, সমাধিজাত প্রীতিসুখ সমন্বিত দ্বিতীয় ধ্যান প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করত আত্মা দৃষ্টধর্মে পরম নির্বাণ প্রাপ্ত হয়।

(৪) প্রীতি বর্জিত উপেক্ষা একাগ্রতার সঙ্গে স্মৃতিশীল এবং জ্ঞান সমন্বিত হয়ে কায়িক সুখানুভব করতঃ আত্মা দৃষ্টধর্মে নির্বাণ প্রাপ্ত হয়।

(৫) আত্মা সুখ দুঃখ উপেক্ষা করে একাগ্রতার দ্বারা স্মৃতি পরিশুদ্ধ চতুর্থ ধ্যান প্রাপ্ত হয়ে বিরাজ করলে দৃষ্টধর্মে নির্বাণ প্রাপ্ত হয় ।

৫. অন্যান্য দার্শনিক সম্প্রদায় ও আচার-অনুষ্ঠান

উপরে বর্ণিত দার্শনিক সম্প্রদায় ছাড়াও মহাবোধিজাতকে (V. p. 227) আরো কিছু দার্শনিক সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : অহেতুবাদী, ঈশ্বরকারণবাদী, পূর্বকৃতবাদী, একনায়কত্ববাদী, উচ্ছেদবাদী, ক্ষাত্রবিদ্যাবাদী (খত্ত বা খেত্তবিজ্জাবাদী) এবং নিমিত্তবাদী। মহামঙ্গলজাতকে (IV. p. 72) কাল বা সময়বাদী নামে আরো একটি মতবাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাবোধিজাতক পাঠে জানা যায় যে, অহেতুবাদীগণ ‘সবকিছু হেতু ছাড়া অহেতুক উৎপন্ন হয় এবং পুনর্জন্ম লাভ করে শুদ্ধি লাভ করা যায়’- এরূপ লোকদের শিক্ষা দিতেন। ঈশ্বরকারণবাদীদের দর্শন হচ্ছে, ‘সব কিছু ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট’। পূর্বকতৃবাদীদের দর্শন হচ্ছে, ‘সবকিছু পূর্বে কৃত হয়েছে এবং জীবের যে দুঃখ হয় তা পূর্বজন্মকৃত ফল’। একনায়কত্ববাদীরা মনে করেন, স্বীয় ইচ্ছায় সবকিছু করা যায়। উচ্ছেদবাদীরা মনে করেন, ‘কেহ ইহলোক হতে পরলোকে যায় না, ইহলোকে সব বিনষ্ট হয়ে যায়’।

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষাত্রবিদ্যাবাদীরা শিক্ষা দিতেন, 'মাতাপিতাকেও নিধন করে স্বার্থসিদ্ধি করা যায়। নিমিত্তবাদীরা নিমিত্ত বা লক্ষণ বিবেচনা পূর্বক শুভাশুভ নির্ধারণ করতেন।

জাতক পাঠে জানা যায় যে, বুদ্ধের সময়কালে প্রাচীন ভারতের সমাজ ব্যবস্থা ছিল জাতিভেদ প্রথার নিগূঢ়ে আবদ্ধ। বুদ্ধ তাঁর ধর্ম প্রচারের মধ্য দিয়ে জাতিভেদ প্রথার শৃঙ্খল ছিন্ন করেন এবং বৈপ্লবিক যুগের সূচনা করেন। বুদ্ধের প্রচারিত ধর্মের বিশেষত্ব হল- মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা। এই ধর্মে জাতি-গোত্র ও বর্ণ-বৈষম্যের স্থান নেই। আছে, শোষিত, বঞ্চিত ও পঙ্কিলতার আবর্তে নিমজ্জিত প্রাণীকূলের মুক্তির দিক নির্দেশনা। বুদ্ধের আবির্ভাবকালে ভারতের ধর্ম জীবনে বিপ্লবের দানা বেঁধে উঠেছিল। উচ্চ সম্প্রদায়ের গণ্ডির মধ্যে উপনিষদের অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা থাকলেও সাধারণ মানুষের উপর ছিল বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপ ও অনুশাসনের পেষণ। জনগণ পূজা ও যাগ-যজ্ঞের নামে পশুবলি দিত এবং অন্যান্য বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানে লিপ্ত থাকত। এমনকি তারা সাপ, মাছ, গন্ধর্ব প্রভৃতির পূজায় ছিল আস্থাবান। তারা বিশ্বাস করত, যজ্ঞের প্রভাবে ধনাগম, শান্তি ও সম্মান প্রাপ্তি ঘটে।

'তর্কারীকজাতকে' দেখা যায় পুরোহিত রাজার স্বর্গ প্রাপ্তির জন্য সর্ব চতুষ্ক যজ্ঞের আয়োজন করেন। সেই যজ্ঞে পুরোহিত রাজপুত্র এবং মহিষীদের নিধনের ব্যবস্থা করেন। মহামঙ্গলজাতকে (IV. p. 72, No. 453) উল্লেখ আছে সকালে উঠে শ্বেত বৃষ, গর্ভিণী স্ত্রী, রোহিত মৎস্য, পূর্ণঘট, নব-বস্ত্র, পায়েস প্রভৃতি দর্শন করলে শুভফল প্রাপ্তি হবে বলে লোকেরা বিশ্বাস করত। চণ্ডালের মুখ দর্শন অমঙ্গলজনক বলে বিবেচিত হতো। মঙ্গলজাতকে (I. p. 371, No. 87) আরো দেখা যায়, কেউ মূষিকদষ্ট বস্ত্র (ইঁদুর কাটা কাপড়) পরিধান করলে সপরিবারে মারা যাবে। যাঁরা এ সব নিমিত্ত বা ঘটনা ব্যাখ্যা করতেন, তাঁদের নাম ছিল নিমিত্ত পাঠক। অণ্ডভূতজাতক (I. p. 289-295) এবং উম্মদন্তীজাতকে (V. p. 209, No. 527) আরেক শ্রেণির লোকের উল্লেখ পাওয়া যায়, যারা অঙ্গবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তারা অঙ্গলক্ষণ দেখে লোকের শুভাশুভ বলে দিতে পারতেন। তবে তথাগত বুদ্ধ কখনও এসব বিষয় মানতেন না। তিনি নক্ষত্র জাতকে (I. p.257, No. 49) পরিষ্কারভাবে বলেছেন :

মুর্খ যেই সেই বাছে শুভাশুভক্ষণ,
অথচ সে শুভ ফল না লভে কখন।
সৌভাগ্য নিজেই শুভগ্রহ আপনার;
আকাশের তারা- তার শক্তি কোন্ ছার ?

Dhaka University Institutional Repository

জাতক পাঠে আরো জানা যায় যে, তখনকার জনসাধারণ তন্ত্র-মন্ত্র বিশ্বাসী ছিল। কামনীতজাতকে (II. p. 212. No. 228) মন্ত্রের মাধ্যমে লোকের ভূত তাড়ানোর কাহিনি আছে। লোকে আরো বিশ্বাস করত মন্ত্রবলে অনেক অসাধ্য সাধন করা যায়। বেদব্ভজাতকে (I. p. 253, No.48) মন্ত্রবলে আকাশ থেকে রত্ন বর্ষিত হওয়ার কথা উল্লেখ আছে। সব্বদাঠজাতক (II. p.243-247, No. 241) মন্ত্রবলে পৃথিবী জয় করার কথা এবং বৃহাচ্ছত্র জাতক (III. p. 115, No. 336) গুপ্তধন লাভের কথা বর্ণিত আছে। চুল্লসেট্ঠিজাতক (I. p. 115), অসাতমন্তজাতক (I. p. 286f), সম্ভবজাতক (II. p. 44) প্রভৃতিতে উল্লেখ আছে যে, বংশধরদের মধ্যে কেহ প্রব্রজ্জিত বা প্রব্রাজক হলে বংশ পবিত্র হয় – এরূপ লোকবিশ্বাস প্রচলিত ছিল এবং এ কারণে মাতা পিতা ও অন্যান্য অভিভাবকরা সন্তানদের প্রব্রাজক হতে বা গৃহত্যাগে উৎসাহ যোগাতেন। সমিদ্ধিজাতক (II. p. 57), লোমসকস্সপজাতক (III. p. 515f), কণ্হজাতক (IV. p. 8f), সোন-নন্দজাতক (V. p. 313) প্রভৃতিতে ব্রাহ্মণদের মধ্যে শিক্ষা সমাপনের পর প্রব্রজ্যা গ্রহণের প্রথা প্রচলিত ছিল বলে উল্লেখ আছে। জাতক পাঠে আরো জানা যায় যে, চতুরাশ্রম প্রথা কেবল ব্রাহ্মণদের মধ্যেই প্রচলিত ছিল না, ক্ষত্রিয়দের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। সোন-নন্দজাতক (V. p. 313) পাঠে জানা যায়, এক অশীতিকোটি বিভবসম্পন্ন ব্রাহ্মণদম্পতি পুত্রদ্বয়কে প্রব্রজ্যা গ্রহণে কৃতসংকল্প দেখে সমস্ত ধন-সম্পত্তি বিতরণ পূর্বক নিজেরাও তাদের অনুগামী হন।

জাতকে বর্ণিত বুদ্ধের বোধিসত্ত্ব জীবন পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, তখনকার মানুষ ধার্মীক ছিল। জাতকের কাহিনিতে বৌদ্ধধর্ম দর্শনের জন্মান্তরবাদ তত্ত্বটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বৌদ্ধরা শাশ্বত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে, মানুষ কর্মফলে জন্ম লাভ করে। তৃষ্ণার কারণেই মানুষের পুনর্জন্ম হয়। তৃষ্ণার নিরোধেই পুনজন্মের নিরোধ সাধিত হয়। এই জন্ম-মৃত্যুর শৃংখল হতে মুক্তি পেতে হলে দান, শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞার অনুশীলনের প্রয়োজন। ধ্যানানুশীলনের দ্বারা মানুষ মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। মানুষ পরম জ্ঞানের অধিকারী হয়। এই জ্ঞানের দ্বারা সে বুঝতে পারে যে তৃষ্ণার কারণেই সে জন্ম গ্রহণ করে। জন্মগ্রহণ করেই পুঞ্জিভূত দুঃখ ভোগ করে। এই দুঃখের চির অবসান করতে হলে তৃষ্ণার নিরোধ অবশ্যম্ভাবী। তৃষ্ণার নিরোধই সমস্ত উপসর্গের নিরোধ। অতএব, দুঃখের সম্যক উপলব্ধিই দুঃখ বিনাশের হেতু। অষ্টাঙ্গিক মার্গের অনুশীলনই দুঃখ মুক্তির উপায়। দুঃখের বিনাশই নির্বাণ। জাতকসমূহে বুদ্ধ এই নির্বাণের মাহাত্মই বর্ণনা করেছেন। নিজে কি করে নির্বাণ উপলব্ধি করেছেন তা জাতকের কাহিনির মাধ্যমে তিনি লোকের নিকট ব্যক্ত করেছেন।

৬. সমকালীন দর্শনের বিপরীতে বৌদ্ধ দর্শন

প্রাক বৌদ্ধযুগীয় এবং বুদ্ধের সমকালীন এই ধর্মমতসমূহকে বুদ্ধ 'মিথ্যাদৃষ্টি' বলে অভিহিত করেছেন। বুদ্ধ এসব মতবাদের বিপরীতে প্রতীত্যসমূৎপাদ, চতুরার্য সত্য, আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ, কর্মবাদ, অনিত্যবাদ, অনাত্মাবাদ প্রভৃতি মতবাদসমূহ উপস্থাপন করেছেন। এসব মতবাদের প্রায়োগিক বিষয়গুলো জাতকের ছত্রে ছত্রে বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে বৌদ্ধ দর্শনের তাত্ত্বিক বিষয়গুলো বর্ণনা করা হলো :

৬.১. প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্ব

বৌদ্ধ দর্শনের অন্যতম মতবাদ হচ্ছে প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্ব।[৬৯] বৌদ্ধ প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্ব মতে, এ জগতে যা কিছু ঘটছে তার পেছনে নিশ্চিত কোনো কারণ রয়েছে। অর্থাৎ কোনো কিছুই কারণ ছাড়া বা অকারণে সংগঠিত বা সম্ভূত হয় না। এজন্য প্রতীত্যসমুৎপাদকে কার্য-কারণ তত্ত্বও বলা হয়। বুদ্ধ এ তত্ত্বের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন :

> 'ইমস্মিং সতি ইদং হোতি
>
> ইমসসুপ্পদা ইদং উপ্পজ্জতি।
>
> ইমস্মিং অসতি ইদং ন হোতি
>
> ইমস্স নিরোধা ইদং নিরুজ্জতি।
>
> অর্থাৎ ওটা থাকলে এটা হয়, ওটার উৎপত্তিতে এটার উৎপত্তি; ওটা না থাকলে এটা হয় না, ওটার নিরোধে এটার নিরোধ হয়।

প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্বের মূলকথা হচ্ছে : হেতুর উৎপত্তিতে ফলের উৎপত্তি, হেতুর নিরোধে ফলের নিরোধ হয়। জড় ও জীবজগত এই কার্য-কারণ তত্ত্ব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কার্য সর্বদা কারণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কারণ না থাকলে কার্যের উৎপত্তি অসম্ভব। কারণের নিয়মকতাই কার্যকে বিভিন্নভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। বুদ্ধ প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতির মাধ্যমে জন্ম-মৃত্যুর রহস্য উদ্ঘাটন করেন।

বিচার-বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্ব হচ্ছে বুদ্ধের সমসাময়িককালে প্রচলিত শাশ্বতবাদ এবং উচ্ছেদবাদের মধ্যবর্তী পন্থা এবং অধীত্যসমুৎপাদ তত্ত্বের বিপরীত দর্শন। শাশ্বতবাদ অনুযায়ী কোনো কোনো বিষয় শাশ্বত অর্থাৎ অনন্তকাল ধরে স্থায়ী। এদের আদি নেই, অন্তও নেই। এরা কোনো কিছু দ্বারা উৎপন্ন নয়, সেহেতু কোনো কিছুর ওপর নির্ভরশীল নয়। উচ্ছেদবাদ অনুযায়ী বস্তুর উচ্ছেদ বা বিনাশের পর আর কোনো অস্তিত্ব থাকে না। প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্ব দুই চরম অবস্থার মধ্যবর্তী পন্থা।

Dhaka University Institutional Repository

৬.২. চুতরার্য সত্য

চতুরার্য সত্য বৌদ্ধ দর্শনের মূলতত্ত্ব হিসেবে পরিচিত। বুদ্ধের সমকালীন সময়ে যখন জগত সম্পর্কে নানা মতবাদ প্রচার করা হচ্ছিল তখন বুদ্ধ জগতের প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচনের লক্ষ্যে প্রচার করেন চতুরার্য সত্য দর্শন। বুদ্ধ বলেছেন চতুরার্য সত্যের মধ্যে তাঁর ধর্মের সারতত্ত্ব নিহিত – 'চতুসচ্চ বিনিমুত্তো ধম্মো নাম নত্থি' অর্থাৎ চতুরার্য সত্য ব্যতীত অপর কোনো ধর্ম নেই। বুদ্ধ উপলব্ধি করেছিলেন, মানব জীবন দুঃখের ফেণায় বিকীর্ণ, জরার তরঙ্গে উদ্বেল এবং মৃত্যুর উগ্রতায় ভয়ঙ্কর। তিনি সুদীর্ঘ ছয় বছর কঠোর সাধনা করেছিলেন জীবনের এই পরিণতির কারণ অনুসন্ধান করতে। বোধিলাভের মাধ্যমে তিনি আবিষ্কার করেন চারটি আর্য বা প্রকৃত সত্য, যা বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শনের ইতিহাসে 'চতুরার্য সত্য' নামে পরিচিত।[৭০] চারটি সত্য আবিষ্কারের মাধ্যমে বুদ্ধ উদ্ঘাটন করেন জীবনের পরিণতির রহস্য। চারটি আর্য সত্য হচ্ছে : ১. দুঃখ আর্যসত্য ২. দুঃখের কারণ আর্যসত্য ৩. দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য এবং ৪. দুঃখ নিরোধের উপায় আর্য সত।

১. **দুঃখ আর্য সত্য :** এ সত্যমতে, জগত দুঃখময়। সংসার চক্রে পরিভ্রমণ করে মানুষ দুঃখ ভোগ করে। তথাগত বুদ্ধ দুঃখকে নিম্নরূপভাবে বিভক্ত করেছেন : ১. জন্মদুঃখ ২. জরাদুঃখ ৩. ব্যাধিদুঃখ ৪. মরণদুঃখ ৫. অপ্রিয় সংযোগদুঃখ ৬. প্রিয় বিচ্ছেদ দুঃখ ৭. ইচ্ছিত বস্তুর অপ্রাপ্তি দুঃখ ৮. পঞ্চ উপাদান স্কন্ধজনিত দুঃখ। জন্মগ্রহণ করলে সকলকে এ দুঃখগুলো নিশ্চিতভাবে ভোগ করতে হয়। এসব দুঃখ হতে কারো নিস্তার নেই।

২. **দুঃখের কারণ আর্যসত্য :** ইতোপূর্বে প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্বে দেখেছি, কারণ ছাড়া কোনো কার্যের উৎপত্তি হয় না। অনুরূপভাবে দুঃখ উৎপত্তিরও কারণ আছে। এই আর্যসত্য মতে, অজ্ঞতার কারণে মানুষ তৃষ্ণার বশবর্তী হয়। তৃষ্ণার কারণে লোভ, দ্বেষ, মোহের বশবর্তী হয় এবং ফলশ্রুতিতে দুঃখ ভোগ করে। ফলে, বলা যায়, অজ্ঞতা হতে তৃষ্ণা এবং তৃষ্ণা হেত দুঃখ উৎপন্ন হয়।

৩. **দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য :** এই আর্যসত্য মতে, জগতে দুঃখ যেমন আছে তেমনি দুঃখের নিরোধও আছে। যেহেতু তৃষ্ণার কারণে দুঃখের উৎপত্তি হয়, সেহেতু তৃষ্ণা নিরোধ সাধনে দুঃখের নিরোধ সম্ভব। তৃষ্ণার ক্ষয় পুর্নজন্ম রোধ করে। ফলে দুঃখও নিরোধ প্রাপ্ত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৪. **দুঃখ নিরোধের উপায় আর্যসত্য :** এই আর্য সত্য মতে, জগতে যেমন দুঃখ আছে তেমনি দুঃখ নিরোধের উপায়ও আছে। তথাগত বুদ্ধ দুঃখ নিরোধের উপায় হিসেবে আটটি পথ নির্দেশ করেন, যা বৌদ্ধ পরিভাষায় 'আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ' নামে অভিহিত। এ বিষয়টি পরবর্তী অনুচ্ছেদে বর্ণনা করা হবে।

৬.৩. আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ

বুদ্ধের সমকালীন সময়ে মুক্তির জন্য মানুষ বনাচরন, নির্জনবাস, শারীরিক কৃচ্ছ্রতাসাধন প্রভৃতি সাধন প্রণালী অনুসরণ এবং যাগ-যজ্ঞ, হোম, পশুবলি, অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড, পূজা অর্চনা প্রভৃতি করতেন। বুদ্ধ তাঁর সমকালীন প্রচলিত সাধন প্রণালী ও আচার-অনুষ্ঠানসমূহ মানুষের দুঃখ মুক্তির সঠিক পন্থা নয় বলে অভিহিত করেছেন। এসব সাধন প্রণালী ও আচার-অনুষ্ঠানের বিপরীতে মুক্তির উপায়স্বরূপ বুদ্ধ নির্দেশ করেন আর্য অষ্টাঙ্গি মার্গ তত্ত্ব। এ তত্ত্বে দুঃখ মুক্তির উপায় স্বরূপ আটটি পথ বা উপায় অবলম্বনের নির্দেশ করা হয়েছে, যা বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ নামে পরিচিত।[৭১] আটটি মার্গ হচ্ছে :

সম্যক দৃষ্টি : সম্যক দৃষ্টি হচ্ছে সত্য দৃষ্টি বা যথার্থ জ্ঞান। প্রতীত্যসমুৎপাদ, চতুরার্যসত্য এবং কর্ম ও কর্মফল সঞ্জাতজ্ঞান প্রসূত দৃষ্টি। বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানই সম্যক দৃষ্টি।

সম্যক সংকল্প : উত্তম সংকল্পকে সম্যক সংকল্প বলা হয়। সম্যক সংকল্প তিন প্রকার। যথা : নৈষ্ক্রম্য সংকল্প, অব্যাপদ সংকল্প এবং অবিহিংসা সংকল্প। ভোগস্পৃহা ত্যাগ করে বৈরাগ্য অবলম্বনের ব্রত গ্রহণ করাই নৈষ্ক্রম্য সংকল্প। অসৎকর্ম ত্যাগ করে সৎকর্ম চিন্তায় আত্মনিয়োগ করার নাম অব্যাপদ সংকল্প। হিংসা ভাব থেকে বিরত হয়ে সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রী ও করুণা পরায়ন ভাবনা হচ্ছে অবিহিংসা সংকল্প। জাগতিক সুখ-দুখ, কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মাৎসর্য, বিদ্বেষ, ঈর্ষা, হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, লোলুপতা প্রভৃতি মানুষকে পশুতে পরিণত করে। এ সকল অশুভ ও অকুশল চিন্তা পরিত্যাগ করে চিত্তে মৈত্রী, করুণা, পরোপকার, সৎচিন্তা ও সৎভাবনায় নিজেকে জাগ্রত করার নামই সম্যক সংকল্প।

সম্যক বাক্য : যথার্থ এবং গ্রহণযোগ্য বাক্যই হচ্ছে সম্যক বাক্য। সম্যক সংকল্প অনুসারে বাক্যকে সংযত করতে হয়। মিথ্যা, অপ্রিয়, কর্কশ, বৃথাবাক্য কথন থেকে বিরত হয়ে সত্যবাদী, মধুরভাষী ও সারগর্ভভাষণকে সম্যক বাক্য বলে। সম্যক বাক্যভাষী বাচনিক সংযমের সীমা লংগন করেন না। তাঁর বাক্য সুখকর শ্রুতিমধুর ও সদর্থপূণ হয়। বাচনিক সংযমী ব্যক্তি চার প্রকার গুণে গুণান্বিত হন। যথা : ১. তিনি মিথ্যাকথন থেকে বিরত থেকে আত্মহেতু এবং পরহেতু সজ্ঞানে মিথ্যা কথা বলেন না। সত্যবাদী

Dhaka University Institutional Repository

হওয়ায় তিনি অন্যের বিশ্বাসভাজন হন; ২. তিনি পিশুন বা ভেদ বাক্য হতে থেকে হিংসা পরিত্যাগ করেন। ফলে তিনি অন্যদের নিকট মিত্র বা বন্ধু হিসাবে পরিগণিত হন; ৩. তিনি পুরুষ বা কর্কশ বাক্য ভাষণ থেকে বিরত থেকে শ্রুতিমধুর, নির্দোষ এবং কল্যাণজনক বাক্য বলায় সকলের নিকট জনপ্রিয় হন এবং সকলে তাঁকে সম্মান করেন; এবং ৪. তিনি প্রলাপ বা বৃথাবাক্য থেকে বিরত থাকেন বিধায় সজ্জন হিসেবে আখ্যায়িত হন।

সম্যক কর্ম : সম্যক কর্ম হচ্ছে সৎকর্ম যার মধ্যে পবিত্রতা নিহিত। বলা যায়, সকল প্রকার অসৎকর্ম ত্যাগ করে সৎ কর্ম সম্পাদনের নামই সম্যক কর্ম।

সম্যক জীবিকা : নির্দোষ জীবিকাই হচ্ছে সম্যক জীবিকা। সম্যক জীবিকা চর্চাকারী ব্যক্তি প্রাণরক্ষার জন্যও অসদুপায় অবলম্বন করেন না। তিনি অস্ত্র, প্রাণী, মাংস, মদ ও বিষ - এ পাঁচ প্রকার ব্যবসা পরিত্যাগ করে কৃষি, সৎ ব্যবসা ও চাকুরী ইত্যাদি সৎজীবিকা দ্বারা স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণ করেন।

সম্যক ব্যায়াম : উত্তরোত্তর উন্নতি সাধনের প্রবল প্রচেষ্টা বা উদ্যম হচ্ছে সম্যক ব্যায়াম। ইন্দ্রিয় সংযম, অকুশল পরিত্যাগ এবং অনুপন্ন কুশল উৎপন্ন ও উৎপন্ন কুশল চর্চার প্রবল প্রচেষ্টাই হচ্ছে সম্যক ব্যায়াম।

সম্যক স্মৃতি : সাধারণত সম্যক স্মৃতি বলতে বোঝায় সর্ব বিষয়ে স্মৃতিকে জাগ্রত রাখা। দৈহিক ও মানসিক সকল প্রকার অবস্থা সূক্ষ্মদৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ বা স্মরণ করাই হচ্ছে সম্যক স্মৃতি। সম্যক স্মৃতি চার প্রকার। যথা : কায়ানুদর্শন, বেদনানুদর্শন, চিত্তানুদর্শন এবং ধর্মানুদর্শন। নির্বাণকামী ব্যক্তির এ চারটি বিষয় স্মৃতিপটে সর্বদা জাগ্রত রাখা একান্ত প্রয়োজন।

সম্যক সমাধি : চিত্তের একাগ্রতা সাধনই হচ্ছে সম্যক সমাধি। সমাধি বা ধ্যান মানসিক অস্থিরতা ও চঞ্চলতাকে দূরীভূত করে এবং সাধককে শান্ত, দান্ত ও সমাহিত করে। ফলে সাধক সহজে অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হন। আর্য-অষ্টাঙ্গক মার্গজ্ঞান উদয় হলে মানুষের চিত্ত প্রজ্ঞালোকে উদ্ভাসিত হয় এবং নির্বাণের পথে অগ্রসর হয়।

৬.৪. বৌদ্ধ কর্মবাদ

বৌদ্ধ কর্মবাদ প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্বের ভিন্ন রূপ মাত্র। কর্মবাদ অনুসারে মানুষকে তাঁর কৃতকর্মের ফল নিশ্চিতভাবে ভোগ করতে হবে। শুভমানবক এবং বুদ্ধের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে বৌদ্ধ কর্মবাদের স্বরূপ প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। নিম্নে উভয়ের কথোপকথন তুলে ধরা হলো :

Dhaka University Institutional Repository

"শুভ মানবক ছিলেন এক শ্রেষ্ঠীপুত্র। তাঁর কাছে মনে হত সমগ্র জগতটাই যেন বৈষম্য এবং বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। তিনি দেখলেন যে, পৃথিবীর সব মানুষ সমান নয়। কেউ ধনী, কেউ দরিদ্র, কেউ রোগী কেউ নীরোগী, কেউ সবল, কেউ দূর্বল, কেউ মূর্খ, কেউ জ্ঞানী, কেউ লম্বা, কেউ বেটে। সমস্ত প্রাণিজগতের মধ্যে তিনি এরূপ বিভিন্ন বৈষম্য দেখতে পান। এ বৈষম্যের কারণ কি? এসব প্রশ্ন তাঁকে তাড়িত করত। একদিন তিনি বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে এ বৈষম্যের কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। উত্তরে বুদ্ধ বলেছিলেন, "কম্মসসকা মানবক সত্তা কম্মদায়দা, কম্মযোনি, কম্মবন্ধু, কম্মপটিসরণা, যং কম্ম করিস্‌সসন্তি কল্যাণ বা পাপকং বা তস্‌স দায়াদা ভবিসসন্তীতি। কম্মং সত্তে বিভজ্জতি যদিদং হীনপপনীতায়ায়' তি।"[৭২]

অর্থাৎ হে মানবক, জীবগণ কর্মের অধীন। তারা কর্মের উত্তরাধিকারী । জীবগণ কর্মহেতু উৎপন্ন, কর্মই তাদের বন্ধু, কর্মই তাদের আশ্রয়। শুভ অশুভ কর্মের মধ্যে যে যেরূপ কর্ম করবে সে রূপ কর্মের উত্তরাধিকারী হবে। কর্মই প্রাণিগণকে হীন শ্রেষ্ট, উচ্চনীচ নানা ভাবে বিভক্ত করে।

প্রাক বৌদ্ধযুগীয় মতবাদসমূহে যেখানে কর্ম এবং কর্মফলকে অস্বীকার করা হয়েছে এবং নিয়তি বা অদৃষ্টের ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে, সেখানে বুদ্ধের কর্মবাদ ব্যক্তি স্বাধীনতার স্বাক্ষর রাখে।

৬.৫. অনিত্যবাদ

বুদ্ধের অন্যান্য দার্শনিক মতবাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : অনিত্যবাদ, ক্ষণিকবাদ এবং অনাত্মাবাদ। বুদ্ধের অনিত্যবাদ ও প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্ব হতে উদ্ভূত। অনিত্যবাদ অনুযায়ী সব কিছুই অনিত্য, কোনো কিছুই শাশ্বত বা চিরন্তন নয়। "যং কিঞ্চি সমুদয় ধম্মং, সববং তং নিরোধ ধম্মং তি।" অর্থাৎ যার উৎপত্তি আছে, তার নিরোধ বা ব্যয় আছে। সে কখনো অব্যয় বা অক্ষয় হতে পারে না, দৈহিক এবং মানসিক সবকিছুই ক্ষণস্থায়ী, যা কিছু অস্তিত্বশীল তা ই অনিত্য।[৭৩]

বুদ্ধের অনিত্যবাদ প্রাক বৌদ্ধযুগীয় শাশ্বতবাদ এবং একাংশ শাশ্বত বাদ এর মধ্যবর্তী পন্থা। বুদ্ধের অনিত্য দর্শনকে পরবর্তীকালের বৌদ্ধ দার্শনিকগণ ক্ষণিকবাদে রূপান্তরিত করেন। ক্ষণিকবাদ অনুযায়ী জগতের সবকিছু অনিত্য তা নয়, প্রতিটি বস্তুই একটি ক্ষণের জন্য স্থায়ী হয়। কোনো বস্তুরই শাশ্বত সত্তা নেই, তার সত্তা হল একটি ক্ষণিকের জন্য।

৬.৬. অনাত্মাবাদ

আত্মা সম্পর্কে বুদ্ধের মতবাদ প্রাক বৌদ্ধযুগীয় মতবাদ হতে ভিন্ন। বুদ্ধ কোনো শাশ্বত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেননি। বুদ্ধের মতে, যেহেতু সব অস্তিত্বশীল বস্তুই অনিত্য, ক্ষণিক সেহেতু কোনো শাশ্বত আত্মার অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়। প্রাক বৌদ্ধযুগে আত্মার স্বরূপ ব্যাখা করা হয়েছে, "সসসতো অত্তা চ লোকো বঞ্জো, কুট্ঠো এসিকট্ঠায়ী ঠিতো।"[৭৪] অর্থাৎ আত্মা ও জগৎ শাশ্বত, উহার বন্ধ্যা কুটস্থ নগর তোরণের স্তম্ভের মত স্থির। আত্মার স্বরূপ সর্ম্পকে বুদ্ধের অভিমত রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান (Consciousness) এই বিষয়ের সমন্বিত রূপ হচ্ছে আত্মা। এই পাঁচটি বিষয় সর্বদা পরিবর্তনশীল এবং অনিত্য। এগুলো পৃথক বা বিচ্ছিন্ন হলে আত্মা বলে কোনো কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না। আত্মাকে উপযুক্ত পাঁচটি বিষয়ে বিভক্ত করলে স্পষ্ট বুঝা যায় – আত্মা শাশ্বত বা অশাশ্বত নয়। এ তত্ত্বটি বুদ্ধের অনাত্মবাদ নামে খ্যাত। এই মতবাদটি শাশ্বত বা অশাশ্বতবাদ কোনোটিরই অন্তর্গত নয়।[৭৫]

৭. প্রাচীন ভারতীয় দর্শন ও বৌদ্ধ দর্শনের তুলনামূলক পর্যালোচনা

বুদ্ধের সমকালীন ধর্ম-দর্শনের সঙ্গে বুদ্ধের ধর্ম-দর্শনের তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বুদ্ধের ধর্ম দর্শন এবং চিন্তা চেতনার কেন্দ্রে ছিল মানুষ। মূলত তত্ত্ববিদ্যাায় তিনি আগ্রহ প্রকাশ করতেন না। তিনি ভিক্ষুসংঘকে এ বিষয়ে উপদেশ স্বরূপ বলেছিলেন, "লোকচিন্তা ভিক্খবে অচিন্তেয্যা ন চিন্তেতো উম্মাদসস বিঘাতসস ভাগী অসস।" অর্থাৎ ভিক্ষুগণ, লোকে বিষয় অচিন্তা চিন্তা করা অনুচিত। এটা চিন্তা করলে উম্মাদেরও বিঘাতের ভাগী হতে হয়। বুদ্ধের মতে, লোক বিষয়ক চিন্তা নিয়ে সময় ক্ষেপণ করলে দুঃখ মুক্তি সম্ভব নয়। এগুলো অমীমাংসিত এবং অব্যাকৃত প্রশ্ন।[৭৬] কেউ শরাহত হলে প্রথম এবং উত্তম কাজ হবে শর উত্তোলন করে শরাহত ব্যক্তির চিকিৎসা করা এবং সেবা করা। তা না করে যদি কে শর নিক্ষেপ করল, কোন্ দিকে থেকে শর আঘাত করল তা নিয়ে ব্যস্ত থাকে তাহলে শরাহত ব্যক্তির মৃত্যু নিশ্চিত। তাই তিনি এ বিষয়ে চিন্তা না করে চিন্তা করেছেন মানুষ নিয়ে, সমাজ নিয়ে। বলা যায়, মানুষের দুঃখ নিবৃত্তিই ছিল বুদ্ধের বা বৌদ্ধ ধর্ম দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য।

বুদ্ধ এমন একটি পথ উপস্থাপন করেন যা নিজে নিজে অনুসরণের মাধ্যমে জাগতিক দুঃখের হাত থেকে মুক্তি লাভ সম্ভব। এভাবে তিনি নিজের মুক্তির দায়িত্ব নিজের উপর সমর্পন করে মানুষকে চিন্তার স্বাধীনতা প্রদান করেন। ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রদানের মধ্য দিয়ে তিনি এমন এক ধর্ম আন্দোলন সূচনা করেন, যা একদিকে ছিল আচার অনুষ্ঠান পীড়িত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে এবং অন্যদিকে ছিল ভোগ, সুখ এবং কৃচ্ছ্রসাধন সংক্রান্ত চরম মতবাদের বিরুদ্ধে। তিনি মধ্যম পথ অনুসরণের কথা বলেছেন। এই পথ প্রকৃত

পক্ষে একটি নৈতিক বিধান। সুতরাং গৃহী এবং সন্ন্যাসী, সকলেই এই পথ অনুসরণ করতে পারেন। শান্তির জন্য সর্বস্তরের মানুষ তাই অনায়াসে এই পথের পথিক হয়েছিলেন।

৮. উপসংহার

বুদ্ধের সমকালীন সময়ে যেমন বহু ধর্মীয় সংঘ বিরাজমান ছিল, তেমনি প্রচলিত ছিল বহু ধর্মীয় মতাদর্শ। বুদ্ধ পূর্ববর্তী সময় থেকে প্রচলিত বৈদিক আচার-অনুষ্ঠান ধর্মীয় ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। সে সময় অসংখ্য দেবতার পূজা অর্চনা প্রচলিত ছিল এবং তা ছিল যাগ-যজ্ঞ নির্ভর। যজ্ঞকারীর পূজায় তুষ্ট হতেন দেবতা এবং পূরণ করতেন যজ্ঞকারীর মনের বাসনা। ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ দেবতা ও যজ্ঞকারীর মধ্যকার যোগসূত্র রচনা করতেন। পশুবধ ছিল যজ্ঞের বা পূজার অন্যতম উপকরণ। ব্রাহ্মণগণ ছিলেন সমাজ নিয়ন্তা। বৈদিক চিন্তা-ধারার বাইরে মত প্রকাশ ছিল প্রায় অসম্ভব। এরূপ এক পরিস্থিতিতে আর্বিভূত হন ষড়তীর্থঙ্কর গণ, মহাবীর এবং গৌতম বুদ্ধ। ষড়তীর্থঙ্করের মতাদর্শ ধর্মীয় চিন্তা-চেতনার জগতের নতুন বিপ্লব আনয়ন করে। স্বাধীন মত প্রকাশের কারণে তাঁদেরকে সেসময় মুক্ত চিন্তার দার্শনিক হিসেবে গণ্য করা হতো, যদিও গৌতম বুদ্ধ তাঁদের ধর্ম-দর্শন মুক্তির জন্য সহায়ক নয় বলে অভিমত পোষণ করেছেন। বৈদিক আচার-আচরণ এবং যাগ-যজ্ঞের হোমানলে মানুষের চিন্তা-চেতনা যখন কুয়াশাচ্ছন্ন তখন ষড়তীর্থঙ্করের মতাদর্শ মানুষকে কিছুটা স্বাধীন চিন্তা-চেতনার স্বাদ প্রদান করলেও মানুষকে সঠিক মুক্তির পথ নির্দেশ করতে পারেনি। তখন গৌতম বুদ্ধ তাঁর ধর্ম-দর্শন প্রচারের মাধ্যমে মানুষকে অদৃশ্য শক্তির উপর নির্ভরশীলতা থেকে মুক্তি দেন এবং কর্মবাদের মাধ্যমে নিজেই নিজের নিয়ন্তা হিসেবে ক্ষমতা লাভ করেন। তিনি চুতরার্য সত্য সম্যকভাবে উপলব্ধি পূর্বক অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলনের মাধ্যমে নির্বাণ লাভ সম্ভব বলে দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন এবং বলেন, 'প্রত্যেকে নির্বাণ লাভ করতে সক্ষম'। তাঁর এরূপ অভিমত বৈদিক আদর্শে উদ্ভাসিত যুগে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। মানুষ নতুনভাবে শিক্ষা নেয়, 'যাগ-যজ্ঞ নয় আত্মশুদ্ধি এবং স্বীয় কর্মফলেই মানুষ দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করতে সক্ষম।'

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

[১] *Early History of India including Alexander's Campains*, op. cit., p. 30; ভারতবর্ষের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২, ২৫।

[২] *দীঘ নিকায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২-৩৮, ৩৯-৭০।

[৩] *প্রাচীন ভারতের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০-৯১।

[৪] "যানি চ তীনি, যানিচ সট্‌ঠি" অর্থাৎ তিন এবং ষাট মোট তেষট্টিটি যান বা মতবাদ।

[৫] *দীঘ নিকায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯-৭০।

[৬] *Majjhima Nikāya*, op. cit., vol. I., p. 40-52; বেণীমাধব বড়ুয়া (অনূ.), *মধ্যম নিকায়*, কলিকাতা, ১৯৪০, ক্ষুদ্র সারোপম সূত্র , পৃষ্ঠা ২১৫.

[৭] Egaku Mayeda, *Bukkhiyo yo Setsu*, Tokyo, Japan, p. 25.

[৮] *Digha Nikāya*, op. cit., vol. I, p. 53.

[৯] রাজগুরু ধর্ম্মরত্ন মহাস্থবির (সংকলিত ও অনূ.), *মহাপরিনিব্বান সুত্তং*, শ্রীঅন্নপূর্ণা বড়ুয়া কর্তৃক প্রকাশিত, চট্টগ্রাম, ১৯৪১, পৃ. ২৩১।

[১০] Benimadhab Barua, *A History of Pre-Buddhistsic Indian Philosophy*, Motilal Banarsidass, Calcutta, 1921, p. 227.

[১১] *The Summaṅgalavilāsinī, Buddhaghosa's Commentary on the Dīgha-Nikāya*, op. cit., vol. I, p. 142.

[১২] *Sutta-Nipāta Commentary being Paramatthajotikā*, op. cit., vol. I. p. 371.

[১৩] *Dictionary of Pali Proper Names*, op. cit., vol. II., p. 243.

[১৪] মণিকুন্তলা হালদার (দে), *বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস*, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলিকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ১২-১৩।

[১৫] *দীঘ নিকায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪।

[১৬] *Dictionary of Pali Proper Names*, op. cit., vol. II., p. 400.

[১৭] *The Summaṅgalavilāsinī, Buddhaghosa's Commentary on the Dīgha- Nikāya*, op. cit., vol. I. p.166f.

[১৮] *মহাপরিনিব্বান সুত্তং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২।

[১৯] *Majjhima Nikāya*, op. cit., vol. I., p. 231.

[২০] *A History of Pre-Buddhistsic Indian Philosophy*, op. cit., pp. 297ff.

Dhaka University Institutional Repository

[২১] A. Basam, *History of Doctrines of Ajvakas*, p.243.ff.

[২২] *Anguttara Nikāya*, op. cit., vol. I., p. 33.

[২৩] ছয় অভিজাতি কৃষ্ণ, নীল, লোহিত ,পীত, শুক্ল ও পরম শুক্ল অভিজাতি। কসাই, ব্যাধ প্রভৃতি লোকেরা কৃষ্ণাভিজাতিতে, এক বস্ত্র ধারী নির্গ্রন্থরা লোহিত জাতিতে, শুক্লবস্ত্রধারী অচেলক সন্ন্যাসীরা পীত জাতিতে, আজবিক সম্প্রদায়রা শুক্ল জাতিতে, মক্খলি গোসালের মতো অহেতুকবাদীরা পরম শুক্লাভিজাতিতে সমাবিষ্ট হয়।

[২৪] *দীঘ নিকায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫-৪৬।

[২৫] *মহাপরিনিব্বান সুত্তং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২-২৩৩।

[২৬] *The Summangalavilāsinī, Buddhaghosa's Commentary on the Dīgha- Nikāya*, op. cit., vol. I, p. 144.

[২৭] *A History of Pre-Buddhistsic Indian Philosophy*, op. cit., pp. 296.

[২৮] *Samyutta Nikāya*, op. cit., vol. I., p. 68.

[২৯] প্রাগুক্ত।

[৩০] *দীঘ নিকায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬-৫৩।

[৩১] ধর্মনন্দ কোসাম্বী, *ভগবান* বুদ্ধ, সাহিত্য-আকাদেমী, কলিকাতা ১৯৮০, পৃ. ১৫৪।

[৩২] *দীঘ নিকায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।

[৩৩] *মহাপরিনিব্বান সুত্তং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩।

[৩৪] *Dictionary of Pali Proper Names*, op. cit., vol. II., p. 90.

[৩৫] *The Summangalavilāsinī, Buddhaghosa's Commentary on the Dīgha-Nikāya*, op. cit., vol. I, p.144.

[৩৬] *Samyutta Nikāya*, op. cit., vol. I., p. 68.

[৩৭] *The Summangalavilāsinī, Buddhaghosa's Commentary on the Dīgha- Nikāya*, op. cit., vol. I, p.144.

[৩৮] *Majjhima Nikāya*, op. cit., vol. I., p. 517.

[৩৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০।

[৪০] *Samyutta Nikāya*, op. cit., vol. I., p. 68.

[৪১] *দীঘ নিকায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।

[৪২] প্রাগুক্ত।

[৪৩] *ভগবান বুদ্ধ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১-১৬২; *Dictionary of Pali Proper Names*, op. cit., vol. II., p. 89.

[৪৪] *Dictionary of Pali Proper Names*, op. cit., vol. II., p. 63-64.

[৪৫] *Sutta-Nipāta Commentary being Paramatthajotikā*, op. cit., vol. II, p. 423.

[৪৬] *মহাপরিনিব্বান সুত্তং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩।

[৪৭] *Majjhima Nikāya*, op. cit., vol. I., p. 373f.

[৪৮] *Majjhima Nikāya*, op. cit., vol. I, p. 93vol. II., p. 31, 241.

[৪৯] *Dictionary of Pali Proper Names*, op. cit., vol. II., pp. 61-64.

[৫০] *দীঘ নিকায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮।

[৫১] *মহাপরিনিব্বান সুত্তং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩।

[৫২] *The Summangalavilāsinī, Buddhaghosa's Commentary on the Dīgha- Nikāya*, op. cit., vol. I, p.144.

[৫৩] *Divyavadāna*, op. cit., pp. 143, 145.

[৫৪] *দীঘ নিকায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯।

[৫৫] *Vinaya Pitaka*, op. cit., vol. I., p. 39.

[৫৬] *দীঘ নিকায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯।

[৫৭] রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া, *পালি সাহিত্যের ইতিহাস*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮০, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৮।

[৫৮] Rhys T. W. David and William Stede, *Pali English Dictionary*, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd., New Delhi, 1975 (Indian Edition), p. 493.

[৫৯] *দীঘ নিকায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১-৩৫।

[৬০] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২-১৪।

[৬১] তিন প্রকার দেবতা আভাস্বর দেবতা, ক্রীড়া প্রাদোষিক এবং মনো প্রাদোষিক দেবতা। আভাস্বর দেবতারা ব্রহ্ম লোকে উৎপন্ন হয়, সেখানে মনোময় এবং আকাশচারী হয়ে শুভ স্থিতি রূপে (উদান, বিমান, কল্পতরু প্রভৃতিতে) দীর্ঘকাল অবস্থান করেন। ক্রীড়া প্রাদোষিক দেবতারা নিরন্তর হাস্য ক্রীড়ারতিশীলতার বিচরণ হেতু স্মৃতি বিভ্রম ঘটে। স্মৃতি বিভ্রম হেতু তাঁরা সে দেবকায়া হতে চ্যুত হন। মনো প্রাদোষিক দেবতারা নিরন্তর পরস্পর পরস্পরকে বিদ্বেষপূর্ণ চোখে নিরীক্ষন করেন। ফলে তাঁদের চিত্ত দূষিত এবং দেবকায়া ভ্রষ্ট হয়ে পড়েন ।

[৬২] *দীঘ নিকায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯-২২।

[৬৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২-২৫।

Dhaka University Institutional Repository

৬৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫-২৬; E.J. Thomas, *History of Buddhist Thought in India*, pp. 63-67.

৬৫ *দীঘ নিকায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭-৩০।

৬৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯-৩০।

৬৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১-৩৩।

৬৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩-৩৫।

৬৯ জিনবোধি ভিক্ষু, *বৌদ্ধ দর্শনে বিমুক্তিমার্গ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ২২৭-২৪৬; রনধীর বড়ুয়া, *মহামানব বুদ্ধ*, আভাময়ী বড়ুয়া কৃর্তক প্রকাশিত, চট্টগ্রাম, ১৯৫৭ (দ্বিতীয় সংস্করণ), দ্বিতীয় ভাগ, পৃ. ১৮; আচার্য্য বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির, *বৌদ্ধ দর্শনে সত্য দর্শন*, ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ৬৯-৭৫.

৭০ Narada, *The Buddha and His Teachings*, Vajirarama, Colombo 1973, pp. 178-185; বীরেন্দ্রলাল বড়ুয়া (সম্পা. ও ব্যাখ্যাত), *আর্য্য-অষ্টাঙ্গিক-মার্গ*, বোধিসত্ত্ব বিহার, চট্টগ্রাম, ১৩২৮ বাংলা,পৃ. ৪৫.

৭১ *মহামানব* বুদ্ধ, প্রাগুক্ত, দ্বিতীয় ভাগ, পৃ. ৬-১৮

৭২ *Majjhima Nikāya*, op. cit., vol. III., p. 135f (Cūllakammvibhaṅga Sutta, p. 202); *Aṅguttara Nikāya*, op. cit., vol. I. p. 247, vol. III., p. 415; *Saṃyutta Nikāya*, op. cit., vol. I., p. 91; *বৌদ্ধ দর্শনে সত্য দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭-১৩১।

৭৩ পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির, *রাহুল সাংকৃত্যায়নের বৌদ্ধ দর্শন*, ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৪০১ (তৃতীয় সংস্করণ), পৃ. ৯৮।

৭৪ *দীঘ নিকায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২-১৪; *Digha Nikāya*, op. cit., vol. I, p. 12.

৭৫ Ryudo Yasui, *Theory of Soul in Theravada Buddhism*, Atish Memorial Publishing Society, Calcutta, 1994, pp. 94-101.

৭৬ Narada, *A Manual of Abhidhamma*, Buddhist Missionary Society, Kuala Lampur, 1979 (4th ed.) pp. 158-159.

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতি

১. ভূমিকা

শিক্ষা এবং সংস্কৃতি মানব সমাজের অন্যতম দু'টি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এ দু'টি বিষয়ের বর্ণনা ব্যতীত কোনো জাতির পূর্নাঙ্গ ও প্রকৃত ইতিহাস রচিত হতে পারে না। এ কারণে শিক্ষাকে জাতির মেরুদণ্ড হিসেবে এবং সংস্কৃতিকে জাতির দর্পণ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। শিক্ষা একদিকে মানুষের অর্ন্তদৃষ্টিকে সম্প্রসারিত করে, অপরদিকে জাতীয় সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করতে সহযোগিতা করে। অনুরূপভাবে, সংস্কৃতি মননশীলতাকে ঋদ্ধ করত মানুষের মধ্যে অনন্ত সম্ভাবনার বিকাশ ঘটায়। এতে বোঝা যায়, শিক্ষা ও সংস্কৃতি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। শিক্ষা এবং সংস্কৃতিতে যে জাতি যত বেশি সমৃদ্ধ সেজাতি বিশ্বদরবারে তত বেশি মর্যাদার আসনে সমাসীন। পালি সাহিত্যে, বিশেষত জাতকে প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বিক্ষিপ্তভাবে বহু তথ্য পাওয়া যায়। সেসব তথ্যের ভিত্তিতে প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা ও সংস্কৃতির স্বরূপ উন্মোচন করাই এ অধ্যায়ের মৌল অভীপ্সা। প্রথমে শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হবে, এরপর সংস্কৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

২. প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা

২.১. পালি সাহিত্যে শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্যের উৎস চিহ্নিতকরণ

ভূমিকায় উল্লেখ করেছি, পালি সাহিত্যে প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে বিক্ষিপ্তভাবে বহু তথ্য পাওয়া যায়। এ অনুচ্ছেদে প্রথমে প্রধান প্রধান উৎসসমূহ চিহ্নিত করে উপস্থাপন করা হবে। কারণ উৎসসমূহ চিহ্নিত করা গেলে প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচন সহজ হবে এবং পরবর্তীকালের গবেষকদের গবেষণা কর্মেও তা দিকনির্দেশনা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। নিম্নে উৎসসমূহ উপস্থাপন করা হলো :

২.১.১. জাতকসমূহ

উল্লেখ্য যে, সকল জাতকে প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায় না। তাই গবেষণার সুবিধার্থে প্রথমে কোন্ কোন্ জাতকে আলোচ্য বিষয়ে তথ্য পাওয়া যায় তা চিহ্নিত করা উচিত। কারণ জাতকের তথ্যই অভিসন্দর্ভটি মূল উৎস। নিম্নে জাতক গ্রন্থ সমীক্ষাপূর্বক প্রাচীন ভারতের শিক্ষা সংক্রান্ত

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য সম্বলিত জাতকগুলো উপস্থাপন করা হলো এবং বন্ধনীতে লণ্ডনের পালি টেক্সট সোসাইটি হতে প্রকাশিত গ্রন্থের খণ্ড সংখ্যা ও পৃষ্ঠা নম্বর প্রদত্ত হলো :

লোসকজাতক (I. pp. 236-241), তক্কজাতক (I. pp. 295-299), বরণজাতক (I. pp. 317-319), ভীমসেনজাতক (I. pp. 356-359), অসাতরূপজাতক (I. p. 409-411), সঞ্জীবজাতক (I. pp. 510-511). লাঙ্গলীসজাতক (I. pp. 447-449), কটাহকজাতক (I. pp. 451-454), অলীনচিত্তজাতক (II. pp. 18-22), সুসীমজাতক (lI. pp. 46-50), অনভিরতিজাতক (II. pp. 100-101), পলায়িজাতক (II. pp. 217-218), উপাহনজাতক (II. pp. 221-224), গুপ্তিলজাতক (II. pp. 248-257), বীতিচ্ছজাতক (II. pp. 257-259), তিলমুট্‌ঠিজাতক (II. pp. 277-282), চূল্লকালিঙ্গজাতক (III. pp. 3-8), তুসজাতক (III. pp. 122-125), সেতকেতুজাতক (III. p. 232-237), আদিত্তজাতক (III. p. 470-474), তিত্তিরজাতক (III. pp. 537-543), জনসন্ধজাতক (IV. pp. 176-178), দূতজাতক (IV. p. 224-227), সুরুচিজাতক (IV. p. 316), চিত্তসম্ভূতজাতক (IV. pp. 390-400), ভদ্দসালজাতকে (IV. p. 153-155), মহানারদকস্‌সপজাতক (VI. pp. 220-255), মহাউম্মগ্‌গজাতক (VI. pp. 330-478), মহাসূতসোমজাতক (V. pp. 457-511) ইত্যাদি।

২.১.২. অন্যান্য পালি সাহিত্য

জাতক ছাড়াও বিভিন্ন পালি গ্রন্থে প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে প্রধান উৎসসমূহ হলো : দীর্ঘনিকায়, মজ্ঝিমনিকায়, সংযুক্তনিকায়, অঙ্গুত্তরনিকায়, থেরগাথা, থেরীগাথা, বিনয়পিটক, ধম্মপদট্‌ঠকথা, বিমানবত্থুট্‌ঠকথা, থেরগাথাট্‌ঠকথা, থেরীগাথাট্‌ঠকথা, অঙ্গুত্তনিকায় অট্‌ঠকথা, মিলিন্দপ্রশ্ন।

পালি উৎস ছাড়াও বিভিন্ন সংস্কৃত এবং ঐতিহাসিক আকর গ্রন্থ, ভ্রমণবৃত্তান্ত, প্রত্নতাত্ত্বিক অনুশাসন ও নিদর্শনে প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। এসব তথ্যের সঙ্গে ২.১. এবং ২.২ অনুচ্ছেদে বর্ণিত উৎসসমূহে প্রাপ্ত তথ্যের সমন্বয় সাধনপূর্বক নিম্নে প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হলো।

২.২. প্রাচীন ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থার উৎপত্তি

প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আর্যদের অবদান অনস্বীকার্য। আর্য মুনিঋষিরাই শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথম ভূমিকা রেখেছিলেন। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সমীক্ষায় দেখা যায়, আর্যগণ নানা দলে বিভক্ত হয়ে বসবাস করতেন। কতকগুলো পরিবার নিয়ে একেকটি দল গঠিত ছিল। পরিবারের কর্তা

Dhaka University Institutional Repository

ছিলেন পিতা, অপর দিকে দলের কর্তা ছিলেন রাজা। পরিবারের শিক্ষা দীক্ষার ভার কর্তার উপর অর্পিত ছিল। দলের সংস্কৃতির বাহক ছিলেন পুরোহিত বা গুরু। তিনি দলের মঙ্গলের জন্য পূজা-পাঠ করতেন এবং দলের শৌর্যবীর্যের অতীত ইতিহাস গুণকীর্তন করে দলের সকলকে বীরত্ব প্রদর্শনে উৎসাহিত করতেন। ভারতে আর্যদের বসতি স্থাপনের প্রথম যুগে যুদ্ধ দেবতা ইন্দ্রের পূজা প্রচলিত ছিল। ইন্দ্রই ছিল আর্যদের প্রকৃত দেবতা। পরে বাস্তু দেবতা অগ্নির পূজা প্রচলন শুরু হয়।[১] এ সময় উপসনার জন্য পুরোহিত বা ঋষিগণ মন্ত্রাদি রচনা করতে শুরু করেন। ঋষিদের রচিত ঋগ্বেদকে মানব সমাজের প্রাচীনতম গ্রন্থ বলে স্বীকার করা হয়। ঋক্ বা মন্ত্রের সমষ্টি বলে গ্রন্থটিকে ঋগ্বেদ বলা হয়। বৈদিক সূত্রানুসারে ঋগ্বেদ আর্যগণের সপ্ত-সিন্ধু অঞ্চলে বসবাসকালে রচিত হয়েছিল। ঋগ্বেদে সূত্রের সংখ্যা ১০২৮, যা দশটি মণ্ডলে বিভক্ত। ধারণা করা হয় যে, একেক ঋষি বা ঋষিবংশের রচনা একেকটি মণ্ডলে সংগৃহীত হয়ে ঋগ্বেদ সংকলিত হয়েছিল। প্রথিতযশা ঋষিগণ মননের দ্বারা ঋগ্বেদের মন্ত্রসমূহ ধারণ করতেন এবং সুর সংযোগে সেগুলো প্রকাশ করতেন। ঋষি পরিবারের লোকেরা এগুলো শ্রবণ করে স্মৃতিতে ধারণ করে রাখতেন। এঁরা 'শ্রুতর্ষি' নামে অভিহিত হতেন। ঋষিগণ বনে বসবাসপূর্বক সরল ও পবিত্র জীবন যাপন করতেন। সমাধিস্থ থেকে তাঁরা সত্য জ্ঞান লাভে ব্রতী হতেন। শ্রুতর্ষিগণ ঋষিদের ন্যায় ন্যায়-নিষ্ঠ আচরণ পূর্বক বেদমন্ত্র সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। এভাবে তপোবনে ঋষি পরিবারে বেদ অধ্যয়ন ও পাঠের মাধ্যমে প্রাচীন ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থা উৎপত্তি ও বিস্তার লাভ করে। এ প্রসঙ্গে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'তপোবন' প্রবন্ধে লিখেছেন,

" ভারতবর্ষে এই একটি আশ্চর্য ব্যাপার দেখা গেছে, এখানকার সভ্যতার মূল প্রস্রবন শহরে নয়, বনে। ভারতবর্ষের প্রথমতম আশ্চর্য্য বিকাশ যেখানে দেখতে পাই সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষ অত্যন্ত ঘেঁষাঘেঁষি করে একেবারে পিন্ড পাকিয়ে ওঠেনি। সেখানে গাছ-পালা নদী-সরোবর মানুষের সঙ্গে মিলে থাকবার যথেষ্ট অবকাশ পেয়েছিল, সেখানে মানুষও ছিল, ফাঁকাও ছিল – ঠেলাঠেলি ছিল না। অথচ এই ফাঁকা ভারতবর্ষের চিত্তকে জড়প্রায় করে দেয়নি বরঞ্চ তার চেতনাকে আরও উজ্জ্বল করে দিয়েছিল।

ভারতবর্ষের যে দুই বড় বড় প্রাচীন যুগ চলে গেছে, বৈদিক ও বৌদ্ধযুগ-সেই দুই যুগকে বনই ধাত্রীরূপে ধারণ করেছে। কেবল বৈদিক ঋষিরা নন, ভগবান বুদ্ধও কত আম্রবন, কত বেণুবনে তাঁর উপদেশ বর্ষন করেছেন - রাজপ্রাসাদে তাঁর স্থান কুলায় নি – বনই তাঁকে বুকে করে নিয়েছিল। সেই অরণ্যবাসনিঃসৃত সভ্যতার ধারা সমস্ত ভারতবর্ষকে অভিষিক্ত করে দিয়েছে এবং আজ পর্যন্ত তার প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়নি।"[২]

Dhaka University Institutional Repository

অতএব, বলা যায়, ভারতবর্ষে ঋষিদের প্রজ্ঞালোক থেকেই শিক্ষার প্রথম রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়েছিল। তৎপর ঋষি পরিবারের মাধ্যমেই তা সমগ্র ভারতবর্ষে পরিব্যপ্ত হয়। ঋষিগণই ছিলেন ভারতবর্ষের প্রাচীন শিক্ষক বা শিক্ষাগুরু।

২.৩. শিক্ষা ব্যবস্থার প্রকারভেদ

পালি সাহিত্য তথা জাতকে প্রাচীন ভারতে দু'প্রকার শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা : প্রাকবৌদ্ধ যুগীয় এবং বৌদ্ধ যুগীয়। বৈদিক শিক্ষাই মূলত প্রাক-বৌদ্ধ যুগীয় শিক্ষা নামে অভিহিত, যা পরবর্তীতে ব্রাহ্মণ্য এবং বৌদ্ধ - এ দু'টি ধারায় বিভক্ত হয়ে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত গড়ে তুলেছিল। নিম্নে উপর্যুক্ত দু'টি শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

২.৩.১. প্রাক-বৌদ্ধ যুগীয় তথা বৈদিক শিক্ষা ব্যবস্থা

বৈদিক শিক্ষা ছিল মূলত নগর কেন্দ্রিক। বরণজাতক (I. p. 317), ভীমসেনজাতক (I. p. 356) এবং সঞ্জীবজাতক (I. p. 510) সাক্ষ্য দেয় যে, আচার্যের সুখ্যাতি শুনে প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে শিক্ষার্থীরা বিদ্যা অর্জনের জন্য নগরে আগমন করতেন। আচার্যগণ পরম যত্ন ও দক্ষতাসহকারে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিতেন। উক্ত জাতকসমূহে আরো উল্লেখ আছে যে, আচার্যগণ ছিলেন মূলত ব্রাহ্মণ। চিত্তসম্ভূতজাতক (IV. pp. 391) পাঠে জানা যায়, বৈদিক যুগে কেবল ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়গণই বিদ্যা অর্জনের সুযোগ লাভ করতেন। শিক্ষা লাভের অধিকার নারী এবং শূদ্রেদের ছিল না। এ জাতকে উল্লেখ আছে যে, চিত্ত এবং সম্ভূত নামক চণ্ডালদ্বয় ব্রাহ্মণ সেজে তক্ষশিলার এক ব্রাহ্মণের গৃহে বিদ্যা শিক্ষা করছিলেন। অসাবধানতা বশত চণ্ডালভাষায় কথা বলায় তাদের জাতি পরিচয় প্রকাশিত হয়ে পড়ে। ফলে তাদের বিদ্যা-শিক্ষা বন্ধ হয়ে যায়। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যরা কেবল তাদের স্বকীয় শিক্ষার মধ্যে গণ্ডিভূত ছিল এবং সে বিদ্যাও ব্রাহ্মণ গুরুর মাধ্যমে অর্জন করতে হতো। এতে ব্রাহ্মণ্য পুরোহিত তন্ত্রের লাভ-সৎকার বৃদ্ধি পায়। এ কারণে ধারণা করা যায় যে, বৈদিক যুগে শিক্ষা ব্যবস্থা মূলত ব্রাহ্মণ সম্পদায়ের মধ্যে কুক্ষিগত হয়ে পড়েছিল। শিক্ষার একমাত্র মাধ্যম ছিল সংস্কৃত। সে যুগের বহুল প্রচলিত কথ্য ভাষা অর্থাৎ প্রাকৃত তাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে প্রদান করা হয়নি। ফলে বৈদিক শিক্ষা মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল এবং বৃহৎ জনগোষ্ঠি সে শিক্ষা লাভ হতে বঞ্চিত ছিল।

বৈদিক সমাজে গুণানুসারে কর্ম-বিভাগ প্রবর্তিত হয়েছিল। মূলত সমাজের নানারকম প্রয়োজন মিটানোর উদ্দেশ্যে বিশেষত জীবনযাত্রা সুশৃঙ্খল করার মানসে এ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছিল। বৈদিক সমাজ ব্যবস্থা মতে, প্রত্যেক মানুষ একেকটি বিশেষ কর্ম করবার অধিকার লাভ করতেন। এ প্রয়োজনের

Dhaka University Institutional Repository

তাগিতেই বর্ণাশ্রম-ধর্মের সৃষ্টি হয়েছিল। একই কারণে কর্ম বা ব্রত-গ্রহণের উপযোগী শিক্ষা দানের ব্যবস্থার প্রচলনও হয়। মানসিক উৎকর্ষতা অনুসারে বৈদিক যুগে ছাত্রদের তিনভাগে বিভক্ত করে শিক্ষা প্রদান করা হতো। বেদবিদ্যা লাভে সমর্থ ব্রাহ্মণ-ঋষিগণ উন্নত মানসিক বৃত্তির অধিকারী হতেন এবং এঁরা 'উত্তমপ্রজ্ঞা' নামে অভিহিত হতেন। পরবর্তী স্তরের শিক্ষার্থীরা 'মধ্যমপ্রজ্ঞা' এবং সর্বনিম্ন স্তর 'অল্পপ্রজ্ঞা' নামে অভিহিত হতেন। সর্বনিম্নস্তরের ব্যক্তিগণের জন্য পেশাভিত্তিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হতো। এ যুগে অনার্যগণ এ শিক্ষায় অধিক নৈপুন্য অর্জন করতেন। এর সাক্ষ্য পাওয়া যায় অলীনচিত্তজাতকে (II. p. 19)। এ জাতক সাক্ষ্য দেয় যে, সূত্রধরেরা গৃহনির্মাণকালে কাঠখণ্ড বিন্যাসের সুবিধার্থে এক, দুই ইত্যাদি অঙ্ক কাঠের উপর লিখে রাখতেন। এতে ধারণা করা যায় যে, অনার্যগণ তথা তথাকথিত হীন পেশাজীবিরাও শিক্ষা লাভ করতেন। তবে সে শিক্ষা ছিল পেশা ভিত্তিক। সম্ভবত আর্যগণ বিদ্বেষবশত অনার্যগণকে এ শিক্ষায় ব্রতী করতেন।

প্রথম দিকে বৈদিক শিক্ষা দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। যথা : পরাবিদ্যা এবং অপরাবিদ্যা।[৩] যে বিদ্যার মাধ্যমে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান লাভ করা যায় তাকে পরাবিদ্যা বলে। পরাবিদ্যাকে ব্রহ্মজ্ঞানও বলা হয়। ঋষিগণ পরাবিদ্যা জ্ঞান বিতরণ করতে পারতেন। 'পরাবিদ্যাই' ছিল বেদ-বিদ্যা লাভের চরম লক্ষ্য। অপরদিকে যে বিদ্যার মাধ্যমে স্থূল, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহে জ্ঞান লাভ করা যায় তা অপরাবিদ্যা নামে অভিহিত। সংক্ষেপে বলা যায়, পরাবিদ্যা অনুভূতি নির্ভর, অপরাবিদ্যা বস্তু নির্ভর। এ দু'প্রকার বিদ্যায় চতুরাশ্রমের মাধ্যমে অর্জন করতে হতো। বৈদিক সমাজে মানব জীবনকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যাকে চতুরাশ্রম বলা হয়। এগুলো হলো : ব্রহ্মচর্যাশ্রম, গার্হস্থ্যাশ্রম, বাণপ্রস্থাশ্রম এবং যতি বা সন্ন্যাস আশ্রম। ব্রহ্মচর্যাশ্রমকে অধ্যয়নকাল বলা হয়। সংসার জীবন নির্বাহ করার সময়কে গার্হস্থ্যাশ্রম বলা হয়। সংসার ত্যাগ করে অধ্যাত্ম চিন্তার সময়কে বাণপ্রস্থাশ্রম এবং মুক্তি কামনায় জীবনের শেষ সময় অতিবাহিত করাকে যতি বা সন্ন্যাস আশ্রম বলে।

ব্রহ্মচর্যাশ্রমে শিক্ষার সূচনা হয় গুরুগৃহে। এ শিক্ষার গভীর অনুশীলন বা চর্যা করা হয় গার্হস্থ্যাশ্রম, বাণপ্রস্থাশ্রম এবং যতি বা সন্ন্যাস আশ্রমে। ব্রহ্মচর্যাশ্রমে শিক্ষা গ্রহণ শেষে অনেকে গৃহী বা সংসার জীবন না করেই অরণ্যবাসী হতেন। তাঁরা সাধারণত লোকালয় হতে দূরে নির্জন স্থানে আশ্রম নির্মাণ করে বসবাস করতেন এবং 'অরণ্যক' নামে অভিহিত হতেন।

Dhaka University Institutional Repository

বরণজাতক (I. pp. 317-319) এবং লাঙ্গলীসজাতকে (I. pp. 447) উল্লেখ আছে যে, প্রাক্ বৌদ্ধযুগে শিক্ষার্থীগণ গুরুগৃহে বসবাস করে বিদ্যা অর্জন করতেন। দরিদ্র ছাত্ররা অর্থের বা উপঢৌকনের পরিবর্তে সেবার দ্বারা গুরুকে সন্তুষ্ট করতেন। এরূপ ছাত্রদের 'ধর্মান্তেবাসিক' নামে অভিহিত করা হতো। অবশ্য দূতজাতকে (IV. p. 224-227) সাক্ষ্য দেয় যে, দরিদ্র ছাত্ররা শিক্ষা সমাপনান্তে ভিক্ষা করে গুরুদক্ষিণা সংগ্রহ করতেন এবং তা দিয়ে গুরুর ঋণমুক্ত হতেন। এ জাতক হতে জানা যায় যে, বোধিসত্ত্বরূপী বারাণসীর এক ব্রাহ্মণ বিদ্যা সমাপনান্তে ভিক্ষার দ্বারা গুরু দক্ষিণা সংগ্রহ করেন। কিন্তু নদী পার হওয়ার সময় তা নদীর মধ্যে পড়ে যায়। তৎপর তিনি বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তকে ধর্মকথা শুনিয়ে পুনরায় গুরু দক্ষিণা লাভ করেন। লোসকজাতকে (I. pp. 236-241) উল্লেখ আছে যে, বারাণসীতে প্রথা অনুসারে গ্রামবাসীগণ দরিদ্র বালকদের ভরণপোষণ ও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতেন। এরূপ বালকেরা 'পুণ্যশিষ্য' নামে অভিহত হতো। লোসকজাতক এবং তক্কজাতক (I. pp. 295-299) পাঠে জানা যায় যে, গ্রামবাসীরা নিজ সন্তানদের শিক্ষা দানের জন্য শিক্ষকদের বাসস্থান ও বেতন প্রদান করতেন। সুসীমজাতক (II. pp. 46-50) এবং তিলমুট্‌ঠিজাতকে (II. pp. 277-282) উল্লেখ আছে, ধনীর পুত্রগণ বিদ্যারম্ভের পূর্বেই গুরুর 'ভাগ' বা 'দক্ষিণা' প্রদান করতেন। এরূপ শিক্ষার্থীদের 'আচার্য্যভাগদায়ক' বলা হতো। কটাহকজাতক (I. pp. 451-454) সাক্ষ্য দেয় যে, ধনীর পুত্রদের সরঞ্জামাদি বহন করে দাস-দাসীর সন্তানরাও গুরুগৃহে যেতো এবং নিজেরাও লেখা পড়া শিখতো। মিলিন্দ প্রশ্ন[৪] গ্রন্থ মতে, রীতি অনুসারে এককালীন গুরুদক্ষিণার পরিমাণ ছিল এক হাজার কহাপণ এবং একেকজন গুরুর অধীনে পাঁচশত জনের মধ্যে ছাত্র বিদ্যা অর্জন করতো।

তিত্তিরজাতক (III. pp. 537-543) হতে জানা যায়, শিক্ষার্থীরা গুরুগৃহে তিল, তণ্ডুল (ধান-চাউল), তৈল বস্ত্রাদি নিয়ে যেত। আত্মীয় স্বজন এবং অন্যান্য সমাজসেবকগণও গুরুগৃহে তণ্ডুলাদি, কাষ্ঠ এবং নানা উপকরণ প্রেরণ করতেন। এভাবে চতুস্পাঠির ব্যয় নির্বাহ হতো। থেরগাথা[৫] গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, বিদ্যায়তনগুলো প্রধানত নগরদ্বারের নিকটে অবস্থিত ছিল। এ গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, নগরদ্বারের নিকটে সভিয় নামক এক ব্যক্তির একটি বিদ্যায়তন ছিল যেখানে নগরবাসী শিশুরা শিক্ষা লাভ করতো। তিলমুট্‌ঠিজাতক এবং তুসজাতক (III. pp. 122-125) পাঠে জানা যায় যে, রাজপুত্রগণ এবং ব্রাহ্মণপুত্রগণ প্রথমে নিজ গৃহে বিদ্যা অর্জন করতেন, তৎপর ষোল বছর বয়সে উচ্চশিক্ষার জন্য তক্ষশিলায় গমন করতেন। নলিনীভূষণ দাসগুপ্তের মতে, পাঁচ হতে চৌদ্দ বছরের মধ্যে গৃহের শিক্ষা সমাপ্ত করে উচ্চ শিক্ষার নিমিত্তে গুরুকুলে যোগ দিতেন।[৬] বিনয়পিটক[৭] হতে জানা যায়, রাজকুমার সিদ্ধার্থ

ষোল বছর বয়সে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেছিলেন। তবে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়গণই প্রধানত উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতেন। সম্ভ্রান্তবংশীয় লোকদের মাঝে এ প্রথা প্রচলিত ছিল যে, উচ্চশিক্ষা সমাপ্তের পূর্বে বিবাহ করতেন না এবং বিষয়কর্মেও হাত দিতেন না। দূতজাতক (IV. p. 225) এবং তিলমুট্‌ঠিজাতকে (II. pp. 278-9) উল্লেখ আছে যে, উচ্চশিক্ষার জন্য তক্ষশিলা, বারাণসী এবং প্রধান প্রধান নগরসমূহে চতুষ্পাঠি ছিল। তবে তক্ষশিলার চতুষ্পাঠির খ্যাতি ছিল সর্বাধিক। উক্ত জাতকদ্বয়ে ষোল বছর বয়সে রাজপুত্র এবং ব্রাহ্মণপুত্রগণ তক্ষশিলায় বিদ্যা অর্জনে যেতেন বলে উল্লেখ আছে। তৎকালে তক্ষশিলায় বিদ্যা শিক্ষা না করলে কাহারো শিক্ষা সমাপ্ত হতো না বলে মনে করা হতো। সুরুচিজাতক (IV. p. 316) পাঠে জানা যায় যে, মিথিলার রাজপুত্র সুরুচিকুমার এবং বারাণসীর রাজপুত্র ব্রহ্মদত্তকুমার ছিলেন সমবয়সী এবং উভয়ে বিদ্যাশিক্ষার জন্য তক্ষশিলা গমন করেন। গৌতম বুদ্ধ এবং রাজা বিম্বিসারের চিকিৎসক জীবক তক্ষশিলায় অধ্যয়ন করেন বলে জাতকে উল্লেখ পাওয়া যায়। চূল্লকসেট্‌ঠিজাতক (I. p. 114) এবং সংকিচ্চজাতক (V. p. 261) পাঠে জানা যায় যে, জীবক বৌদ্ধধর্মের অন্যতম অনুসারী ছিলেন এবং একটি বৃহৎ আম্র কানন বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘের জন্য দান করেন, যা 'জীবকাম্রবন' নামে পরিচিত ছিল। জানা যায় যে, উচ্চ শিক্ষার গ্রহণের জন্য বা কোনো বিষয়ে পারদর্শীতা অর্জনের জন্য প্রসিদ্ধ গুরুর অধীনে সাত বছর অধ্যয়ন করতে হতো। চূল্লবর্গ[৮] সাক্ষ্য দেয় যে, দব্বমল্লপুত্র নামক এক ভিক্ষু বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন বিষয়ে সাত বছর উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের পর ভিক্ষুদের তত্ত্বাবধানের সুযোগ লাভ করেন। দীর্ঘনিকায়[৯] গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, রাজবৈদ্য জীবক সাত বছর তক্ষশিলায় চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। বিনয়পিটক[১০] মতে, জীবক তক্ষশিলায় চিকিৎসা শাস্ত্রে পারদর্শীতা অর্জনের পরেই নিজে রোগীর চিকিৎসা করার দায়িত্ব বা অনুমতি লাভ করেছিলেন। জানা যায়, অর্থশাস্ত্র প্রণেতা চাণক্য, বিখ্যাত বৈয়াকরণিক পাণিনি তক্ষশিলার ছাত্র ছিলেন।[১১] এতে বোঝা যায়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হতে বিদ্যার্থীরা তক্ষশিলায় আগমন করতেন এবং শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে তক্ষশিলার মর্যদা ছিল সর্বোচ্চে। তক্ষশিলার খ্যাতি প্রসঙ্গে এস. সি. দাস বলেন (S. C. Das), "এ বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি পশ্চিমে পারস্য, উত্তরে ব্যকটেরিয়া এবং পূর্বে প্রাচ্য পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।"[১২] মিলিন্দ প্রশ্ন[১৩] গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, তক্ষশিলায় ত্রিবেদের পাশাপাশি আঠার প্রকার বিদ্যা শিক্ষা দান করা হতো। বৈদিক যুগে ত্রিবেদ (ঋক্, সাম এবং যজু) শিক্ষা ছিল বাধ্যতামূলক। কারণ সেকালে ত্রিবেদকে শিক্ষাগত যোগ্যতা পরিমাপের প্রধান মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা হতো। অঙ্গুত্তরনিকায়, অঙ্গুত্তরট্‌ঠকথা, থেরগাথা প্রভৃতি গ্রন্থ সাক্ষ্য দেয় যে, বুদ্ধের সময়ে পিণ্ডোলভারদ্বাজ নামক এক ব্রাহ্মণকে ত্রিবিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জনের পর ব্রাহ্মণ কুমারদের শিক্ষা প্রদানের

Dhaka University Institutional Repository

দায়িত্ব দেয়া হয়। জানা যায় যে, তিষ্য নামক রাজগৃহের এক ব্যক্তিও ত্রিবেদে পারদর্শিতা লাভের পর পাঁচশত যুবককে বৈদিক মন্ত্র শিক্ষা দানের অনুমতি লাভ করেন।[১৪] ত্রিবেদের পাশাপাশি যুদ্ধবিদ্যা, বিশেষত ধনু, অশ্ব, রথ, সৈন্য সঞ্চালন প্রভৃতিও শিক্ষা দান করা হতো। অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়গণই যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করতেন। এছাড়া, মন্ত্র, শ্রুতি, স্মৃতি, সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, চিকিৎসা (আয়ুর্বেদ), অর্থববেদ, পুরাণ, ইতিহাস, জ্যের্তিবিদ্যা, যাদুবিদ্যা, গণিত বিদ্যা, তর্কবিদ্যা, নীতিবিদ্যা, নিধিবিদ্যা (খনিজ শাস্ত্র), দেবজনবিদ্যা (নৃত্য, গীত, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতি), সর্পবিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ছন্দ, কাব্য, ব্যাকরণ, লিখন প্রভৃতি শিক্ষা দান করা হতো।[১৫] এতে ধারণা করা যায় যে, সে সময় বেদ শিক্ষা তথা ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি সাধারণ বা সেকুল্যার শিক্ষাও দান করা হতো। এ প্রসঙ্গে নলিনীভূষণ দাসগুপ্ত বলেন,

"এই সময়ের পাঠ-পরিকল্পনার বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, বর্ণাশ্রমভূক্ত সকল সম্প্রদায়কেই ধর্মানুষ্ঠানের জন্য কিছু শাস্ত্রীয় শিক্ষা লাভ করিতে হইত। কিন্তু পূর্বের ন্যায় সংহিতা ও ব্রাহ্মণভাগকে আশ্রয় করিয়া শিক্ষা-রীতির পরিবর্তন প্রয়োজন হইয়াছিল। ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা এই সময়ে বিশেষভাবে অনুভূত হয়। শব্দ-বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করতে না পারিলে কোন শিক্ষালাভই সম্ভব হইত না। ব্যবহারিক জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় গণিত, বিজ্ঞান, ধনুবিদ্যা, জ্যোতিষ, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ের অনুশীলন এই সময়ে যথেষ্ট প্রসার লাভ করিছিল।"[১৬]

অনেক সময় বহু শাস্ত্রে বিদ্যা লাভের জন্য শিক্ষার্থীগণ আজীবন ব্রহ্মচর্যা পালন করতেন। এঁদেরকে 'নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী' বলা হতো।[১৭] শিক্ষকগণ শিক্ষাদানকে ধর্মীয় অনুজ্ঞা হিসেবে গ্রহণ করতেন। শিক্ষার্থীরাও শিক্ষালাভকে ধর্মের অঙ্গ মনে করতো। তিলমুট্‌ঠিজাতক (II. pp. 277-282) সাক্ষ্য দেয় যে, অভদ্র আচরণের জন্য গুরু কখনো কখনো শিষ্যকে শারীরিক দণ্ড প্রদান করতেন। উপবাসাদির মাধ্যমেও দণ্ডদানের বিধান প্রচলিত ছিল।[১৮] শিষ্যকে সর্বশিক্ষা তথা গুরুর অধিগত সকল বিদ্যা শিক্ষা দান করাই ছিল গুরুর কাজ। কিন্তু উপাহনজাতক (II. pp. 221-224) এবং গুত্তিলজাতকে (II. pp. 248-257) উল্লেখ পাওয়া যায় যে, গুরুরা শিষ্যদের কিছু কিছু বিষয় অব্যাখ্যাত রেখে বা গোপন রেখে শিক্ষা দান করতেন। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে যাতে শিষ্যরা তর্ক যুদ্ধে বা প্রতিযোগিতায় গুরুকে পরাজিত করতে না পারে। যেসব বিষয় অব্যাখ্যাত রাখতেন বা শিক্ষা দিতেন না তা 'আচার্য্যমুষ্টি' নামে অভিহিত। মহাসূতসোমজাতক (V. pp. 457-511) মতে, মেধাবী ছাত্ররা গুরু বা আচার্যদের অধ্যাপনাকার্যে সাহায্য

Dhaka University Institutional Repository

করতেন। এরূপ সাহায্যকারী ছাত্ররা 'পৃষ্ঠাচার্য্য' নামে পরিচিত ছিলেন এবং আচার্য বৃদ্ধ হলে এরূপ ছাত্রদের চতুষ্পাঠির অধ্যক্ষ নিয়োজিত করতেন। কৃতকার্যের সহিত শিক্ষা সমাপনান্তে কোনো ছাত্র যখন বাড়িতে ফিরে আসতো, তখন বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এবং পাড়া-প্রতিবেশী প্রচুর আনন্দোল্লাস করতো। জনসন্ধজাতক (IV. pp. 176-178) পাঠে জানা যায়, বারাণসীর রাজকুমার শিক্ষা সমাপন করে রাজপ্রাসাদে ফিরে এলে রাজা খুশীতে রাজ্যের সকল বন্দীদের মুক্ত করে দেন। পলায়িজাতক (II. pp. 217-218), বীতিচ্ছজাতক (II. pp. 257-259) এবং চূল্লকালিঙ্গজাতক (III. pp. 3-8) হতে জানা যায়, শিক্ষা সমাপনান্তে যশখ্যাতি লাভের আশায় অনেক শিষ্য দূর দূরান্তে গিয়ে পণ্ডিতদের সঙ্গে পণ বাজি রেখে তর্কযুদ্ধে লিপ্ত হতেন। সেতকেতুজাতক (III. p. 232-237) সাক্ষ্য দেয় যে, ব্রাহ্মণবংশীয় শ্বেতকেতু নামক এক ব্যক্তি এক চণ্ডালের নিকট তর্কে পরাস্ত হয়ে অপমানিত হন।

বৈদিক যুগে প্রাথমিক শিক্ষায় মন্ত্রের বিশুদ্ধ উচ্চারণের প্রতি লক্ষ্য রাখা হতো। উচ্চারণের পর শব্দ, বাক্য গঠন, অর্থ-প্রণিধানের শিক্ষা প্রদান করা হতো। সনাতন ব্যবস্থায় শুচিতা রক্ষার জন্য প্রথম দিকে বেদ বাক্যের লিখন নিষিদ্ধ ছিল। পরে পঠনের পাশাপাশি লিখনও শিক্ষা দান করা হতো। এই শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল গুরু বা আচার্য কেন্দ্রিক। তপস্যালব্ধ-ঐশ্বর্যে শিষ্যকে সমৃদ্ধ করাই ছিল গুরুর ব্রত। গুরু শিষ্যের আত্মিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে চলতো জ্ঞান সাধনা। গুরুর ব্যক্তিত্ব, উন্নত চরিত্র, সুগভীর প্রজ্ঞা এবং জীবনাদর্শ ছিল শিষ্যের একান্ত অনুকরণীয়।[১৯] আচার্যগণ নতুন নতুন শিক্ষা পদ্ধতি উদ্ভাবন করে পরম যত্নে শিষ্যদের শিক্ষা দিতেন। এ কারণে সমাজে ও রাষ্ট্রে আচার্যগণ যথেষ্ট মর্যদা লাভ করতেন। ছাত্ররাও আচার্যের প্রতি সম্যকভাবে দায়িত্ব পালন করতেন। এভাবে গুরু-শিষ্যের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে প্রাচীন ভারতে তথা বৈদিক যুগে জ্ঞান চর্চা করা হতো।

২.৩.২. বৌদ্ধ যুগীয় শিক্ষা ব্যবস্থা

বৌদ্ধধর্ম প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ও শিক্ষা ব্যবস্থায় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। বৈদিক শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে ক্ষেত্র বিশেষে সাদৃশ্য থাকলেও বুদ্ধ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও প্রচার-প্রসার লাভপূর্বক ভারতীয় সমাজ জীবন ও শিক্ষা জগতে বিপ্লব সৃষ্টি করে। নিম্নে পালি সাহিত্যের তথ্য বিশ্লেষণপূর্বক বুদ্ধ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ উপস্থাপন করা হলো :

প্রথমত, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ সকলের জন্য বুদ্ধ প্রবর্তিত শিক্ষার দ্বার ছিল উন্মুক্ত। ফলে সাধারণ মানুষও ব্রাহ্মণ্য সমাজে গণ্ডিভূত থাকা শিক্ষার অধিকার লাভ করে। এভাবে বৌদ্ধযুগে শিক্ষা ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক আদর্শ স্থাপিত হয়। মাতঙ্গজাতক (IV. pp. 376-389) সাক্ষ্য দেয় যে, মাতঙ্গ নামক এক চণ্ডাল জ্ঞানার্জন পূর্বক মাতঙ্গপণ্ডিত নামে বিখ্যাত হয়।

দ্বিতীয়ত, বুদ্ধ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তে সাধারণ মানুষের মাতৃভাষা তথা প্রাকৃত ভাষাকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা হয়। ফলে বিশাল জনগোষ্ঠি মাতৃভাষায় বিদ্যাচর্চার সুযোগ লাভ করে এবং শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেতে থাকে।[২০]

তৃতীয়ত, বুদ্ধ প্রবর্তিত শিক্ষার মূল কেন্দ্র ছিল বৌদ্ধ বিহার। ফলে নগরকেন্দ্রিক শিক্ষা বৌদ্ধযুগে রাষ্ট্রের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। বৌদ্ধ বিহারে সমষ্টিগতভাবে জীবন যাপন করায় শিক্ষার্থীরা আত্মনির্ভরশীল হওয়ার, ব্যক্তিত্ব গঠনের এবং সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হওয়ার সুযোগ লাভ করতেন।

চতুর্থত, বুদ্ধ প্রবর্তিত শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু ছিল জনগণ এবং মানুষের দুঃখনিবৃত্তি দিক নির্দেশনা প্রদান করায় এ শিক্ষা সাধারণ জনগণকে সহজেই আকৃষ্ট করে দ্রুত প্রসার লাভে সক্ষম হয়।[২১]

পঞ্চমত, বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় উপাধ্যায় এবং আচার্য এ দু'জন শিক্ষকের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। উপাধ্যায় শিক্ষার্থীকে বিদ্যা বিতরণ করতেন। অপরদিকে, আচার্য বিনয়-ব্যবহার বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। বিনয়পিটক[২২] সাক্ষ দেয় যে, দক্ষ ও অভিজ্ঞ উপাধ্যায় ও আচার্যগণ বিভিন্ন বিষয়ে যাতে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান বৃদ্ধি পায় সেই উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদের পরিচালিত করতেন। উপাধ্যায় এবং আচার্য আমৃত্যু অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকতেন। তাঁরা আজীবন কৌমার্য অবলম্বন করতেন বিধায় শিক্ষাদানে কোনো রকম বিঘ্ন সৃষ্টি হতো না। তছাড়া, বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় দুই শ্রেণির শিক্ষক শিক্ষা দান করতেন বিধায় শিক্ষার্থীর গুণাগুণ লক্ষ্য করে শিক্ষা দান সম্ভব হতো।

ষষ্ঠত, গুরু শিষ্য ছাড়াও বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় সঙ্ঘের সদস্যগণও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। তাঁরা শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব বিকাশ সাধনে দায়িত্ব পালন করনে।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তমত, সঙ্ঘনায়কগণ সাধারণ জনগণের উপযোগী উদার পাঠ পরিকল্পনা প্রনয়নপূর্বক শিক্ষা দান করতেন। তজ্জন্য বর্হির্বিভাগীয় বিদ্যায়তন এবং আভ্যন্তরীণ সঙ্ঘ বিদ্যায়তন প্রবর্তন করা হয়।[২৩] বর্হির্বিভাগীয় বিদ্যায়তন ছিল সঙ্ঘবর্হির্ভূত সাধারণ জনগণের জন্য। এরা লৌকিক বিষয়সমূহ অধ্যয়ন করতেন। আভ্যন্তরীণ সঙ্ঘ বিদ্যায়তনে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী এবং শ্রমণগণ বিদ্যাশিক্ষা করতেন।

অষ্টমত, সাধারণ জনগণের আর্থিক অনুদানে বৌদ্ধ বিহারগুলো নির্মিত হওয়ায় বৌদ্ধদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রথম ভারতীয় উপমহাদেশে সাধারণ বিদ্যায়তন সৃষ্টি হয় এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যা অধিক হওয়ায় শ্রেণি শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

নবমত, বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় বৌদ্ধধর্ম-দর্শন শিক্ষার পাশাপাশি বেদ, দর্শন, গণিত, জ্যোতিষশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা, তর্কবিদ্যা, ভাষা প্রভৃতি জীবন ঘনিষ্ট সাধারণ ও লৌকিক বিষয়েও শিক্ষা দান করা হতো।

উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্য ছাড়াও, নারী শিক্ষা ছিল বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার আর এক অভিনব সূচনা। ভিক্ষুণী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা নারী শিক্ষার হারকে বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেয়। ফলে, ভারতবর্ষে বৌদ্ধযুগে নারী শিক্ষা যথেষ্ট প্রসার লাভ হয়। এসময় নারীরা জ্ঞানের নানা বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করে সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হন। পালি সাহিত্যে মহাপ্রজ্ঞাসম্পন্না, ধর্মকথিকা, বিনয়ধরা, স্মৃতিসম্পন্না, মহাবাগ্মী, সুবক্তা প্রভৃতি নানা বিশেষণ মণ্ডিতা নারীর উল্লেখ পাওয়া যায়। থেরীগাথার অট্ঠকথা[২৪] সাক্ষ্য দেয় যে, ভদ্দা কুণ্ডলকেসা নিগণ্ঠদের ধর্মমত অনুসারী ছিলেন, পরে বৌদ্ধ পণ্ডিতদের নিকট হতে জ্ঞান লাভ করেন। তর্কশাস্ত্রে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন এবং তর্কে সারীপুত্র ব্যতীত অন্যকেউ তাঁর সমকক্ষ ছিলেন না। তিনি আদর্শ শিক্ষিকাও ছিলেন।[২৫] মজ্ঝিমনিকায়[২৬] এবং অঙ্গুত্তর নিকায়ে[২৭] উল্লেখ আছে যে, বুদ্ধের সময় রাজগৃহ নগরের ধর্মদিন্না ছিলেন প্রখর স্মৃতিশক্তি এবং দার্শনিক জ্ঞান সম্পন্না। এ কারণে তাঁর সুখ্যাতি ভারতবর্ষের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। কারণ সেসময় স্মৃতিচারণ ছিল শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, যা জ্ঞানাহরণের সর্বাপ্রেক্ষা নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত হতো। থেরীগাথায়[২৮] নন্দত্তরা নামক এক ভিক্ষুণীর উল্লেখ আছে, যিনি শিল্প-বিজ্ঞান ও বাগ্মিতায় অসীম পারদর্শী ছিলেন। পরমত্থদীপনী নামক অট্ঠকথা[২৯] হতে জানা যায়, ভিক্ষুণী ক্ষেমা ছিলেন অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতি এবং সুবক্তা। তিনি ভিক্ষুণী বিনয়েও পারদর্শী ছিলেন। বৌদ্ধধর্মের

Dhaka University Institutional Repository

জটিলবিষয়সমূহ তিনি অতি সহজ-সরলভাবে ব্যাখ্যা করতে পারতেন। সংযুক্তনিকায়ে[৩০] উল্লেখ আছে যে, তিনি রাজা প্রসেনজিতকে পঞ্চস্কন্ধ বিষয়ে ধর্মোপদেশ দান করে বিমুগ্ধ করেছিলেন।

জাতকে বহু শিক্ষিত নারীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ভদ্দসালজাতকে (IV. p. 153-155) উল্লেখ আছে, কুমার বিড়ূঢ়ব কপিলাবস্তু যাবার আগেই বাসবক্ষত্রিয় মহানামকে পত্র দ্বারা জানিয়ে দেন, তাঁর বিবাহ রহস্য যেন কুমার বিড়ূঢ়ব জানতে না পারে। অসাতরূপজাতক (I. p. 409-411) পাঠে জানা যায়, কোসলরাজ কর্তৃক বারাণসীরাজ্য করতলগত হওয়ায় বারাণসীর রাজকুমার কোসলরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতি নেন। এসময় তাঁর মাতা পত্র দ্বারা তাঁকে সাবধান করেন এবং উপদেশ স্বরূপ বলেন যুদ্ধের পরিবর্তে নগর অবরোধ করাই কুমারের জন্য শ্রেয়। আদিত্তজাতকে (III. p. 470-474) উল্লেখ আছে যে, সৌবীর রাজ্যের রাজা ভরতের সমুদ্র বিজয়া নামক মহিষী ছিলেন সুপণ্ডিত এবং জ্ঞানবতী। তিনি স্বামীকে সদুপদেশ দিয়ে সর্বদা সাহায্য করতেন। মহানারদকস্সপজাতকে (VI. pp. 220-255) উল্লেখ আছে যে, রুজা নাম্নী এক বিদুষী শাস্ত্রজ্ঞ রাজকন্যা ছিলেন, যিনি যুক্তিতর্কে পিতার কুসংস্কার ও মিথ্যা ধর্মবিশ্বাস অপনোদন করেন। মহাউম্মগ্গজাতকে (VI. pp. 330-47) অমরাদেবীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়, যিনি স্বলিখিত প্রমাণাদি উপস্থাপনপূর্বক চারজন সভাপণ্ডিতের চালাকী অপনোদন করেছিলেন। চূল্লকালিঙ্গজাতকে (III. p. 3-8) বিভিন্ন মতবাদে পারদর্শী বৈশালীর বহু বিদুষী রমণীর উল্লেখ আছে, যাঁরা মাতা-পিতার নিকট নানা মতবাদে ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। উক্ত জাতক পাঠে জানা যায়, বৈশালীরা সেইসব বিদুষীরা পণ করেন, তর্কে কোনো গৃহীর নিকট পরাস্ত হলে তাঁর পত্নী হবেন, আর পরিব্রাজকের নিকট পরাস্ত হলে তাঁর শিষ্যা হবেন। জানা যায় যে, প্রাচীনকালে পুরুষের ন্যায় নারীরাও চৌষট্টি প্রকার কলা বিদ্যার অন্তর্গত বহু বিষয়ে শিক্ষিত হতেন।[৩১] যেসব বিষয়ে নারী অধিক শিক্ষা অর্জন করতেন তন্মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ[৩২] উল্লেখযোগ্য :

সঙ্গীতশাস্ত্র : নৃত্য-গীত-বাদ্য।

নাট্যশাস্ত্র : অভিনয়।

সাজসজ্জা : পুষ্পসজ্জা, মালাগ্রন্থন, উদ্যান রচনা, সৌন্দর্য বর্ধক অঙ্গরাগাদি, পোষাক-পরিচ্ছদ, সুচীশিল্প, গৃহসজ্জা - অলংকরণ, স্থাপত্য-ভাস্কর্য, মৃৎশিল্প প্রভৃতি।

কৌশল বিষয়ক : ইন্দ্রজাল বা যাদুবিদ্যা, ভোজবিদ্যা, প্রহেলিকাময় বাক্য বা ধাঁধাঁ।

শস্ত্রবিষয়ক : তলোয়ার, সড়কী, বর্শা, ধনু প্রভৃতি চালনা।

অঙ্গবিদ্যা : শরীরচর্চা, স্বাস্থ্য বিষয়ক ভেষজ জ্ঞান, কামসূত্র বা অঙ্গ বিষয়ক শিক্ষা।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাণী-শিক্ষা প্রণালী : মেষ, তিমির পক্ষী ও মোরগকে লড়াইয়ে প্রস্তুত করা, এবং ময়না, তোতা প্রভৃতিকে বুলি শেখানো প্রভৃতি শিক্ষা প্রণালী।

বিদ্যা বিষয়ক : সাংকেতিক লিখন প্রণালী, বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা, চিত্রাঙ্কন ইত্যাদি।

পালি সাহিত্য পাঠে ধারণা জন্মে যে, গৃহস্থ কন্যা অপেক্ষা বারবণিতাগণই অধিক সঙ্গীত শিক্ষা করতেন। কারণ প্রাচীনকালে উচ্চশ্রেণির বারাঙ্গনারূপে স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য শুধু রূপ-যৌবনই নয়, নানাবিধ কলাবিদ্যাতেও পারদর্শীতা অর্জন করতে হতো। বিনয়পিটক[৩৩] গ্রন্থ সাক্ষ্য দেয় যে, রাজগৃহের শালবতী নামক এক বারবণিতা ছিলেন, যিনি নাচ, গান এবং বংশীবাদনে পারদর্শী ছিলেন। থেরীগাথা গ্রন্থটি বিভিন্ন বিদুষী নারীর রচনার সংকলন। গ্রন্থটি সমীক্ষা করলে দেখা যায়, বুদ্ধের সময়কালে নারীরা রীতিমতো শিক্ষিতা ও সংস্কৃতি সম্পন্না ছিলেন। তাঁদের রচিত গাথাগুলোতে যেসব গুরুগম্ভীর অর্থবোধক শব্দ, উপমা এবং রূপকের উল্লেখ পাওয়া যায় তাতে প্রতীতি জন্মে যে, তাঁরা বৌদ্ধধর্ম-দর্শনের পাশাপাশি লৌকিক বিষয়েও প্রাজ্ঞ ছিলেন। শ্রী বিমলাচরণ লাহা এবং বীণা চট্টোপাধ্যায় তাঁদের রচিত গ্রন্থে বহু শিক্ষিত রমণীর উল্লেখ করেন।[৩৪] বুদ্ধ বহু বিষয়ে জ্ঞান অর্জনকে 'উত্তম মঙ্গল' হিসেবে অভিহিত করেছেন।[৩৫] এতে বোঝা যায়, বৌদ্ধযুগে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি লৌকিক বিষয়েও জ্ঞান অর্জনে উদ্বুদ্ধ করা হতো।

বৌদ্ধযুগে উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুখ্যাতি সর্বত্র বিস্তৃতি লাভ করে। তক্ষশিলা ছিল গান্ধারের রাজধানী। বৈদিকযুগ হতেই তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুখ্যাতি ছিল।[৩৬] এটি প্রথমে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রাদির কেন্দ্র হিসাবে খ্যাতি লাভ করে। বৌদ্ধযুগে বৌদ্ধশিক্ষা স্বতন্ত্র শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিণত হলে তক্ষশিলা বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবেও প্রসিদ্ধি লাভ করে। ব্যবহারিক শিক্ষাদান এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। এখানে ষোড়শবর্ষ বয়ঃপ্রাপ্তি হলে ভর্তি হওয়া যেত এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হতে এখানে বিদ্যা অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীরা আগমন করতো।[৩৭] প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের[৩৮] মতে, মূলত তক্ষশিলায় পাঠ আরম্ভ নয়, পাঠ সমাপ্তির জন্যই যাওয়া হতো। তিলমুট্‌ঠিজাতকে (II. pp. 278-9) উচ্চশিক্ষার স্থান হিসেবে তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুখ্যাতি বর্ণিত আছে। শিক্ষাক্ষেত্রে তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান সম্পর্কে প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের অভিমত প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে,

"প্রাচীন ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয় যে উন্নত মান স্থাপন করিয়াছিল তাহা চিন্তা করিলে ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার মৌলিকত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। চাণক্য ও পাণিনির গ্রন্থসমূহ বিচারবুদ্ধি-প্রসূত শিক্ষা-পদ্ধতির পরিণত ফল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য কৃতবিদ্য ছাত্রদের উল্লেখ না

Dhaka University Institutional Repository

করিলেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, জীবক, পাণিনি ও কৌটিল্য, তক্ষশিলার এই তিনজন ছাত্র যে কোনো দেশের, যে কোনো যুগের শ্রদ্ধার পাত্র।"[৩৯]

পরবর্তীকালে তক্ষশিলার আদলে বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে নালন্দা, বিক্রমশিলা, সোমপুরী, শালবন, বলভী, সারনাথ প্রভৃতি বিদ্যায়তন গড়ে ওঠে। দেশ-বিদেশেও এসব বিদ্যায়তনের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল এবং দেশে-বিদেশের বিদ্যোৎসাহী শিক্ষার্থীগণ এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যা অর্জনে আগমন করতেন। চৈনিক ভ্রমণবৃত্তান্ত হতে জানা যায় যে, চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাং, ইৎ-সিং সহ বহু বিদগ্ধ পণ্ডিত উপর্যুক্ত বিদ্যায়তনসমূহে শিক্ষা লাভ করেছিলেন।[৪০]

৩. প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি

সংস্কৃতি হচ্ছে একটি জাতির মাপকাটি। সংস্কৃতির মর্মবাণী হলো জীবিকার প্রয়াস চালানো। মানুষ নানা পেশা ও বিষয় অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহের প্রচেষ্টা চালায়। নাচ, গান, বাজনা, ক্রীড়া-কৌতুক, আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি এদের অন্তর্গত।[৪১] সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নানাভাবে মানুষের মনে প্রেরণা যোগায়। ফলে যাঁরা সংস্কৃতি চর্চা করেন কেবল তাঁদের মননশীলতা এবং রুচিবোধ সমৃদ্ধ হয় তা নয়, যাঁরা উপভোগ করেন তাঁদেরও মননশীলতার উন্নতি ঘটায়। পালি সাহিত্যে অসংখ্য সংস্কৃতি প্রেমিক সঙ্গীতজ্ঞ, অভিনেতা, অভিনেত্রী, নট-নটী, বাদক, ক্রীড়াবিদের উল্লেখ পাওয়া যায়। ফলে ধারণা করা যায় যে, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল। এ অনুচ্ছেদে জাতক, অন্যান্য পালি-সংস্কৃত গ্রন্থ এবং ঐতিহাসিক আকর গ্রন্থের তথ্যের আলোকে প্রাচীন ভারতের সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হবে।

৩.১. আমোদ-প্রমোদ ও উৎসবাদি

ঐতিহাসিক আকর গ্রন্থ সাক্ষ্য দেয় যে, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে নানারকম উৎসবের প্রচলন ছিল। জাতক পাঠে জানা যায় যে, বার-তিথি-নক্ষত্রের অবস্থান অনুসারে উৎসবসমূহ পালিত হতো এবং ভেরীবাজিয়ে উৎসবের সময় ঘোষণা করা হতো। দুম্মেধজাতক (I. p. 259) মতে, উৎসবের সময় গ্রাম-নগর সুন্দরভাবে সাজানো হতো। সুসীমজাতকে (II. pp. 45-50) বর্ণিত আছে যে, উৎসবের সময় জাঁকজমকপূর্ণ শোভাযাত্রার আয়োজন করা হতো এবং শোভাযাত্রায় নানাভাবে সজ্জিত করে হাতি ব্যবহার করা হতো। উম্মাদন্তীজাতক (V. p. 210-227) মতে সর্বপ্রেক্ষা প্রধান উৎসব পালিত হতো কার্তিক মাসে, বিশেষত

Dhaka University Institutional Repository

কার্তিক পূর্ণিমায়, যা কার্ত্তিকোৎসব নামে পরিচিত ছিল। বট্টকজাতক (I. pp. 432-425) সাক্ষ্য দেয় যে, কার্ত্তিকোৎসব সাতদিন বা সপ্তাহকাল স্থায়ী হতো। এ ছাড়াও পালি সাহিত্যে আরো নানারকম উৎসব এবং মেলার আয়োজন করা হতো বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। তিত্তিরজাতক (III. p. 538), বিনয়পিটক[৪২] এবং ধম্মপদট্ঠকথায়[৪৩] উল্লেখ আছে যে, জনসাধারণের আমোদ-প্রমোদের উদ্দেশ্যে রাজগৃহ নগরের এক পর্বতের উপর প্রতিবছর 'গিরগ্গসমজ্জ' নামক এক প্রসিদ্ধ মেলার আয়োজন করা হতো। জাতকে এবং দীর্ঘনিকায়[৪৪] গ্রন্থে বর্ণিত আছে, এসব উৎসবে নানা পেশার শিল্পী শিল্প দক্ষতা প্রদর্শন করে জনসাধারণকে আনন্দ দান করতেন এবং অর্থ উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। বিশেষত নাচ-গান-বাজনা, যাদু, কৌতুক, কুস্তি, মুষ্টিযুদ্ধ, দণ্ডযুদ্ধ, নানারকম কলাকৌশল বা খেলা, বিভিন্ন প্রাণীর লড়াই প্রভৃতি ছিল উৎসবের মূল আকর্ষণ। ভেরীবাদজাতক (I. p. 283-284), গুত্তিলজাতক (II. pp. 248-257), পদকুসলমানবজাতকে (III. pp. 502-513) উৎসবের সময় নাচ, গান এবং বাদ্য পরিবেশন করে জনসাধারণকে আনন্দ দানপূর্বক অর্থ উপার্জনের কথা বর্ণিত আছে। চিত্তসম্ভূতজাতক (IV. pp. 390-400) পাঠে জানা যায় যে, চণ্ডালেরা নগরের প্রবেশপথে বাঁশ-নৃত্য প্রদর্শন করে অর্থ উপার্জন করতো। নারী-পুরুষের একত্রে জাঁকজমকপূর্ণ গালিচার উপর আকর্ষণীয় নৃত্য-গীত পরিবেশনের বিষয় বর্ণিত আছে চূল্লবর্গ গ্রন্থে।[৪৫] সেকালে প্রত্যেক ধনাঢ্য ব্যক্তির বাড়িতে গায়িকা এবং নৃত্য শিল্পী থাকতো। তবে পেশাধারী শিল্পীরা নানাস্থানে শিল্প-কুশলতা প্রদর্শন করে অর্থ উপার্জন করতেন। নচ্চজাতকে (I. p. 207) নাচ গান পরিবেশনের সময় বীণা, ঢোল (আতত, বিতত), করতাল, খোল (সুপিরা) প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাজানো কথা উল্লেখ রয়েছে। বুদ্ধের সময়কালে অম্রপালি এবং সালবতী নাচ-গান-বাজনায় সুনিপুণা ছিলেন বলে জানা যায়। তাঁদের রূপ-যৌবন এবং শিল্প-নৈপুণ্যে আকৃষ্ট হয়ে দেশ-বিদেশের বহু রাজা এবং ধনাঢ্য ব্যক্তি তাঁদের সঙ্গলাভের আশায় ছুটে আসতেন। তন্মধ্যে মগধরাজ বিম্বিসার ছিলেন অন্যতম।[৪৬] সালকজাতক (II. pp. 267-268) এবং অহিগুণ্ডিকজাতকে (III. pp. 198-199) উল্লেখ আছে যে, উৎসবের সময় বা বিভিন্ন জনপদে সাপুড়েরা সাপ ও বানর নিয়ে নানা কলাকৌশল প্রদর্শনপূর্বক দর্শকদের আনন্দ দান করে অর্থ উপার্জনের করতেন। সাপ ও বানর নিয়ে কলাকৌশল প্রদর্শনপূর্বক অর্থ উপার্জনের বিষয়টি ভারতীয় উপমহাদেশে বর্তমানেও দেখা যায়। পুপ্ফরত্তজাতক (I. pp. 499-500) এবং গঙ্গমালজাতকে (III. p. 444-453) উল্লেখ আছে যে, ধনী-গরিব নির্বিশেষে বৈচিত্র ও সুরঞ্জিত পোষাক এবং সুগন্ধি মাল্যদ্রব্য পরিধান করে উৎসবে যোগদান করতেন। গঙ্গমালজাতকে উল্লেখ আছে এক মজুর উৎসবে গিয়ে সঞ্চিত অর্থের এক অংশ দ্বারা মাল্য, এক অংশ দ্বারা গন্ধ এবং এক অংশ দ্বারা

Dhaka University Institutional Repository

সুরা ক্রয় করে। সুরাপানজাতকে (I. p. 361-362) নানা স্থানে পানাগার থাকার কথা এবং এসব পানাগারে সুরাপায়ীরা গিয়ে পিপাসা নিবৃত্ত করতো বলে উল্লেখ আছে। এতে বোঝা যায়, প্রাচীনকালে উৎসবের সময় সুরাজাতীয় মাদকদ্রব্য পান করার রীতিও প্রচলিত ছিল।

৩.২. কলাকৌশল ও ভোজবাজি প্রদর্শন

জাতক এবং বিভিন্ন পালি গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, উৎসব ছাড়াও নানা স্থানে নানা পেশার লোক এবং ভবঘুরেরা ভোজবাজি এবং কলাকৌশল প্রদর্শন করে আনন্দ দানপূর্বক অর্জিত অর্থে জীবিকা নির্বাহ করতো। দসন্নকজাতকে (III. pp. 337-341) নানা রকম কলা-কৌশল প্রদর্শনের কথা বর্ণিত আছে। এ জাতকে উল্লেখ আছে যে, একদা এক কৌশল প্রদর্শনকারী বারাণসীর রাজপ্রাঙ্গণে লোকের সমাবেশে তেত্রিশ অঙ্গুলি দীর্ঘ এবং সুতীক্ষ্ণ তরবারী গিলে লোক মনে বিস্ময় সৃষ্টি এবং আনন্দ উদ্রেক করেছিল। দুব্বচজাতকে (I. pp. 430-431) পাঠে জানা যায় যে, বোধিসত্ত্ব বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বারাণসীতে লঙ্ঘন-নর্ত্তককুলে জন্মগ্রহণ করে এক আচার্যের নিকট শক্তিলঙ্ঘন-বিদ্যা শিক্ষা করেন এবং আচার্যের সঙ্গে নানা স্থানে শক্তিলঙ্ঘনক্রীড়া প্রদর্শনপূর্বক অর্থ উপার্জনের করতেন। তিত্তিরজাতকে (III. pp. 537-543) এক ভবঘুরে নানাস্থানে ঘুরে ঘুরে কখনো পণ্যবিক্রয়, কখনো দণ্ডযুদ্ধে অংশগ্রহণ এবং কখনো পশুবধ করে জীবিকা নির্বাহ করতো বলে উল্লেখ আছে। ভদ্রঘটজাতকে (II. pp. 431-432) নটেরা ধনাঢ্যব্যক্তির সন্তানদের শোষণ করে জীবিকা নির্বাহ করতো বলে সাক্ষ্য পাওয়া যায়। এ জাতকে বর্ণিত আছে, বোধিসত্ত্বের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মদ্যাসক্ত হয়ে লঙ্ঘননট, ধাবক, গায়ক, নট প্রভৃতিকে সহস্র সহস্র মুদ্রা দিত এবং উন্মত্তের ন্যায় কোথায় গীত, কোথায় নৃত্য, কোথায় বাদ্য হতো সেসব স্থানে ঘুরে বেড়াত এবং এভাবে সে চল্লিশ কোটি মুদ্রা এবং অন্যান্য সম্পত্তি বিনষ্ট করে। তবে উচ্ছিট্ঠভত্তজাতক (II. pp. 167-169) সাক্ষ্য দেয় যে, নটেরা এরূপ করেও সম্পদশালী হতে পারতো না এবং কখনো কখনো ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করতো। জাতকে নাট্যভিনয়ের কথা তেমন উল্লেখ পাওয়া যায় নাা, তবে সুরুচিজাতকে (IV. pp. 314-325) দৃশ্যকাব্যাভিনয়ের মতো নানারকম নৃত্য, শারীরিক কসরত এবং হাস্যোদ্দীপক অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন করে দর্শকদের চিত্তরঞ্জন পূর্বক অর্থ উপার্জনের বিষয় উল্লেখ আছে। জাতকে যে সকল নটের উল্লেখ আছে, তারা নৃত্য-গীতের পাশাপাশি ইন্দ্রজালবিদ্যায়ও পারদর্শী ছিল। সুরুচিজাতকে (IV. pp. 314-325) ভণ্ডুকর্ণ এবং পণ্ডুকর্ণ নামক দু'জন নটের অতি বিস্ময়কর ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়ার বর্ণনা আছে। এ জাতকে বর্ণিত আছে যে, ভণ্ডুকর্ণ মুহূর্তের মধ্যে একটা বিশাল আম্রবৃক্ষ সৃষ্টি করে তার শাখা

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষ্য করে একটা সূত্রপিণ্ড উর্ধ্বে নিক্ষেপ করতো। সূত্রের একপ্রান্ত ঐ শাখায় সংলগ্ন হলে সে উহা ধারণ করে উপরে ওঠতো এবং তখন যক্ষেরা তার দেহ খণ্ড-বিখণ্ড করে মাটিতে ফেলে দিতো। অন্যান্য নটেরা তার খণ্ড-বিখণ্ড দেহাংশ একস্থানে জড়ো করে তাতে জল সিঞ্চন করলে ভণ্ডুকর্ণ তৎক্ষণাৎ পুষ্প আচ্ছাদিত হয়ে পুর্নবার আবির্ভূত হয়ে নৃত্য করতো। তৎপর পণ্ডুকর্ণ জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ডের আগুনে ঝাপ দিতো এবং আগুন নিঃশেষ হলে অন্যান্য নটেরা ছাইভস্মের উপর জল সিঞ্চন করতো। তখন পুণ্ডুকর্ণ পুষ্পাবরণে ভূষিত হয়ে পুর্নবার আবির্ভূত হয়ে নৃত্য করতো। এতে বোঝা যায়, নটেরা ভোজভাজিতে বেশ নৈপুণ্য অর্জন করেছিল। ধম্মপদট্ঠকথায়[৪৭] উগ্‌গসেন নামক রাজগৃহের এক শ্রেষ্ঠিপুত্রের উল্লেখ আছে, যিনি যাদুবিদ্যায় পারদর্শী এক নারীর প্রেমে পড়ে তাকে বিবাহ করেন এবং বিবাহের পর যাদুবিদ্যাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। ক্রমে তিনি সে পেশায় পারদর্শিতা অর্জনপূর্বক রাজগৃহ নগরীর এক বিশাল জনসমাবেশে যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করে প্রচুর সুখ্যাতি অর্জন করেন।

৩.৩. খেলাধূলা ও প্রতিযোগিতা

প্রাচীনকালে প্রতিযোগিতা ছিল বিনোদনের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এতে রাজা, রানী, রাজ পরিবারের সদস্য এবং আমত্যগণ অংশগ্রহণ করতেন। সাধারণ জনগণও ব্যাপক উদ্দীপনার সঙ্গে অংশ গ্রহণ করতো। সঙ্গীত, বিতর্ক এবং খেলাধূলা ছিল বিনোদনের চুম্বক অংশ। গুত্তিলজাতকে (II. pp. 248-257) এক মনোজ্ঞ সঙ্গীত প্রতিযোগিতার বর্ণনা পাওয়া যায়। এতে উল্লেখ আছে যে, বোধিসত্ত্ব রাবাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে এক গান্ধর্ব্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁর নাম হয় গুত্তিলকুমার। তিনি যথাকালে গান্ধর্ব্য বিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করেন এবং তাঁর সুখ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর বীণার সুরের মূর্ছনায় বিমুগ্ধ হয়ে বারাণসীরাজ তাঁকে প্রাসাদে শিল্পী হিসেবে নিয়োগদান করেন। মূসিল নামক এক বীণাবাদক তাঁর নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করে পারদর্শিতা অর্জন করেন। কিন্তু মূসিল ছিলেন লোভী, কুবুদ্ধি ও হীনমানসিকতা সম্পন্ন। ফলে গুত্তিল বয়োবৃদ্ধ হলে তিনি বারাণসীর রাজপ্রাসাদে শিল্পী হিসেবে কর্মলাভের জন্য গুরু গুত্তিলকে পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। অনন্যোপায় হয়ে গুরু গুত্তিল বিষয়টি রাজাকে জ্ঞাত করলে রাজা প্রতিয়োগিতা আয়োজনের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গীত নিপুণতা নিরূপণ করতে ইচ্ছুক হন। ফলে বারাণসীর রাজা রাজপ্রাসাদের তোরণপার্শ্বে গুরু-শিষ্যের এক প্রতিযোগীতার আয়োজন করেন। এক সপ্তাহ পূর্বে তিনি রাজকর্মচারীর মাধ্যমে ভেরীবাজিয়ে প্রতিযোগিতার কথা প্রচার করান। প্রতিযোগিতার জন্য মণ্ডপ নির্মাণ করান। রাজপরিবারের সদস্য এবং অমাত্যসহ রাজা এবং নানা শ্রেণিপেশার নর-নারী

Dhaka University Institutional Repository

মনোরমবেশে সজ্জিত হয়ে প্রতিযোগিতা উপভোগের জন্য উপস্থিত হন। প্রতিযোগিতায় গুরু গুত্তিলের নিকট শিষ্য মূসিল পরাজিত হন। চূল্লকালিঙ্গজাতক (III. p. 1) পাঠে জানা যায় যে, বুদ্ধের সময়কালে দার্শনিক এবং শিক্ষিত সমাজে বিতর্ক খুবই জনপ্রিয় ছিল। এ জাতক সাক্ষ্য দেয় যে, বুদ্ধের সময়কালে বৈশালীর লিচ্ছবীরা বিতর্ক খুবই ভালবাসতেন। একদা লিচ্ছবীরাজ পঞ্চশত মতবাতে ব্যুৎপন্ন এক নিগ্রন্থ এবং নিগ্রন্থীর মধ্যে বিতর্ক আয়োজন করেন। বিচারে উভয়ে সমান পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন। ফলে উভয়ের গর্ভজাত সন্তান মহাপণ্ডিত হবে - এরূপ ভেবে রাজা উভয়কে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করান। কালক্রমে তাঁদের চারকন্যা এবং এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। প্রত্যেকে মাতার নিকট পাঁচশত এবং পিতার নিকট পাঁচশত মোট সহস্র মতবাদ শিক্ষা করে মহাবাগ্মিরূপে খ্যাত হন। কিন্তু শ্রাবস্তীতে সহস্র সহস্র লোকের উপস্থিতিতে আয়োজিত এক বিতর্ক প্রতিযোগিতায় চার বোন বুদ্ধশিষ্য সারিপুত্রের নিকট পরাস্ত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্বক ভিক্ষুণীধর্মে দীক্ষিত হন। অনুরূপ এক বিতর্কে বুদ্ধ 'নিগণ্ঠ সচ্চক' নামক এক পরিব্রাজককে পরাস্ত করেছিলেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়, যেখানে লিচ্ছবী কুমারগণ উপস্থিত থেকে উক্ত বিতর্ক পর্যবেক্ষণ করেছিলেন।[৪৮]

ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মধ্যে প্রাণীর লড়াই, কুস্তি, মুষ্টিযুদ্ধ, দণ্ডযুদ্ধ প্রভৃতি খুবই জনপ্রিয় ছিল বলে জানা যায়। ঘটজাতকে (III. pp. 168-170) কুস্তি প্রতিযোগিতার বর্ণনা পাওয়া যায়। এ জাতকে বর্ণিত আছে যে, একদা এক রাজা এক কুস্তিখেলা আয়োজন করেন। এক সপ্তাহপূর্ব থেকে তিনি সকল প্রকার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন এবং ভেরীবাজিয়ে সকলকে কুস্তিখেলার সংবাদ জ্ঞাত করান। রাজপ্রাসাদের সামনে বৃত্তাকারে প্রাচীর নির্মাণপূর্বক খেলার স্থান প্রস্তুত করানো হয়। নির্ধারিত দিনে 'চনুর' এবং 'মুত্তিকা' নামক দু'জন কুস্তিগীরের মধ্যে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিজয়ীকে হর্ষধ্বনি প্রদান করে উৎসাহ প্রদান করা হতো। মজ্ঝিমনিকায়[৪৯] গ্রন্থে অভিজাত শ্রেণির লোকদের মধ্যে পাশাখেলা প্রচলিত ছিল এবং রাজকন্যাগণ এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের কন্যাগণ 'কুণ্ডুক' (বল) এবং 'ভিটা' (হকিজাতীয়) খেলা খেলতে ভালবাসতেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। বিদূরপণ্ডিতজাতকে (VI. p. 281) কাষ্ঠফলকে এরূপ খেলা হতো বলে বর্ণিত আছে।

অণ্ডভূতজাতকে (I. pp. 289-295), লিত্তজাতক (I. pp. 379-380) এবং বিদূরপণ্ডিতজাতকে (VI. pp. 255-328) প্রভৃতিতে অক্ষক্রীড়ার বর্ণনা পাওয়া যায়। অণ্ডভূতজাতকে (I. pp. 289-295) উল্লেখ আছে যে, বোধিসত্ত্ব বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তিনি

Dhaka University Institutional Repository

সর্ববিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করেন। অতপর রাজ্য লাভ করে যথাধর্ম প্রজাপালন করতে থাকেন। তিনি তাঁর পুরোহিতের সঙ্গে পণ বাজি রেখে দ্যুতক্রীড়া করতেন এবং রজতফলকের উপর সুবর্ণ পাশক ফেলার সময় জয়ের আশায় বিশেষ মন্ত্র আবৃত্তি করতেন। ফলে প্রতিবাজিতেই রাজা জয়লাভ করতেন। এতে পুরোহিত কপর্দ্দক শূন্য হয়ে পড়ে। তাছাড়া, সাধারণলোকেরা বিশ্বাস করতো যে, মন্ত্রবিশেষের দ্বারা খেলায় জয়লাভ সম্ভব হতো। রুরুজাতক (IV. p. 255-262) এবং বিদূরপণ্ডিতজাতকে (VI. pp. 255-328) উল্লেখ আছে যে, সাধারণ লোকেরাও পণ রেখে বাজি ধরতো এবং পণে হেরে সময়ে সময়ে সর্বস্বান্ত হতো। দীর্ঘনিকায়[৫০] গ্রন্থ সাক্ষ্য দেয় যে, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে হাতি, ঘোড়া, মহিষ, বৃষ, অজ, মেষ, মোরগ প্রভৃতি পশু-পাখীর লড়াই প্রচলিত ছিল। কিন্তু বুদ্ধ প্রাণীদের প্রতি নির্দয় আচরণ মন্দকার্য হিসেবে অভিহিত করায় বুদ্ধযুগে এসব অনুষ্ঠান হ্রাস পেতে থাকে।

৩.৪. খাদ্যাভ্যাস

সম্ভবজাতক (II. pp. 43-45) পাঠে জানা যায় যে, যবাগু এবং ভাত ছিল প্রদান খাদ্য। তবে উৎসবের সময় পায়েস তৈরী করা হতো এবং পায়েসে প্রচুর ঘৃত, মধু ও শর্করা মিশ্রিত করার রীতি ছিল। ইল্লীসজাতক (I. pp. 349-354) এবং সুধাভোজনজাতক (V. p. 383) মতে, তণ্ডুল (চাউল), ঘৃত এবং গুড় দিয়ে পিষ্ঠক প্রস্তুত করা হতো। তেলোবাদজাতক (II. p. 262), নিগ্রোধজাতক (IV. pp. 37-41), মুণিকজাতক (I. pp. 195-197), শালূকজাতক (II. pp. 419-420), তুণ্ডিলজাতক (III. pp. 286-292), মহাকপিজাতক (III. pp. 370-375), মহাবোধিজাতক (V. pp. 227-246), রোমকজাতক (II. pp. 382-384) প্রভৃতিতে প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে যে মাংস খাওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল তা উল্লেখ পাওয়া যায়। মুণিকজাতক (I. pp. 195-197) এবং শালূকজাতকে (II. pp. 419-420) বর্ণিত আছে যে, লোকেরা মাংসের জন্য শূকর পালন করতো। তুণ্ডিলজাতকে (III. pp. 286-292) গ্রাম্য শূকরের মাংস খাওয়ার কথা বর্ণিত আছে। মুণিকজাতক মতে, 'কুটুম্বিক' তথা গ্রাম্য ভূস্বামী শূকর পালন করতেন। এতে বোঝা যায়, শূকর মাংস অন্ত্যজশ্রেণি এবং অভিজাতশ্রেণি উভয়ে ভক্ষণ করতো। মহাবোধিজাতক (V. pp. 227-246) হতে মর্কটমাংস ভোজনের কথা জানা যায়। মহাকপিজাতকে (III. pp. 370-375) উল্লেখ আছে যে, একদা বারাণসীরাজের আম্রের সঙ্গে বানরমাংস ভক্ষণের ইচ্ছা হয়েছিল। কিন্তু সব্বদাঠজাতকে (II. pp. 243-245) উল্লেখ আছে যে, লোকে বানরমাংসকে অখাদ্য বলে মনে করতো। রোমকজাতকে (II. pp. 382-384) পারাবত তথা কপোতের (ঘুঘুর) মাংস ভক্ষণের কথা বর্ণিত আছে। নাঙ্গুট্ঠজাতক (I. p. 494)

Dhaka University Institutional Repository

হতে জানা যায় যে, বারাণসীর ব্যাধরা এক তপস্বীর গরু হত্যা করে তার মাংস ভক্ষণ করেছিল। গহপতিজাতকে (II. pp. 134-136) উল্লেখ আছে যে, একদা কাশীরাজ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সেসময় গ্রামবাসীরা পরে মূল্য পরিশোধ করবে এরূপ শর্তে গ্রামভোজক হতে গরু ধার নিয়ে তার মাংস ভক্ষণ করে জীবন রক্ষা করেছিল। মহাসূতসোমজাতকে (V. pp. 457-511) এক নরমাংসাশী রাজার কথা উল্লেখ রয়েছে। সসপণ্ডিতজাতক (III. pp. 51-56) এবং মচ্ছজাতকে (I. pp. 210-212) পাঠে মৎস্য ভক্ষণের কথা জানা যায়। জাতকে ফলমূলের উল্লেখ থাকলেও নির্দিষ্টভাবে ফলের নাম খুবই কম উল্লেখ পাওয়া যায়, তবে আম্রফলের উল্লেখ অধিক পাওয়া যায়। এতে বোঝা যায়, প্রাচীনকালে ফলমূল খাওয়ার রীতিও প্রচলিত ছিল।

৩.৫. সংস্কার ও বিশ্বাস

জাতক পাঠে জানা যায় যে, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে নানা রকম সংস্কার ও বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। এক প্রকার লোক ছিল যারা বিভিন্ন লক্ষণ বা নিমিত্ত দেখে শুভাশুভ নির্ণয় করতেন, এঁরা 'নিমিত্ত-পাঠক' নামে খ্যাত ছিলেন। আবার, এক শ্রেণির লোক ছিল যাঁরা অঙ্গলক্ষণ দেখে ভবিষ্যতের শুভাশুভ গণনা করতেন।[৫১] বুদ্ধকে প্রচলিত এরূপ বহু সংস্কারের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করতে দেখা যায়। মহামঙ্গলজাতকে (IV. pp. 74-78) উল্লেখ আছে যে, সকালে ঘুম থেকে ওঠে সাদা রংয়ের বৃষ, রোহিত মৎস্য, নব সর্পিঃ, নতুন বস্ত্র, পায়েস এবং গর্ভবতী স্ত্রী দেখলে শুভফল প্রাপ্তি ঘটে, লোকেরা এরূপ বিশ্বাস করতো। চণ্ডালের মুখ দর্শনে অমঙ্গল সূচিত হয়, এরূপ বিশ্বাস প্রচলিত ছিল বলে মাতঙ্গজাতকে (IV. pp. 375-389) উল্লেখ আছে। মঙ্গলজাতকে (I. p. 373) মুষিক-দষ্ট বস্ত্র পরিধান করলে বংশ নির্বংশ হয়ে যায়, এরূপ বিশ্বাসের কথা উক্ত আছে। নক্‌খত্তজাতকে (I. p. 258) তিথি নক্ষত্রের প্রভাবে মঙ্গল-অমঙ্গল সূচিত হয় এরূপ বিশ্বাসের বর্ণনা পাওয়া যায়। এ জাতকে আরো উল্লেখ আছে যে, তিথি-নক্ষত্র বিচার করে বিবাহের দিন ধার্য করা হতো। তবে মঙ্গলজাতক এবং মহামঙ্গলজাতকে নিমিত্তাদির অসারতা প্রদর্শিত হয়েছে। বুদ্ধ নক্‌খত্তজাতকে যারা গ্রহ-নক্ষত্রের কারণে শুভাশুভ নির্ধারণ করে তাদেরকে মূর্খ হিসেবে অভিহিত করেছেন। মহাসুপিনজাতক (I. pp. 343-345), লোহকুম্ভিজাতক (III. pp. 45-46) এবং অট্ঠসদ্দজাতকে (III. pp. 428-434) উল্লেখ আছে, সর্বচুতস্ক যজ্ঞ সম্পাদনের মাধ্যমে দুঃস্বপন সুস্বপ্নে পরিণত করা যায়, এরূপ বিশ্বাস জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। লোহকুম্ভিজাতক (III. pp. 45-46) সাক্ষ্য দেয় যে, সর্বচুতস্ক যজ্ঞে হস্তী, অশ্ব, বৃষ, মনুষ্য, চটক-পাখী প্রভৃতি চারটি চারটি করে বধ

Dhaka University Institutional Repository

করে আহুতি দেয়া হতো। খণ্ডহালজাতকে (VI. pp. 131-135) দেখা যায়, রাজার স্বর্গ লাভের জন্য এক পুরাহিত সর্বচতুষ্ক যজ্ঞ করেছিলেন, যাতে রাজার পুত্র এবং মহিষীদেরকেও বলিদান করা হয়েছিল। তক্কারিজাতকেও (IV. p. 245-252) স্থাপত্য নির্মাণে বিঘ্ননিবারণ এবং মঙ্গলাচরণের জন্য নরবলি প্রদানের উল্লেখ আছে। এরূপ বিশ্বাস বর্তমানেও প্রচলিত দেখা যায়। এখনো এরূপ ধারণা প্রচলিত আছে যে, বৃহৎ সেতু নির্মাণের সময় নরবলী আবশ্যক। এখনো 'ছেলেধরা' সন্দেহে বহু নিরাপরাধ লোককে আঘাত ও হত্যা করতে দেখা যায়। জাতক পাঠে আরো জানা যায় যে, লোকেরা মনে করতো মন্ত্রবলে অনেক অসাধ্য সাধন করা যায়। কামনীতজাতকে (II. pp. 212-215) কথিত আছে, লোকেরা বিশ্বাস করতো ভুতাবিষ্ট লোক মন্ত্র বলে নিরাময় হতো। বেদব্ভজাতকে (I. pp. 253-256) মন্ত্রবলে আকাশ হতে রত্ন বর্ষিত হতো, এরূপ বিশ্বাস ও সংস্কারের উল্লেখ আছে। এছাড়া, সব্বদাঠজাতকে (II. pp. 243-245) মন্ত্রবলে পৃথিবী জয় করা, ব্রহাছত্তজাতকে (III. pp. 115-117) মন্ত্রবলে গুপ্তধন লাভ করা যায়, এরূপ সংস্কার ও বিশ্বাস প্রচলিত থাকার কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। চূল্লকসেট্ঠিজাতক (I. pp.120-122), অসাতমন্তজাতক (I. pp. 285-288) এবং সম্ভাবজাতক (II. pp. 43-44) প্রভৃতিতে বর্ণিত আছে, লোকে বিশ্বাস করতো প্রব্রজ্যা গ্রহণ বা সন্ন্যাস অবলম্বন করলে বংশ পবিত্র হয়, এ কারণে মাতা-পিতা এবং অন্যান্য অভিভাবকরা বালকদের সন্ন্যাস অবলম্বনে বা প্রব্রজ্যা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতেন। বিসবন্তজাতকে (I. pp. 310-311) বর্ণিত আছে, লোকের মাঝে এরূপ বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে, মন্ত্রবলে এবং ঔষধ প্রয়োগে বিষধর সাপে কাটা রোগীকে সুস্থ করা যায়, এমনকি মন্ত্রবলে যে সাপে দংশন করে সেই সাপকে এনে বিষ উত্তোলনপূর্বক রোগীকে আরোগ্য করা যায়। কচ্ছপজাতক (II. pp. 79-81) এবং অম্বজাতকে (IV. pp. 200-203) উল্লেখ আছে যে, লোকেরা মহামারি বা সংক্রামক ব্যাধি অপদেবতার প্রভাব বলে বিশ্বাস করতো। জাতকদ্বয়ে আরো উল্লেখ আছে, এরূপ রোগ দেখা দিলে লোকেরা গ্রাম ত্যাগ করে স্থানান্তরে গমন করতেন। জাতকে রোগ নিরাময়ের নানা সংস্কারেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। দধিবাহনজাতকে (II., pp. 101-106) বর্ণিত আছে যে, পাণ্ডুরোগ হলে দধি সেবনের এবং কেহ বিষ পান করলে বমন করিয়ে বমনান্তে ঘৃত, মধু ও শর্করা খাওয়ানোর সংস্কার প্রচলিত ছিল। লিত্তজাতক (I., pp. 379-380) ও শালিত্তকজাতকে (I., pp. 418-420) উল্লেখ আছে, প্রিয়ঙ্গু বা পিপ্পলি মিশ্রিত জল পান করায়ে বিষপানকারীকে বমন করানো হতো। এসব বিষয় বিবেচনা করে বলা যায়, বর্তমান কালের ন্যায় প্রাচীনকালেও ভারতবর্ষে নানা সংস্কার ও বিশ্বাস প্রচলিত ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

৪. উপসংহার

উপর্যুক্ত বিষয় পর্যালোচনা করে বলা যায়, ঋষিগণই ছিলেন প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতির মূল উৎস। ঋষিদের প্রজ্ঞালোক থেকেই ভারতবর্ষে শিক্ষার প্রথম রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়েছিল এবং ঋষি পরিবারের মাধ্যমেই তা সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল। জাতীয় সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করাই ছিল প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে একে রক্ষা করার প্রয়াসও প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় লক্ষ্য করা যায়। বিদ্যার্থীকে আত্ম-প্রত্যয়, স্বাবলম্বী, সেবা-ব্রত পরায়ণ ও সামাজিক কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ করাই ছিল এই শিক্ষার বিশেষ লক্ষ্য। প্রাচীন ভারতে শিক্ষা এবং ধর্মকে অভিন্ন দেখার ফলে ভারতীয় শিক্ষায় সর্বদাই আধ্যত্মিক সম্পদ প্রাধান্য লাভ করেছে। এছাড়া, শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে আত্মিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকায় শিক্ষায় সাধারণত কোনো সঙ্কট সৃষ্টি হতো না। মানসিক উৎকর্ষতা, রুচি ও প্রবণতা অনুসারে বিষয় ও বৃত্তি শিক্ষা ব্যবস্থা এবং পাঠ পদ্ধতি নির্ধারণ; অবৈতনিক, আবাসিক এবং কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রবর্তন প্রভৃতি ছিল ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার অনন্য উপাদান। শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনায় সমাজের প্রত্যেক শ্রেণির দায়িত্ব গ্রহণের দৃষ্টান্ত ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় যেরূপ লক্ষ্য করা যায় তা আর কোনো দেশে লক্ষ্য করা যায় না।

বৌদ্ধধর্ম প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় এক বৈপ্লবিক যুগের সূচনা করে। বৈদিকযুগে যে শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল ব্রাহ্মণ্য সমাজের গণ্ডিভূত, বৌদ্ধযুগে তা জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ সকলের জন্য উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। ফলে সাধারণ মানুষও শিক্ষার অধিকার লাভ করে। এভাবে বৌদ্ধযুগে শিক্ষা ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক আদর্শ স্থাপিত হয়। দ্বিতীয়ত, বুদ্ধ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তে সাধারণ মানুষের মাতৃভাষা তথা প্রাকৃত ভাষাকে প্রাধান্য দেয়া হলে বিশাল জনগোষ্ঠি মাতৃভাষায় বিদ্যাচর্চার সুযোগ লাভ করে। এক্ষেত্রে বৌদ্ধ বিহারগুলো বিদ্যালয়ের ভূমিকা পালন করায় সমগ্র ভারতবর্ষে শিক্ষার হার দ্রুত বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। এ কারণে বৈদিকযুগে গুরুগৃহ ও বৌদ্ধযুগে সঙ্ঘ ছিল জনসাধারণের গর্বের বস্তু। এগুলোই ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে ঋদ্ধ করেছিল এবং অনন্য বৈশিষ্ট্য দান করেছিল। অতএব, বলা যায়, প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ শিক্ষা ও সংস্কৃতি ছিল বর্তমান ভারতবর্ষের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ভিত্তির মূল উৎস।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

[১] নলিনীভূষণ দাশগুপ্ত, *বৈদিক ও বৌদ্ধ শিক্ষা*, প্রকাশ ভবন, কলিকাতা, ১৩৯৮, পৃ. ৮।

[২] সংস্কৃত সাহিত্যে শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে বহু অরণ্যাশ্রমের উল্লেখ পাওয়া যায়।

[৩] শ্রী শান্তিকুসুম দাশ গুপ্ত, *বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম* এবং *প্রাচীন বৌদ্ধ সমাজ*, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলিকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ১৫৫।

[৪] *মিলিন্দ প্রশ্ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০।

[৫] *থেরগাথা*, প্রাগুক্ত, গাথা নং ২৭৫-২৭৮।

[৬] *বৈদিক ও বৌদ্ধ শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬।

[৭] *Vinaya Pitaka*, op. cit., vol. I., p. 269.

[৮] *Vinaya Pitaka*, op. cit., vol. II., p. 74.

[৯] *Digha Nikāya*, op. cit., vol. I., p. 157.

[১০] *Vinaya Pitaka*, op. cit., vol. I., p. 269.

[১১] *বৈদিক ও বৌদ্ধ শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০।

[১২] S. C. Das, *Hindustan Review*, March, 1906, p. 188.

[১৩] *মিলিন্দ প্রশ্ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩-৪।

[১৪] A. P. de zoysa, *Indian Culture in the days of the Buddha*, Colombo, 1955, p. 71।

[১৫] R. K. Mookerji, *Ancient Indian Education*, p. xxxiii।

[১৬] *বৈদিক ও বৌদ্ধ শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

[১৭] A. S. Altekar, *Education in Ancient India*, p. 94.।

[১৮] *বৈদিক ও বৌদ্ধ শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।

[১৯] *বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম* এবং *প্রাচীন বৌদ্ধ সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭।

[২০] প্রবোধচন্দ্র বাগচী, *বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য*, পৃ. ১৫।

[২১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

[২২] *Vinaya Pitaka*, op. cit., vol. I., p. 258-270.

[২৩] অনুকুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *বৌদ্ধ সাহিত্য ও শিক্ষা-দীক্ষার রূপরেখা*, পৃ. ৪৭; *Education in Ancient India*, op. cit., p. 280.

Dhaka University Institutional Repository

[২৪] *Paramattha-dīpanī Therigathā-Aṭṭhagathā, The Commentary of Dhammapālācariya*, vol. II., op. cit., pp. 87, 145.

[২৫] I. B. Horner, *Women under in Primitive Buddhism*, p. 247.

[২৬] *Majjhima Nikāya*, op. cit., vol. I., p. 299.

[২৭] *Aṅguttara Nikāya*, op. cit., vol. I., p. 25.

[২৮] *থেরীগাথা*, প্রাগুক্ত, গাথা নং : ৯২-৯৬।

[২৯] *Paramattha-dīpanī Therigathā-Aṭṭhagathā, The Commentary of Dhammapālācariya*, vol. II., op. cit., pp. 127-128.

[৩০] *Saṃyutta Nikāya*, op. cit., vol. IV., p. 374.

[৩১] Education in Ancient India, op. cit., p. 329.

[৩২] বাণী চট্টোপাধ্যায়, *পালি সাহিত্যে নারী*, পুনশ্চ, কলিকাতা, ১৯৯০, পৃ. ৬২; শ্রী বিমলাচরণ লাহা, *বৌদ্ধরমণী*, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলিকাতা, ১৯৯৯ (দ্বিতীয় মুদ্রন), পৃ. ৬৬-৭০।

[৩৩] *Vinaya Pitaka*, op. cit., vol. IV., p. 172.

[৩৪] *বৌদ্ধরমণী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪-১৩৮; *পালি সাহিত্যে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬-৬৩।

[৩৫] *Kuddaka Pāṭha*. P. 89;

"বহু সচ্চঞ্চ সিপ্পঞ্চ, বিনয়ো চ সুসিক্খিতো,

সুভাসিতা চ যা বাচা, এতং মঙ্গলমুত্তমং।

[৩৬] H. C. Roychaudhuri, *Political History of Ancient India*, p. 61.

[৩৭] *Ancient Indian Education*, op. cit., p. 479.

[৩৮] প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, *প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস*, পৃ. ১৫৭।

[৩৯] ঐ, পৃষ্ঠা ৯।

[৪০] *On Yuan Chwang's Travel in India*, op. cit. pp. 140ff.

[৪১] করুণানন্দ ভিক্ষু, *পালিসাহিত্যে নগরবিন্যাস ও নগরজীবন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ৬৯।

[৪২] *Vinaya Pitaka*, op. cit., vol. II., p. 107.

[৪৩] *The Commentary on the Dhammapada*, vol. I., op. cit., p. 98.

[৪৪] *Digha Nikāya*, op. cit., vol. I., p. 46.

[৪৫] *Vinaya Pitaka*, op. cit., vol. II., p. 177-189.

Dhaka University Institutional Repository

[৪৬] *Digha Nikāya*, op. cit., vol. II., p. 147.

[৪৭] *The Commentary on the Dhammapada*, vol. IV., op. cit., pp. 59-65.

[৪৮] চূল্লকালিঙ্গজাতক (Vol. III., p. 1)।

[৪৯] *Majjhima Nikāya*, op. cit., vol. I., p. 234.

[৫০] *Digha Nikāya*, op. cit., vol. I., p. 46.

[৫১] শ্রী ঈশানচন্দ্র ঘোষ, *জাতক*, ২য় খণ্ড, করুণা প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৩৮৯ বাংলা (পুনর্মুদ্রন), পৃ. ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা

১.ভূমিকা

বহু ইতিহাসখ্যাত রাজন্যবর্গ এবং শ্রেষ্ঠী (বণিক) বুদ্ধের অনুসারী ছিলেন। রাজন্যবর্গের মধ্যে মগধরাজ বিম্বিসার, কোশলরাজ প্রসেনজিত, কৌশাম্বীরাজ উদয়ন এবং শ্রেষ্ঠী তথা বণিকদের মধ্যে তপস্সু, ভল্লুক, অনাথপিণ্ডিক, ধনঞ্জয়, মৃগধর প্রমুখের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম ব্যাপক প্রচার ও প্রসার লাভ করেছিল। এ কারণে পালি সাহিত্যে বুদ্ধের সমকালীন ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়, যা পর্যালোচনাপূর্বক তৎকালীন অর্থনৈতিক অবস্থার স্বরূপ প্রকটিত করা সম্ভব। অর্থনীতি এবং সমাজজীবন ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। অর্থনীতিতে যে দেশ যতবেশি সমৃদ্ধ সে দেশের জনজীবন ততবেশি উন্নত। তাই অর্থনীতিকে একটি রাষ্ট্রের মূল চালিকা শক্তি এবং সমৃদ্ধির মাপকাঠি হিসেবে গণ্য করা হয়। শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং মুদ্রা ব্যবস্থা হচ্ছে অর্থনীতির তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বা স্তম্ভ। জাতকে উপর্যুক্ত তিনটি বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্য বিচার-বিশ্লেষণপূর্বক প্রাচীন ভারতের সমাজ জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ অর্থনৈতিক দিক সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করাই এ অধ্যায়ে মূল উদ্দেশ্য।

২. শিল্প

শিল্প হচ্ছে মানুষের আর্থিক সংস্থানের অন্যতম মাধ্যম এবং একটি দেশের অর্থনীতির মূল স্তম্ভ। গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, বর্তমান কালের ন্যায় প্রাচীনকালেও মানুষ নানা প্রকার শিল্পকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে আর্থিক সংস্থানপূর্বক জীবিকা নির্বাহ করতো। ঐতিহাসিক আকর গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে ১৮ প্রকার বিদ্যা বা শিল্পকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করা হতো। কিন্তু বিভিন্ন সাহিত্যে এসব পেশা সম্পর্কে যে বিবরণ পাওয়া যায় তাতে ক্ষেত্র বিশেষে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে এ বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থে প্রাপ্ত তথ্য উপস্থাপন করা হলো।

২.১. ঐতিহাসিক আকর গ্রন্থের তথ্য

বিভিন্ন ঐতিহাসিক আকর গ্রন্থে [১] বিক্ষিপ্তভাবে অষ্টাদশ শিল্প-বিদ্যার যে উল্লেখ পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ :

১. সূত্রধর : এরা কাঠ দিয়ে আসবাব পত্র, বাড়িঘর, নানা রকম জলযান নির্মাণ করতো।

Dhaka University Institutional Repository

২. কামার বা কর্মকার : এরা ধাতব পদার্থ দিয়ে নানা রকম দ্রব্য প্রস্তুত করতো। বিশেষ করে লৌহ দ্বারা লাঙ্গল, কুড়াল, দা, ছুরি, নিড়ানি, করাত, সূচ প্রভৃতি জনজীবনে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য তৈরি করতো। এরা স্বর্ণ ও রৌপ্য দ্বারাও নানা রকম অলংকার প্রস্তুত করতো বলে জানা যায়।

৩. প্রস্তুত শিল্পী : এরা ঘরের ও জলাশয়ের সিঁড়ি, কাঠ নির্মিত ঘরের ভিত্তি, খোদিত স্তম্ভ, পাথরের নিত্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র প্রভৃতি প্রস্তুত করতো।

৪. তন্তুবায় : এরা নানা রকম বস্ত্র, বস্ত্রজাত দ্রব্য, যথা কম্বল, কুশন, আসন প্রভৃতি তৈরি করতো।

৫. চর্মকার : এরা নানা প্রকার চর্মজাত দ্রব্য প্রস্তুত করতো। জানা যায় যে, এরা অলংকার খচিত পাদুকা তৈরি করতে পারতো।

৬. কুম্ভকার : এরা মাটি দিয়ে নানা রকম নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য, বিশেষত থালা-বাসন ও পাত্র প্রস্তুত করতো।

৭. দন্তশিল্পী : এরা নানা প্রাণির, বিশেষত হাতির দন্ত দিয়ে নানা রকম নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র তৈরি করতো।

৮. রঙ্গকার বা রংমিস্ত্রি : এরা রংমিশ্রিত করে নানা রকম কাপড় প্রস্তুত করতো।

৯. মণিকার : এরা নানা রকম মণিরত্ন দিয়ে অলংকার তৈরি করতো।

১০. মৎস্য জীবি : এরা মৎস উৎপাদন, আহরণ ও বিক্রয় করে জীবিকা নির্বাহ করতো।

১১. কসাই : এরা নানা রকম প্রাণী পালন, হত্যা ও তাদের মাংস বিক্রয় করে জীবিকা নির্বাহ করতো।

১২. ব্যাধ ও শিকারীঃ এরা বন্য পশু-পাখী শিকারপূর্বক তাদের মাংস ভক্ষণ এবং বিক্রয় করে জীবিকা নির্বাহ করতো।

১৩. সুপ্‌কার ও মোদক : এরা নেশা এবং মিশ্রণজাতীয় দ্রব্য প্রস্তুত ও বিক্রয় করতো।

১৪. ক্ষৌরকার : এরা ক্ষৌরকর্ম করে জীবিকা নির্বাহ করতো। তবে নানা প্রকার সুগন্ধি দ্রব্যের ব্যবসা এবং ধণিক শ্রেণি লোকদের জন্য শিরস্ত্রান অলংকরণ প্রভৃতি কর্মও করতো।

১৫. মালাকার ও পুষ্পবিক্রেতা : এরা পুষ্প ও পুষ্পজাত দ্রব্য বিক্রয় করতো এবং পুষ্পদ্বারা গৃহ, রথ, গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতি স্তম্ভ ও স্থান প্রভৃতি সজ্জিতকরণের কাজ করতো।

Dhaka University Institutional Repository

১৬. নাবিক : এরা নৌযান চালনা করে জীবিকা নির্বাহ করতো।

১৭. ঝুড়ি নির্মাতা : এরা বাঁশ এবং বেত দিয়ে নিত্য প্রয়োজনীয় নানা রকম দ্রব্য প্রস্তুত করতো।

১৮. চিত্রকর : এরা নানা রকম চিত্র অঙ্কন করে জীবিকা নির্বাহ করতো।

২.২. দীর্ঘনিকায় গ্রন্থের তথ্য

পালি দীর্ঘনিকায় গ্রন্থে [২] উল্লেখ আছে যে, একবার মগধরাজ অজাতশত্রু বুদ্ধের সঙ্গে দেখা করতে যান। তখন উভয়ের মধ্যে সংসার ত্যাগ ও প্রব্রজ্যালাভের ফলাফল সম্পর্কে কথোপকথন হয়। উক্ত কথোপকথনে রাজা অজাতশত্রুর বক্তব্যে তৎকালীন শ্রেণি পেশার যে বিবরণ আছে তাতে নিম্নোক্ত শিল্পী ও কর্মীদের উল্লেখ পাওয়া যায় :

১. মহুত

২. অশ্বপাল

৩. সারথি

৪. ধানুকী (নয় শ্রেণির সৈন্য)

৫. চেলক (ধ্বজাধারী)

৬. চলক (শিবির সন্নিবেশক)

৭. পিণ্ডদায়ক (খাদ্য বন্টনে নিযুক্ত সৈনিক)

৮. উগ্ররাজপুত্র (উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারী)

৯. প্রস্কন্দিক (সামরিক চর)

১০. মহানাগ শূর

১১. চর্মযোধী

১২. দাস

১৩. সূপকার (পাচক)

১৪. ক্ষৌরকার

১৫. স্নাপক

১৬. মোদক

১৭. মালাকার

Dhaka University Institutional Repository

১৮. রজক

১৯. পেশকার

২০. নলকার

২১. কুম্ভকার

২২. গণকমুদ্রিক এবং এ প্রকারের যে কোন শিল্প।

দীর্ঘনিকায়ের উপর্যুক্ত তথ্য পর্যালোচনা করে বলা যায়, তৎকালে সচরাচর রাজার সঙ্গে যেসব শিল্পী এবং কর্মীর দেখা হতো তিনি কেবল তাদের নামই উল্লেখ করেছেন। ফলে ধারণা করা যায় যে, ঐতিহাসিক আকর গ্রন্থে বর্ণিত অষ্টাদশ শিল্প-বিদ্যার চেয়েও তৎকালে অধিক সংখ্যক শিল্প বা বৃত্তি প্রচলিত ছিল, যেগুলো অবলম্বন করে লোকে আর্থিক সংস্থান ও জীবিকা নির্বাহ করতো। নিধিকুণ্ডসূত্রে শিল্পবিদ্যাকে অর্থকরী সম্পদ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এতে বোঝা যায়, বৌদ্ধদৃষ্টিতে কোনো শিল্প বা বৃত্তিই হীন নয়।

২.৩. জাতকের তথ্য

ইতোপূর্বে প্রথম অধ্যায়ে দেখা গেছে যে, জনজীবনের বিভিন্ন ঘটনা লক্ষ্য করে মানুষকে অনৈতিক কর্মকাণ্ড ত্যাগপূর্বক নৈতিক জীবন-যাপনে উদ্বুদ্ধ করার মানসে বুদ্ধ জাতকগুলো ভাষণ করতেন। এ কারণে জাতকের ছত্রে ছত্রে জনজীবন ঘনিষ্ঠ বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। জনজীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ বিভিন্ন প্রকার শিল্প বা বৃত্তি সম্পর্কেও জাতকে বিক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ পাওয়া যায়। ভেরীবাদজাতক (I. p. 283), শঙ্খধমনজাতক (I. p. 284), মাতঙ্গজাতক (IV. p. 376f), চিত্তসম্ভূতজাত (IV. p. 391), সিগালজাতক (I. p. 503), ভীমসেনজাতক (I. p. 357), গঙ্গমালজাতক (III. p. 445f), ফন্দনজাতক (IV. p. 208) এবং মহাজনকজাতক (VI. p. 30ff) প্রভৃতি সমীক্ষায় দেখা যায় যে, জাতকে ১৮ প্রকারের চেয়ে অধিক শিল্পী ও কারিগর শ্রেণি লোকের উল্লেখ রয়েছে। মিলিন্দ প্রশ্ন[৩] গ্রন্থেও নানা শ্রেণি-পেশার লোকের উল্লেখ রয়েছে। এতে ধারণা করা যায় যে, ১৮ প্রকার শিল্পবিদ্যা দ্বারা তৎকালীন প্রধান প্রধান শিল্পসমূহকেই বোঝানো হয়েছে। জাতকে যেসব শিল্প বা বৃত্তিধারী লোকের উল্লেখ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে অন্যতম হলো : (পালি সাহিত্যে এঁদের কী নামে অভিহিত করা হয়েছে তা বন্ধনীতে দেয়া হলো) : সূত্রধর (বড়্ঢকি), কুম্ভকার (কুম্ভকার), কামার (কম্মকার), স্বর্ণকার (সুবণ্ণকার), দন্তশিল্পী (দন্তকার), মালাকার (মালাকার), রজ্জুকার (রজ্জুকার), বাঁশ-বেতের দ্বারা দ্রব্য প্রস্তুতকারক (নলকার), রেশম প্রস্তুতকারক (কোসিয়কার),

Dhaka University Institutional Repository

চিত্রকর (চিত্তকার), চর্মকার (চম্মকার), তাঁতী (পেসকার), ধনু নির্মাতা (ধনুকার), তীরনির্মাতা (জিয়কার), সীসা দিয়ে দ্রব্য প্রস্তুতকারক (সীসাকার), টিন দিয়ে দ্রব্য প্রস্তুতকারক (তীপুকার), লৌহ দিয়ে দ্রব্য প্রস্তুতকারক (লোহকার), পিতল দিয়ে দ্রব্য প্রস্তুতকারক (সন্ধকার), রথ প্রস্তুতকারক (রথকার), লবণ প্রস্তুত কারক (লোণকার) এবং রং প্রস্তুতকারক (রঙ্গকার)।

এই অধ্যায়ের ২.৩ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত জাতকসমূহে এবং সুত্তবিভঙ্গ নলকার, কুম্ভকার, তন্তুবায় (পেসকার), চর্মকার, নাপিত, বেণ, রথকার, চণ্ডাল, নিষাদ ও পুক্কুস বিভিন্ন পেশার লোককে অন্ত্যজ শ্রেণিভুক্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এদের মধ্যে প্রথম পাঁচটি 'হীনশিল্পী' এবং শেষের পাঁচটি 'হীনজাতি' বলে অভিহিত করা হয়েছে। বিনয়পিটক,[৪] মজ্ঝিমনিকায়,[৫] অঙ্গুত্তর নিকায়,[৬] জাতকের দূরনিদান অনুচ্ছেদ,[৭] সূচিজাতক (III. p. 281), লোসকজাতক (I. p. 234), সমুদ্দবাণিজজাতক (IV. p. 158f), ফন্দনজাতক (IV. p. 208) প্রভৃতি হতে জানা যায় যে, জনগণ বৃত্তি বা পেশা অনুসারে নির্দিষ্ট স্থানে বসবাস করতো এবং অবলম্বনকৃত পেশা বা শিল্প অনুসারে গ্রামের নামকরণ করা হতো। যেমন : সূত্রধরেরা যে গ্রাম বসবাস করতো তা 'বড্ডকি গাম বা সূত্রধর গ্রাম' নামে অভিহিত হতো। অনুরূপভাবে নলকার গ্রাম, কৈবর্ত গ্রাম, আরামিক বা উদ্যান রক্ষক গ্রাম, কুম্ভকার গ্রাম, লোনকার গ্রাম, কর্মকার গ্রাম প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিল। বিনয়পিটক,[৮] দীর্ঘনিকায়,[৯] মাতঙ্গজাতক (IV. p. 376), অম্বজাতক (IV. p. 200), চিত্ত-সম্ভূতজাতক (IV. p. 390), মোরজাতক (II. p. 36) প্রভৃতি হতে জানা যায় যে, জাতিভেদ প্রথাও জনগণের বসবাসের স্থান নির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করতো। যেমন : ব্রাহ্মণ এবং অন্ত্যজ শ্রেণির লোকেরা আলাদা গ্রামে বসবাস করতো এবং গ্রামগুলো বসবাসরত জাতির নামানুসারে পরিচিতি ছিল। ব্রাহ্মণরা যে গ্রামে বসবাস করতো তা ব্রাহ্মণ গাম বা ব্রাহ্মণ গ্রাম, চণ্ডালদের গ্রাম 'চণ্ডাল গাম বা চণ্ডালগ্রাম', নিষাদদের গ্রাম 'নেসাদ গাম বা নিষাদ গ্রাম' নামে অভিহিত হতো। সমুদ্দবাণিজজাতক (IV. p. I58f) ও ফন্দনজাতকে (IV. p. 208) এক ছুতার গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায় যেখানে এক হাজার ঘর ছুতার বসবাস করতো। এতে বোঝা যায়, শিল্পের স্থানীয়করণের কারণে তখন বৃত্তি বা পেশা অনুসারে বসবাসের স্থান নির্ধারিত হতো। সম্ভবত বংশ পরম্পরায় এসব বৃত্তি গ্রহণ করতো বলে জাতি বিভাজনও বৃত্তিমূলক হয়ে পড়েছিল। সমাজে সকল ব্যবসার উপযোগিতা থাকা সত্ত্বেও ক্রমে এই বৃত্তিগুলো হীনবৃত্তি এবং বৃত্তিধারীরা হীনজাতির অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়ে। সূচিজাতকে আরো উল্লেখ আছে যে, একেকটি গ্রামে ত্রিশ থেকে পাঁচশত পরিবার বসবাস করতো। সত্থাবজাতক (II. p. 43f), লোসকজাতক (I. p. 239) এবং

Dhaka University Institutional Repository

মহাস্‌সারোহজাতক (III. p. 8) পাঠে জানা যায় যে, বুদ্ধের সময়কালে বিভিন্ন শিল্প থাকলেও জনসাধারণের প্রধান জীবিকা ছিল কৃষি, কৃষি নির্ভরতা এবং কৃষিগত প্রাণ চরিত্রই ছিল গ্রামের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে ধান, শাক-সব্জি, ফল এবং বাদাম জাতীয় দ্রব্য ছিল অন্যতম। এসব পেশাজীবিগণ গ্রামে উৎপাদিত কৃষিজাত দ্রব্য, ক্ষুদ্রশিল্পজাত দ্রব্য এবং কাঁচামাল নগর-মহানগরে সরবরাহপূর্বক আর্থিক সংস্থান করতো।

উপরের বর্ণনা হতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বর্তমান কালের ন্যায় প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে নানা শিল্প বা পেশা অবলম্বন করে জনগণ জীবিকা নির্বাহ করতো। এসব শিল্প বা পেশা বর্তমানেও ভারতবর্ষসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে লক্ষ্য করা যায়। তবে বৃত্তি অনুসারে বসবাসের পৃথক পৃথক স্থান নির্ধারণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রাচীনকালেও ভারতবর্ষে শিল্পের স্থানীয়করণ ঘটেছিল।

৩. ব্যবসা-বাণিজ্য

অর্থনীতির অপর স্তম্ভ হলো ব্যবসা-বাণিজ্য। এ অনুচ্ছেদে জাতকে বর্ণিত তথ্যের আলোকে প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার গুরুত্বপূর্ণ দিক ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বরূপ কীরূপ ছিল সে সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হবে।

৩.১. বাণিজ্যপথ

জাতক এবং বিভিন্ন পালি গ্রন্থে দু'ধরণের বাণিজ্যপথের উল্লেখ পাওয়া যায়। গুত্তিলজাতক, খুরপ্পজাত, গন্ধারজাতক প্রভৃতি পাঠে জানা যায় যে, স্থলপথ ছিল বাণিজ্যের অন্যতম মাধ্যম এবং শকট, বিশেষত গো-শকট ছিল পণ্য পরিবহনের অন্যতম উপায়। গুত্তিলজাতকে (II. pp. 249-251) বারাণসীর বণিকেরা গো-শকটে করে উজ্জয়িনী এবং গন্ধারজাতকে (III. pp. 364-368) বিদেহের বণিকেরা গো-শকটে করে গান্ধার পর্যন্ত পণ্য নিয়ে যেতেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। উল্লেখ্য যে, উজ্জয়িনী, ভুরুকচ্ছ এবং গান্ধার প্রভৃতি স্থানে যাবার সময় মরুভূমি অতিক্রম করে যেতে হতো। গরমের সময় মরুপথ অতিক্রম করা কষ্টকর। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দিনের বেলায় প্রচণ্ড গরমের সময় স্কন্ধবার (তাবু) স্থাপন করে বণিকেরা বিশ্রাম নিতেন এবং রাত্রে পথ চলতেন। বন্নুপথজাতক মতে, বণিকেরা রাতে নক্ষত্রের গতিবিধি দর্শন করে যাত্রাপথ নির্ণয় করতেন। এসব বিষয় বিবেচনা করে বলা যায়, তখন স্থলপথেও এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের আন্তঃবাণিজ্য চলতো। তবে সত্তিগুম্বজাতক (IV. pp. 431-436), বেদব্‌ভজাতক (I. pp. 253-

Dhaka University Institutional Repository

256) এবং সতপত্তজাতক (II. pp. 388-390) প্রভৃতিতে উল্লেখ আছে যে, দস্যুর উপদ্রব ছিল বাণিজ্যে যাত্রা বিঘ্নের অন্যতম কারণ। দস্যুরা বণিকদের শকট আক্রমণ করে পণ্য নিয়ে যেতেন এবং ক্ষেত্র বিশেষে বণিকদের হত্যাও করতো। এ কারণে বণিকেরা অস্ত্রধারী প্রহরী নিযুক্ত করতেন বলে খুরপ্পজাতক (II. pp. 338-340) সাক্ষ্য দেয়। সেরিবাণিজজাতক (I. p. 111), গগ্‌গজাতক (II. p. 15-17) এবং সীহচম্মজাতক (II. p. 109-110) প্রভৃতিতে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী তথা ফেরিওয়ালার উল্লেখ রয়েছে, যারা গাধার পিঠে বা নিজে পণ্য বহনপূর্বক ফেরি করে জীবিকা নির্বাহ করতো।

অপর বাণিজ্য পথ ছিল নৌপথ। জাতক সাক্ষ্য দেয় যে, ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধার কারণে নৌপথের নিকটবর্তী স্থানে গুরুত্বপূর্ণ বন্দর নগরীগুলো গড়ে ওঠতো। সুস্‌সোন্দিজাতক (III. p. 188), সুপ্পারকজাতক (IV. p. 137), ঘটজাতক (IV. p. 80f), মহাউম্মাগ্‌গজাতক (VI., pp. 333ff), আদিত্তজাতক (III. p. 470-474), চূল্লক্‌সেট্‌ঠিজাতক (I. p. 120f) প্রভৃতিতে ভরুকচ্ছ, দ্বারাবতী, রৌরব প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বন্দরনগরী ব্যবসা বাণিজ্যের অন্যতম কেন্দ্র ছিল বলে উল্লেখ আছে। বন্দরগুলো মূলত নদী এবং সমুদ্রতীরে গড়ে ওঠতো। বণিকেরা অর্ণবপোত বা নৌযানের সাহায্যে এসব বন্দরে বা দীপান্তরে বাণিজ্যে যেতেন এবং পণ্য বিক্রয় করে ফিরে আসার পথে স্বর্ণ-রৌপ্য এবং রত্নজাতীয় দ্রব্যাদি নিয়ে আসতেন। মহাজনকজাতক পাঠে জানা যায় যে, বারাণসী এবং চম্পা নগরের বণিকেরা পোতারোহণপূর্বক (নৌযানে চড়ে) গঙ্গানদী দিয়ে সমুদ্রে পতিত হয়ে বাণিজ্যে যেতেন। লোসকজাতক (I. p. 237), শীলানিসংসজাতক (II. p. 112), বলাহস্‌সজাতক (II. pp. 128-129), ধম্মদ্ধজজাতক (III. pp. 268-269), চতুদ্বারজাতক (IV. pp. 2-4), সুপ্পারকজাতক (IV. pp. 137-139) প্রভৃতিতে উল্লেখ আছে যে, অনেক বণিক ঝড়ের কবলে পড়ে ভিন্নদ্বীপে উপনীত হয়ে ফলমূল খেয়ে জীবনধারণ করতেন এবং দৈবযোগে কোনো অর্ণবপোত সেখানে উপস্থিত হলে উদ্ধার লাভ করতেন। সুপ্পারকজাতকে ঝড়ের কবলে পড়ে সুমাত্রা, যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে উপনীত হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। এসব জাতকে আরো উল্লেখ আছে যে, বাণিজ্যে যাবার পথে ঝড়ের কবলে পতিত হলে বা কোনো কারণবশত অর্ণবপোত চলাচলে ব্যর্থ হলে মনে করা হতো যে কোনো অপেয় ব্যক্তির কারণে এরূপ ঘটেছে। তৎপর গুটিকপোত করে অপেয় ব্যক্তি চিহ্নিতপূর্বক তাকে ভেলায় চড়িয়ে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিত। বাবেরু জাতক (III. p. 127), সঙ্খজাতক (IV. p. 15) এবং মহাজনকজাতকে (VI. pp. 32ff) উল্লেখ আছে যে, বণিকেরা অর্ণবপোতে চড়ে ব্যাবিলন এবং সুবর্ণভূমির ন্যায় দূরদেশেও বাণিজ্যে যেতেন। বাবেরুজাতক এবং ধম্মদ্ধজজাতক (III. pp. 268-269) হতে জানা যায় যে, অনেক সময় দূরদেশে যাবার সময় বণিকেরা পথ হারিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

ফেললে পোষা কাকের সাহায্যে দিক নির্ণয় করতেন। এজন্য বাণিজ্যে যাওয়ার সময় তাঁরা সঙ্গে পোষা কাক নিয়ে যেতেন এবং পথ হারিয়ে ফেললে কাক উড়িয়ে দিতেন। তৎপর কাক যেদিকে যেতো তাঁরা সেদিকে অর্ণবপোত চালাতেন। বণিকেরা সাধারণত দিবাভাগে সূর্য আর রাত্রিকালে নক্ষত্রের গতিবিধি লক্ষ্য করে অর্ণবপোত চালিয়ে দূরদূরান্তে গমনাগমন করতেন। উপর্যুক্ত বিষয় পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, এদেশের বণিকেরা নৌপথে পশ্চিমে পারস্য উপসাগর, দক্ষিণে লঙ্কাদ্বীপ, দক্ষিণপূর্বে মালয় এবং পূর্বে ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত বাণিজ্যে যেতেন।

৩.২. সমবায় ব্যবসা ও ব্যবসার পণ্য

ইতোপূর্বে এ অধ্যায়ের ২.২ অনুচ্ছেদে দেখেছি, প্রাচীনকালে জনগণ নানারকম শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত ও বেচাকেনা করতো। কিন্তু কূটবাণিজজাতক (I. pp. 404-405), সুহনুজাতক (II. pp. 31-32) এবং জরুদপানজাতক (II. pp. 295-296) প্রভৃতি সাক্ষ্য দেয় যে, প্রাচীনকালে সমবায়মূলক ব্যবসাও প্রচলিত ছিল। এসব জাতকে উল্লেখ আছে, কখনো দু'জনে, কখনো বা বহুজনে একত্রিত হয়ে মূলধন সংগ্রহপূর্বক স্থলপথে বা নৌপথে একস্থান হতে অন্যস্থানে পণ্য নিয়ে যেত এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ যথাযথভাবে ভাগ করে নিতো। তবে কখনো কখনো অতিচালক লোকেরা কূটকৌশল প্রয়োগ করে সহজ-সরল অংশীদার ব্যক্তিকে ঠকানোর চেষ্টা করতো। ফলে ভাগবাটোয়ারা নিয়ে কখনো কখনো বিবাদও সৃষ্টি হতো। সমবায়ের মাধ্যমে পরিচালিত ব্যবসায়িক সমিতিগুলো 'শ্রেণি', 'গণ', এবং 'সঙ্ঘ' নামে পরিচিত হতো। তবে জাতকে 'শ্রেণি শব্দের প্রয়োগ বেশি দেখা যায়। সূচীজাতক (III. pp. 281-285), কুসজাতক (V. pp. 278-311), কুম্মাসপিণ্ডজাতক (III. pp. 405-413), সমুদ্দবাণিজজাতক (IV. pp. 158-166), জরুদপানজাতক (II. pp. 295-296) প্রভৃতি জাতকপাঠে জানা যায়, প্রত্যেক সমিতি একজন নেতার মাধ্যমে পরিচালিত হতো এবং নেতারা 'জেট্‌ঠক' উপাধি ধারণ করতেন। তবে উপাধির সঙ্গে বৃত্তি বা পেশা বা শিল্পের নামও যুক্ত হতো। যেমন, যিনি কর্মকার শ্রেণির নায়ক তিনি 'কম্মারজেট্‌ঠক', যিনি মালাকারদের নায়ক তিনি 'মালাকারজেট্‌ঠক', যিনি বড়্‌ঢকি বা নির্মাণশিল্পের নায়ক তিনি 'বড়্‌ঢকিজেট্‌ঠক' প্রভৃতি অভিধায় পরিচিত হতেন। জরুদপানজাতকে (II. pp. 295-296) 'সাত্থবাহজেট্‌ঠক' নামক এক সমিতি প্রধানের উল্লেখ আছে। বট্টকজাতক (II. p. 433) সাক্ষ্য দেয় যে, বণিক সমিতিগুলোরও একটি সম্মিলিত সমিতি ছিল এবং সমস্ত সমিতির একজন প্রধান থাকতেন, যিনি 'উত্তরশ্রেষ্ঠী (উত্তরসেট্‌ঠি)' নামে অভিহিত হতেন। ফলে ধারণা করা যায় যে, বর্তমানকালের ন্যায় প্রাচীনকালেও ভারতবর্ষে 'যৌথ মূলধনী ব্যবসা' এবং

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবসায়িক সমিতির সর্বোচ্চ সংগঠন 'বণিক সমিতি' এর ন্যায় ব্যবসায়ী সংগঠনের অস্তিত্ব ছিল। সুসীমজাতক (II. pp. 45-49) এবং কাসাবজাতক (II. pp. 196-198) পাঠে জানা যায় যে, সমিতিগুলোর মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে ভোটের মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসা করা হতো। উরগজাতক (I. pp. 12-13) সাক্ষ্য দেয়, এসব সমিতির নেতাদের কথা 'জেট্‌ঠকদের' রাজসভায় বেশ প্রতিপত্তি ছিল। উক্ত জাতকে দু'জন শ্রেণিনায়ক বা সমিতি নেতাকে কোশলরাজ প্রসেজিতের মহামাত্রা হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। ফলে ধারণা করা যায় যে, বণিকসমিতির নেতারা অমাত্যের মর্যাদাও লাভ করতেন। ব্যবসায়ীদের মধ্যে শিষ্য রাখার পদ্ধতিও প্রচলিত ছিল বলে বারুণিজাতক (I. p. 252) এবং কুসজাতকে (V. pp. 278-311) উল্লেখ পাওয়া যায়। ব্যবসা সাধারণত বংশগত হলেও ক্ষেত্র বিশেষে পারদর্শিতা লাভের জন্য অনেকে খ্যাতিবান ব্যবসায়ীদের শিষ্য হতেন এবং তারা উক্ত ব্যবসায়ীর তত্ত্বাবধানে ব্যবসা শিক্ষা করতেন। পরে নিজেরা স্বাধীনভাবে ব্যবসা করতেন। এরূপ প্রথা বর্তমানকালেও দেখা যায়।

নানা রকম দ্রব্য উৎপাদিত হলেও জাতকে কতিপয় প্রসিদ্ধ পণ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়, দেশ-বিদেশে যেগুলোর ব্যাপক চাহিদা ছিল এবং বণিকেরা সেসব দ্রব্য বিক্রয় করে বহু অর্থ উপার্জন করতেন। মহানারদকস্‌সপজাতকে (VI. p. 239) দশার্ণ রাজ্যের তরবারী এবং ইন্দ্রিয়জাতকে (III. p. 467) শিবি রাজ্যের কার্পাস বস্ত্রের দেশ-বিদেশে খুবই সুখ্যাতি ছিল বলে উল্লেখ আছে। ময্হকজাতকে (III. p. 300f) কাশীর বস্ত্রের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে, যা কার্পাস দ্বারা প্রস্তুত করা হতো। তণ্ডুলনালিজাতকে (I. p. 125) বারাণসীর নিকটবর্তীস্থানে কার্পাস ক্ষেত্র ছিল বলে উল্লেখ আছে। সীলবনাগজাতক (I. p. 319f) এবং কাষাযজাতক (II. p. 197f) হতে জানা যায় যে, বারাণসীর লোকেরা গজদন্ত দিয়ে উন্নতমানের অলংকার ও আসবাবপত্র নির্মাণ করতো, যার সর্বত্র চাহিদা ছিল। বারাণসীতে এসব দন্তশিল্পীরা যেই গলিতে বসবাস করতো তা 'দন্তকার-বীথি' নামে পরিচিত ছিল। সমুদ্দবাণিজজাতক (IV. pp. 158f) মতে, বারাণসী নগরের সূত্রধরেরা বসার পিড়ি, ঘর এমনকি দূরদেশগামী অর্ণবপোত বা কাষ্ঠনির্মিত জাহাজ নির্মাণে খুবই পারদর্শী ছিলেন। অসদিসজাতক (II. p. 87f) এবং সরভঙ্গজাতকে (V. p. 127f) গো-মহিষের শৃঙ্গ দ্বারা উন্নতমানের ধনুক নির্মাণের কথা উল্লেখ আছে। উল্লেখ্য যে, ধনুকগুলো একাধিক অংশে বিভক্ত ছিল এবং অংশ বিশেষ খুলে থলিতে রাখা যেতো। কাশীরাজ্যের কর্মকারেরা উন্নতমানের কুড়াল, ফলা, পাচন, আসবাবপত্র এবং সুক্ষ্ম সূচী ও সূচীকোষ প্রস্তুত করতে পারতো এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের লোকেরা উপর্যুক্ত দ্রব্য প্রস্তুত ও ক্রয় করার জন্য কাশীরাজ্যে আগমন করতো বলে সূচিজাতকে (III. p. 281) উল্লেখ পাওয়া যায়। কুসজাতক (V. p. 279f) সাক্ষ্য দেয় যে, মল্লরাজ্যের

Dhaka University Institutional Repository

কর্মকারের সৌকর্যমণ্ডিত স্বর্ণমূর্তি নির্মাণে পারঙ্গম ছিলেন। মহাউম্মগ্‌গজাতক (VI. pp. 330ff) এবং সুধাভোজনজাতকে (V. p. 405f) বর্ণিত আছে যে, মিথিলার চিত্রকরেরা চিত্র অঙ্কনে এতই সুদক্ষ ছিল যে তাঁদের অংকিত চিত্র জীবন্ত বলে প্রতীয়মান হতো, তা দেখে লোকে বিমুগ্ধ হয়ে যেতো এবং চিত্র অংকন করানো এবং চিত্র ক্রয়ের জন্য দূর-দূরান্ত থেকে মিথিলায় বহু লোকের সমাবেশ ঘটতো। সুহনুজাতক (II. pp. 31-32) এবং কুণ্ডককুচ্ছিসিন্ধবজাতক (II. pp. 287-291) প্রভৃতিতে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, সিন্ধুদেশে উন্নতমানের ঘোটক জন্মাতো এবং সর্বত্র এ ঘোটকের দারুণ চাহিদা ছিল। বাবেরুজাতকে বণিকেরা ভারতবর্ষ থেকে ময়ূরাদি পক্ষী নিয়ে ব্যাবিলনে বিক্রয় করতো বলে উল্লেখ আছে। বারুণিজাতক (I. p. 252) মতে, শ্রাবস্তীর অনাথপিণ্ডিকের বন্ধুর দোকানের 'তীক্ষ্ণ বারুনি' তথা 'উগ্রবীর্য সুরা' খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। এ কারণে তার দোকানে সুরাপান করা ও ক্রয়ের জন্য উচ্চবংশীয় এবং ধণিক শ্রেণির বহু লোকের সমাগম হতো। ফলে দোকানদার উচ্চ মূল্যের সুবর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে তা বিক্রি করতেন। সুরাপানজাতকে (I. p. 360) 'কপোতিকা' নামক এক মহার্ঘ সুরার উল্লেখ আছে। মহাসুপিনজাতক (I. pp. 335-345) এবং কুরুধম্মজাতকে (II. p. 366-381) মহার্ঘ চন্দন এবং কাঞ্চনহারের কথা পাওয়া যায়। এছাড়া, জাতকে সহস্র কহাপণ মূল্যের প্রসিদ্ধ পাদুকারও উল্লেখ পাওয়া যায়। মিলিন্দ প্রশ্ন[১০] গ্রন্থে কৃষি ও শিল্পজাত বহু পণ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়, যেগুলো নিয়ে বণিকেরা বাণিজ্য করতেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : ধান, গম, আঁখ, সরিষা, শাক-সব্জি, ফল, সুগন্ধি বস্তু, নানা প্রকার রত্ন, আসবাবপত্র, ঔষধ, দন্তমাজন, অমৃত, নানা রকম ঔষধি দ্রব্য। বণিকেরা দূরদেশে উপর্যুক্ত দ্রব্য ও প্রাণি বিক্রয় করে বহু বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতেন এবং দেশকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতেন।

৪. মুদ্রা ব্যবস্থা

মুদ্রা ব্যবস্থা হচ্ছে একটি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থার মাপকাঠি। যে দেশের মুদ্রা ব্যবস্থা যতবেশি শক্তিশালী এবং উন্নত সে দেশের আর্থিক অবস্থা ততবেশি সুসংহত। এই অনুচ্ছেদে জাতকে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে জাতক রচনাকালীন সময়ের মুদ্রা ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

৪.১. বিনিময় প্রথা : মুদ্রা এবং পণ্য

জাতকে দু'প্রকার দ্রব্য বিনিময় প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা : ১) মুদ্রার বিনিময়ে পণ্যের আদান-প্রদান এবং ২) পণ্যের বিনিময়ে পণ্য আদান-প্রদান। তণ্ডুলনালিজাতকে (I. p. 124-125) তণ্ডুল তথা চাউল

Dhaka University Institutional Repository

দ্বারা অশ্ব ক্রয়ের কথা উল্লেখ আছে। বেস্‌সন্তরজাতকে ব্যাধ প্রদত্ত খাদ্যের মূল্য হিসেবে রাজপুত্র বেস্‌সান্তর ব্যাধকে সুবর্ণ-সূচি প্রদান করেন বলে সাক্ষ্য দেয়। বৈদিকযুগে অস্মকদেশে অপরাধের ধরণ অনুসারে 'গরু' দণ্ড প্রদান করা হতো বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।[১১] সম্ভবত তখন গরুই ছিল ধনের আদিম একক। পণ্য অনুসারে 'এক গরু', 'দু'গরু' হিসেবে দাম নির্ধারিত হতো। কিন্তু সীলবীমংসনজাতক (I. p. 369), উভতোভট্ঠজাতক (I. p. 483), নন্দজাতক (I. p. 225), দুরাজানজাতক (I. p. 300), গঙ্গামালজাতক (III. pp. 444-453), দূতজাতক (IV. pp. 224-227), খদিরঙ্গারজাতক (I. pp. 226-233), সচ্চংকিরজাতক (I. pp. 322-327), বব্বুজাতক (I. pp. 477-479) প্রভৃতিতে মুদ্রাপ্রথার উল্লেখ রয়েছে। উভতোভট্‌ঠজাতক (I. p. 483) সাক্ষ্য দেয় যে, রাজা এক তীরন্দাজকে দৈনিক সহস্র কহাপণ বা কাষাপণ মজুরী দিতেন। এ জাতকে আরো উল্লেখ আছে যে, এক গ্রামভোজক এক ধীবরপত্নীকে সামান্য অপরাধের জন্য আট কহাপণ জরিমানা করেছিল। নন্দজাতক পাঠে জানা যায়, এক দাসের মূল্য ছিল শতকহাপণ। সুনখজাতকে (II. p. 247) উল্লেখ আছে যে, এক ব্রাক্ষ্মণ নিজের উত্তরীয় বস্ত্র এবং নগদ এক কহাপণ দিয়ে একটা কুকুর কিনেছিল। ফলে ধারণা করা যায় যে, জাতকের কালে উভয় প্রকার বিনিময় প্রথা প্রচলিত ছিল। তবে জাতকে মুদ্রা বা মুদ্রারূপে ব্যবহৃত বস্তুসমূহের নয় প্রকার নাম পাওয়া যায়, যা নিম্নরূপ :

১. নিক্‌খ বা নিষ্ক,[১২] (কুহকজাতক, I. p. 376)
২. সুবণ্ণ বা সুবর্ণ, (খদিরঙ্গারজাতক, I. pp. 226-233),
৩. হিরণ্য (সীলবীমংসনজাতক, I. p. 369)
৪. কহাপণ বা কাহণ বা কার্ষাপণ) (গঙ্গামালজাতক, III. pp. 444-453)
৫. কংস বা কর্ষ বা কাংস্য, (সিগালজাতক, I. p. 425)
৬. পাদ (গঙ্গামালজাতক, III. pp. 444-453)
৭. মাসক বা মাষা) (গঙ্গামালজাতক, III. pp. 444-453)
৮. কাকণ বা কাকণিকা, (চূল্লকসেট্‌ঠিজাতক, I. p. 120)
৯. সিপ্পিকা (সিগালজাতক, I. p. 425)

এগুলো ছাড়া, বিনয়পিটকে [১৩] 'রুপিয়' নামক এক প্রকার ধাতব মুদ্রার উল্লেখ আছে। সাধারণত এসব মুদ্রা রাজকীয় আদেশে মুদ্রিত হতো। বিশেষত স্বর্ণ, রৌপ্য এবং তাম্র প্রভৃতি ধাতুখণ্ডে রাজন্যবর্গের

মুখাবয়ব মুদ্রিত করে তা মুদ্রা হিসেবে প্রচলন করা হতো। মুখাবয়ব তথা 'রূপ' অংকিত থাকতো বিধায় এসব মুদ্রা 'রুপিয়' নামে অভিহিত হতো।

এসব মুদ্রার মূল্যমান কতছিল তা অস্পষ্ট। জাতকের বাংলা অনুবাদক ঈশানচন্দ্র ঘোষের মতে, ধাতুর ওজন বা ভর অনুসারে পণ্যমূল্য নির্ধারণ এবং পণ্য আদান-প্রদান হতো।[১৪] বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্নভাবে এসব মুদ্রার মান নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। মনু (৮/১৩৪-১৩৭) নিম্নরূপভাবে মুদ্রাগুলোর মান নির্ণয় করেছেন,

তাম্র মুদ্রার ক্ষেত্রে :

- ১মাসা = ৫ রতি
- ৪ মাসা=১ পাদ
- ৪ পাদ = ৮০ রতি
- ৮০ রতি = ১ কর্ষ

রৌপ্য মুদ্রার ক্ষেত্রে :

- ১ মাসা = ২ রতি
- ১৬ মাসা বা ৩২ রতি = ১ ধরণ

স্বর্ণ মুদ্রার ক্ষেত্রে :

- ১ স্বর্ণকোষ বা ৮০ রতি = ১ সুবর্ণ
- ৪ সুবর্ণ = ১ পল
- ১ পল = ১ নিক্খ বা নিষ্ক
- ১ নিক্খ বা নিষ্ক = ৩২০ রতি।

পণ্ডিত ঈশানচন্দ্র ঘোষ মনুর এই মান নিণয়ের পদ্ধতি সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে মনে করেন না। [১৫] Pali-English Dictionary[১৬]-তে, মুদ্রাসমূহের মধ্যে নিম্নরূপ সম্পর্ক প্রদর্শিত হয়েছে :

- কহাপণ এর অর্ধেক অর্দ্ধ, অর্দ্ধ এর অর্ধেক পাদ, পাদ এর অর্ধেক মাসক, মাসকের অর্ধেক কাকণিকা।

Dhaka University Institutional Repository

উপরের তথ্য বিশ্লেষণে বলা যায়, মুদ্রাসমূহের আপেক্ষিক মান নির্ণয় করা কঠিন। প্রাচীন গ্রন্থকারেরাও এ বিষয়ে কোনো সঠিক নির্দেশনা প্রদান করতে পারেননি। তবে জাতকের কালে যে মুদ্রা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তা সহজেই অনুধাবন করা যায়।

৪.২. পণ্যের মূল্য নির্ধারণ ও ক্রয়-বিক্রয়

তণ্ডুলনালিজাতকে (I. p. 124-125) বর্ণিত আছে যে, 'অর্ঘকারক' নামক রাজকর্মচারী রাজা যে সকল দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করতেন তার মূল্য নির্ধারণ করতেন এবং উৎকোচ গ্রহণের মাধ্যমে তিনি কখনো কখনো দ্রব্যের উপর্যুক্ত মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি করতেন। তিনি যে মূল্য নির্ধারণ করতেন ক্রেতা-বিক্রেতারা সেই মূল্যে দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করতে বাধ্য হতেন। তবে তিনি সাধারণ মানুষের পণ্য মূল্য নির্ধারণ করতেন এরূপ সাক্ষ্য জাতকে পাওয়া যায় না। অবশ্য মনুসংহিতায় উল্লেখ আছে যে, রাজা প্রতি পক্ষে বা প্রতি পঞ্চম দিবসে দ্রব্যের মূল্য নিধারণ করে দিতেন। অপণ্ণকজাতকে (I. p. 99-100), সেরিবাণিজজাতক (I. p. 111), কণহজাতক (I. p. 195) এবং মচ্ছুদ্দানজাতক (II. p. 424) প্রভৃতিতে পণ্যের দরকষাকষি উল্লেখ পাওয়া গেলেও সাধারণ মানুষের দ্রব্য মূল্য নির্ধারণ সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। চূল্লকসেট্ঠিজাতক (I. p. 121-122) পাঠে জানা যায় যে, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে বায়না প্রথাও প্রচলিত ছিল। কোনো দ্রব্যের মূল্য স্থির করা হলে লোকে তা বায়না করে রাখতো। ফলে পরবর্তীতে সে দ্রব্যের মূল্য শতগুণ বৃদ্ধি পেলেও অন্যজনের কাছে বিক্রি করা যেতো না। জাতকে এবং পালি সাহিত্যে দোকানের (আপন) এবং ফেরি করে দ্রব্য বিক্রির কথা বর্ণিত আছে। আবার, একস্থান হতে সমস্ত মালামাল ক্রয় করার কথাও উল্লেখ আছে। চূল্লকসেট্ঠিজাতকে (I. p. 121-122) এক বণিক বন্দরে গিয়ে জাহাজসুদ্ধ সমস্ত মালামাল ক্রয় করার কথা রয়েছে। যে সকল স্থানে পাইকারী দ্রব্য বিক্রয় হতো তা 'নিগমগ্রাম' নামে পরিচিত ছিল। এতে বোঝা যায়, জাতক রচনাকালে খুচরা ও পাইকারী উভয়প্রকার ক্রয়-বিক্রয় প্রথা প্রচলিত ছিল। জাতেকর মূল্য নির্ধারণের পদ্ধতির উল্লেখ পাওয়া না গেলেও অনেক দ্রব্যের মূল্যের উল্লেখ পাওয়া যায়, যা দ্বারা প্রাচীনকালের দ্রব্যমূল্য সম্পর্কে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। নিম্নে জাতকের নামসহ কতিপয় দ্রব্যের মূল্য উপস্থাপন করা হলো :

- একটি বড় মাছের মূল্য সাত মাসক (মাষা), (মচ্ছুদ্দানজাতক, II. p. 424)
- এক কৃকলাসের ভোজনোপযোগী মাংসের মূল্য আধা মাসক, (মহাউম্মগ্‌গজাতক,VI. pp. 330ff)
- প্রসিদ্ধ পাদুকার মূল্য সহস্র কহাপণ, (কুরুধম্মজাতক II. p. 366-381)

- একটা গাধার মূল্য আট কহাপণ, (মহাউম্মগ্‌গজাতক, VI. pp. 330ff)
- দু'টি বলদের মূল্য চব্বিশ কহাপণ, (কণ্‌হজাতক, I. p. 194-195) ও (গামনিচণ্ডজাতক, II. p. 297-298),
- বলদের টানা প্রতি গাড়ীর ভাড়া দুই কহাপণ, (কণ্‌হজাতক, I. p. 194-195)
- একবার ক্ষৌরকর্মের মূল্য আট কহাপণ, (সুপ্পরকজাতক, IV. p. 137f)
- একটি মহার্ঘ চন্দনের মূল্য লক্ষ মুদ্রা, (কুরুধম্মজাতক, II. p. 366-381)
- কাঞ্চনহারের মূল্য সহস্রমুদ্রা, (কুরুধম্মজাতক, II. p. 366-381)
- এক পাত্র সুরার মূল্য এক মাসক (মাষা), (ইল্লীসজাতক, I. p. 349) :
- রাজ তীরন্দাজের দৈনিক মজুরী সহস্র কহাপণ (কাষাপণ), (উভতোভট্‌ঠজাতক, I. p. 483)
- একটি কুকুরের মূল্য উত্তরীয় বস্ত্রসহ এক কহাপণ, (সুনখজাতকে, II. p. 247)
- এক ক্রীতদাসের মূল্য শতকহাপণ, নন্দজাতক (I. p. 225)
- নারীর সামান্য অপরাধের জরিমানা আট কহাপণ, (উভতোভট্‌ঠজাতক, I. p. 483)
- জেতবনের মূল্য অষ্টাদশকোটি হিরণ্য, (জাতকের ভূমিকা, I. p. 92)
- জেতবন বিহার নির্মাণের ব্যয় চুয়ান্ন কোটি সুবর্ণ, (খদিরঙ্গারজাতক, I. p. 226)
- রাণীর বস্ত্রমূল্য সহস্রমুদ্রা, (গুণজাতক, II. p. 26f)

৫. ঋণদান ও সুদ প্রথা

জাতকে ঋণপ্রথার উল্লেখ পাওয়া যায়। ফলে ধারণা করা যায় যে, জাতক রচনাকালে প্রাচীন ভারতে ঋণদান প্রথাও প্রচলিত ছিল। থেরীগাথাতে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, ঋণ শোধে অপরাগ হলে ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার সন্তানদের দাসত্বে নিয়োগ করতেন। থেরী ইসিদাসীর জীবন কাহিনিতে উল্লেখ আছে যে, অতীতে তিনি এক শকট চালকের কন্যা ছিলেন। তাঁর পিতা বহু বণিকের নিকট হতে ঋণ করেন। ঋণ শোধ করতে ব্যর্থহলে ঋণ দাতা তাঁকে বেঁধে নিয়ে যান।[১৭] খদিরঙ্গারজাতকে (I. pp. 226-233) পর্ণ বা খত (দস্তখত) দিয়ে ঋণ গ্রহণ এবং ঋণ পরিশোধের সময় তা ফেরত নিয়ে ঋণশোধের কথা বর্ণিত আছে। এ জাতকে উল্লেখ আছে যে, একদা বুদ্ধ জেতবন বিহারে অবস্থানকালে বহু বণিক শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিক হতে ঋণপর্ণ দিয়ে অষ্টাদশ কোটি সুবর্ণ ঋণ নেন। তিনি আরো অষ্টাদশ কোটি সুবর্ণ পণ্ডিলপাত্র পূর্ণ করে নদীতীরে একস্থানে প্রোথিত করে রাখেন। একদিন প্রবল ঝড়ে নদী তীরে সুবর্ণপাত্র

Dhaka University Institutional Repository

প্রোথিত অংশ ভেসে যায়। ফলে তিনি অতি দরিদ্র হয়ে পড়েন। তৎসত্ত্বেও তিনি দানকর্ম অব্যাহত রাখেন। তাঁর দানকর্মে তুষ্ট হয়ে দেবরাজ শক্র এক দেবতা অনাথপিণ্ডিকের কর্মচারীর বেশ ধারণপূর্বক ঋণগ্রহীতাদের নিকট যাওয়ার আদেশ দেন। দেবরাজ শক্রের আদেশ মতো সেই দেবতা অনাথপিণ্ডিকের কর্মচারীর বেশ ধারণপূর্বক ঋণপর্ণ নিয়ে ঋণগ্রহীতাদের নিকট যান এবং ঋণপর্ণ ফেরত নিয়ে ঋণ পরিশোধ করতে বলেন। ঋণগ্রহীতারা তার আদেশ মতো কাজ করেন। এতে অনাথপিণ্ডিক পুনরায় ধনশালী হয়ে ওঠেন। রোহন্তমিগজাতকে (IV. p. 413ff) বারাণসীরাজ কৃষি, বাণিজ্য এবং ঋণদানকে শুদ্ধবৃত্তি হিসেবে অভিহিত করেছেন এবং তিনি এক উপকারকারী ব্যাধকে ঋণদানের মাধ্যমে অর্জিত সুদের দ্বারা জীবিকা নির্বাহের উপদেশ প্রদান করেন। তবে সুদপ্রথাকে সর্ব সমাজে ঘৃণিতকাজ হিসেবে গণ্য করা হতো। কারণ, মহাকণহজাতকে (IV. p. 180ff) কুসীদজীবি তথা সুদে টাকা খাটনো পেশাকে নিন্দা করা হয়েছে। পালি সাহিত্যে সুদগ্রহণের প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া না গেলেও বুদ্ধ ঋণমুক্ত অবস্থাকে 'সুখ' হিসেবে অভিহিত করেছেন এবং ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি বৌদ্ধ সঙ্ঘে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন।[১৮] এ কারণে ঋণ গ্রহীতারা ঋণশোধে সর্বদা সচেষ্ট থাকতো। রুরুজাতকে (IV. p. 255ff) ঋণশোধে ব্যর্থ হয়ে আত্মহত্যার চেষ্টার উল্লেখ আছে। মিলিন্দ প্রশ্ন [১৯] গ্রন্থ হতে জানা যায়, পিতা নিজের ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত প্রিয়তমপুত্রকেও বন্ধক দিতেন বা বিক্রয় করতেন। কারণ ঋণী হয়ে থাকা বড় অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হতো। জাতকে ঋণদান প্রথার উল্লেখ থাকলেও সুদের হার কীরূপ ছিল তা উল্লেখ পাওয়া যায় না।

৬. সমবায় ভিত্তিক আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ড

জাতকপাঠে জানা যায় যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে সমবায় ভিত্তিক আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডও প্রচলিত ছিল। সমাজের মঙ্গলার্থে জনগণ একত্রিত হয়ে আর্থিক অনুদান ও শারীরিক শ্রম প্রদান পূর্বক নানা মঙ্গলজনক কর্ম সম্পাদন করতো। কুলাবকজাতকে (I. p. 199f) উল্লেখ আছে যে, বোধিসত্ত্বের উপদেশে মগধের লোকেরা সমবেত হয়ে আর্থিক ও কায়িক শ্রমদানে ধর্মশালা, সেতু, পুষ্করণী প্রভৃতি নির্মাণ করেন। লোসকজাতক (I. 237) এবং তক্কজাতকে (I. p. 296) বারাণসী নগরের লোকেরা সমবেত প্রচেষ্টায় আর্থিক অনুদানে বিদ্যায়তন স্থাপন এবং শিক্ষকের গৃহ নির্মাণ করে দেয়ার কথা বর্ণিত আছে। গহপতিজাতকে (II. p. 135) দুর্ভিক্ষের সময় গ্রামভোজকের নিকট হতে যৌথ ঋণ গ্রহণ করে জীবিকা নির্বাহের কথা উল্লেখ আছে। মহাউম্মগ্গজাতক (VI. pp. 330ff) পাঠে চাঁদা তুলে ক্রীড়াশালা, পান্থশালা

Dhaka University Institutional Repository

বা বিশ্রামাগার এবং বিচারগৃহ নির্মাণের কথা জানা যায়। নিগ্রোধমিগজাতকে (I. p. 150f) এবং নন্দিয়মিগজাতকে (III. p. 271) উল্লেখ আছে যে, বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত অত্যন্ত মৃগয়াসক্ত ছিলেন। মৃগমাংস না হলে তিনি আহার করতে পারতেন না। ফলে তিনি প্রায় প্রতিদিন পুরবাসী এবং জনপদবাসী বহু জনগণ সঙ্গে নিয়ে মৃগয়ায় যেতেন। এতে অনেক জনগণ কর্মহীন হয়ে অর্থাভাবে দিন কাটাতো। এর থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তারা রাজোদ্যানে তৃণ রোপন এবং পুষ্করণী খনন করে মৃগ চরণের ব্যবস্থা করে। অতপর, মৃগ তাড়িয়ে রাজোদ্যনে আবদ্ধ করে রাখে, যাতে রাজা নিজে মৃগ শিকার করে ভোজন করতে পারেন। এভাবে সমবেত প্রচেষ্টায় অর্থেকষ্টে পতিত জনগণকে সাহায্য সহযোগিতা করা হতো। উপরোক্ত বিষয় পর্যালোচনা করে ধারণা করা যায় যে, বর্তমানকালের ন্যায় প্রাচীনকালেও ভারতবর্ষে সমবায় ভিত্তিক আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো।

৭. ধনাঢ্য ব্যক্তির অর্থনৈতিক অবস্থা

পালি সাহিত্যে প্রাচীনভারতের বহু আর্থিকভাবে সচ্ছল ব্যক্তির জীবন ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ পাওয়া যায়, যা সে সময়কার জনজীবনের আর্থিক অবস্থার চিত্র অঙ্কনে সহায়ক। দীর্ঘনিকায়,[২০] সুত্তনিপাতের অট্ঠকথা,[২১] থেরীগাথা,[২২] খদিরঙ্গারজাতক (I. p. 227) এবং ইল্লীসজাতক (I. p. 346) প্রভৃতি হতে জানা যায় যে, প্রাচীনকালে রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, বারাণসী, কাশী প্রভৃতি নগরগুলো ছিল আয়তনে বড়, জনবহুল এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নত। এসব নগরের বহু ধনাঢ্য ব্যক্তির বিভিন্ন ঋতু উপযোগী প্রাসাদ ছিল এবং জনগণ বিলাসবহুল জীবনযাপন করতো। সংযুক্ত নিকায়[২৩] সাক্ষ্য দেয় যে, শ্রাবস্তী নগরের ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের প্রচুর অর্থ-বিত্ত এবং খ্যাদ্যশস্য মজুদ থাকতো। এ নগরীর এক ধনী মৃত্যুকালে এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা রেখে যান বলে বিনয়পিটকে উল্লেখ পাওয়া যায়। এ গ্রন্থ আরো উল্লেখ আছে যে, চম্পনগরীর 'সোণকোলিবিস' নামক এক বিত্তশালী ব্যক্তি আশিটি শকটপূর্ণ স্বর্ণমুদ্রা এবং সাতটি হাতির মালিক ছিলেন। জাতকের ছত্রে ছত্রে এ নগরীর শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিকের বিত্ত-বৈভবের উল্লেখ পাওয়া যায় (খদিরঙ্গারজাতকে, I. pp. 226-233)। অঙ্গুত্তর নিকায়ের অট্ঠকথা[২৪] হতে জানা যায়, তিনি বুদ্ধ ও ভিক্ষুসঙ্ঘের জন্য আঠার কোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয়ে জেতবন ক্রয়, আরো আঠার কোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয়ে তাতে বিহার নির্মাণ এবং আরো আঠার কোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয়ে বিহার উৎসর্গ উৎসব পালন করেন। তিনি প্রতিদিন অতিথি, গ্রামের দরিদ্র ও অক্ষম ব্যক্তিদের খাওয়ানোর পাশাপাশি একশতজন বৌদ্ধভিক্ষুকে উত্তম ভোজ্যদ্রব্যে আপ্যায়ন করতেন। প্রতিদিন তাঁর বাড়িতে অতিথি

Dhaka University Institutional Repository

আপ্যায়নের জন্য পাঁচশত আসন প্রস্তুত থাকতো। ধম্মপদট্‌ঠকথায়[২৫] উল্লেখ আছে যে, ভদ্দবতী নগরের ভদ্দবতী নামক ব্যক্তি এবং রাজগৃহ নগরীর রাজগহ নামক ব্যক্তি এত ধনাঢ্য ছিলেন যে তাঁরা নগরের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে 'শ্রেষ্ঠী' উপাধি লাভ করেন এবং তাঁদের ধনখ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ধম্মপদট্‌ঠকথা[২৬] এবং সুজাতজাতকে (I. p. 347) ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর ধন-ঐশ্বর্য এবং প্রভাব প্রতিপত্তির উল্লেখ আছ। বিনয়পিটকে[২৭] উল্লেখ আছে যে, বৈশালীর বারাঙ্গনা আম্রপালি এবং রাজগৃহের বারাঙ্গনা সালবতী প্রচুর ধন-সম্পদের অধিকারী ছিলেন। তাঁদের সঙ্গসুখ উপভোগ করার জন্য দেশ-বিদেশের রাজন্যবর্গ এবং ধনাঢ্য ব্যক্তিরা উন্মুখ হয়ে থাকতেন। বলা হয়ে থাকে যে, তাঁদের কল্যাণে বৈশালী ও রাজগৃহ নগরী অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, বর্তমানকালের ন্যায় প্রাচীনকালেও ভারতবর্ষে বহু ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন, যাঁরা নানা রকম আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ড দ্বারা সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

৮. অর্থনৈতিক বিষয়ে বৌদ্ধ ধারণা

অর্থনীতিতে শ্রমকে উৎপাদনের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। কারণ শ্রম থেকে সঞ্চয় এবং সঞ্চয় থেকে পুঁজি গঠিত হয়। পুঁজি বৃদ্ধির ফলে অর্থনীতি চাঙ্গা হয় এবং উৎপাদনের গতি বৃদ্ধি পায়। এ সত্যকে উপলব্ধি করে বুদ্ধ মানুষকে বহু প্রকার শিল্প শিক্ষার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। বুদ্ধ মঙ্গলসূত্রে বহু প্রকার শিল্প শিক্ষাকে ৩৮ প্রকার উত্তম মঙ্গলের অন্যতম একটি হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, শিল্পবিদ্যার সমান ধন নেই, শিল্পবিদ্যা কোনো কিছুতেই বিনষ্ট হয় না। শিল্পবিদ্যায় পারঙ্গম ব্যক্তি ধন সম্পদ উপার্জন করে সর্বদা সুখে থাকেন। ধন সম্পদ না থাকলে পুণ্য অর্জন করা যায় না। কারণ, ধন না থাকলে দান করা যায় না। দান নির্বাণ লাভের সোপান এবং দানে দুর্গতি নাশ হয়।[২৮] এছাড়াও, গৃহীদের উদ্দেশ্য করে অর্থনৈতিক বিষয়ে বুদ্ধ বহু উপদেশ দিয়েছেন, যা জাতক এবং বিভিন্ন পালি গ্রন্থের সূত্রে উল্লেখ পাওয়া যায়। এসব সূত্র এবং জাতক সমীক্ষাপূর্বক অর্থনৈতিক বিষয়ে বৌদ্ধ চিন্তা-চেতনাজাত ধারণা এ অনুচ্ছেদে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো।

দীর্ঘনিকায়ের চক্কবত্তীসীহনাদ সুত্তন্তে[২৯] বুদ্ধ বলেছেন, যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ সৃষ্টি করতে পারে না সে দরিদ্র হয় এবং দারিদ্রতা হিংসা, চুরি, ডাকাতি ব্যভিচার প্রভৃতি দুর্নীতিমূলক কর্মকাণ্ডের মূল উৎস। অপরাধ দূর করতে হলে কৃষককে শস্য-বীজ, বণিককে মূলধন এবং শ্রমিককে বাড়তি মজুরী দিয়ে উৎপাদনের সংস্থান করে দেওয়া উচিত। অর্থ্যাৎ দারিদ্র এবং পণ্যের অনুৎপাদন দুঃখদায়ক। বুদ্ধের এই উপদেশ ক্ষুদ্র শিল্পের

Dhaka University Institutional Repository

দরিদ্র শ্রমজীবি মানুষকে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথ প্রদর্শন করে। ফলে মানুষ নানা রকম শিল্প (অনুচ্ছেদ ২.২ এবং ২.৩ দ্রষ্টব্য) বা বৃত্তি অবলম্বনপূর্বক সৎভাবে বেঁচে থাকার প্রেরণা লাভ করে। সিগালোবাদ সূত্রে[৩০] বুদ্ধ নেশাদ্রব্য গ্রহণ এবং দ্যুত ক্রীড়া তথা তাস, পাশা এবং জুয়া জাতীয় খেলাকে ধন বিনষ্টের অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে বলেছেন, আলস্যপরায়ণতার ফলে অনুৎপন্ন ধন উৎপন্ন হয় না এবং উৎপন্ন ধন বিনষ্ট হয়। এ সূত্রে কর্মচারীদের উপর্যুক্ত পারিশ্রমিক দেয়ার কথাও বলা আছে। ব্যগ্‌ঘপজ্জ সূত্রে[৩১] পরিশ্রম ও সৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন ও জীবিকা নির্বাহ করতে বুদ্ধ নির্দেশ প্রদান করেছেন। এ সূত্রে সদুপায়ে কষ্টে অর্জিত সম্পদ সতর্কতার সঙ্গে রক্ষার করতেও বলা হয়েছে, যাতে চোর, অপহরণকারী এবং ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি দ্বারা বা আগুনে বিনষ্ট না হয়। তাছাড়া, কৃপণতা পরিহার, আয় বুঝে ব্যয়, আয়-ব্যয়ের সমন্বয় সাধন করে শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাপনেরও নির্দেশনা রয়েছে। এ সূত্রে আরো উল্লেখ আছে যে, উত্তরাধিকারীদের জন্য সম্পদ রেখে যাওয়া মাতা-পিতার দায়িত্ব। তাছাড়া, এ সূত্রে বেশ্যাসক্তি, নেশাপান, জুয়াখেলা এবং কুসঙ্গীর সংস্রব - এ চারটি বিষয় সম্পদ নাশের অন্যতম কারণ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। পরাভব সূত্রে[৩২] বুদ্ধ বলেছেন, "যে ব্যক্তি পরস্ত্রীতে আসক্ত, নেশাদ্রব্য পান করে, সে সম্পত্তি অর্জন করতে পারে না, তার লব্ধ সম্পত্তি বিনষ্ট হয় এবং পরিশেষে তার পরাজয় ঘটে। তাছাড়া, যে ব্যক্তি অর্থবিনাশকারী স্ত্রী, সন্তান ও আত্মীয় স্বজনকে সম্পদের উত্তরাধিকারী মনোনীত করে তারও সম্পদহানি ঘটে। যে দুষ্পাপ্য ধন-সম্পদের অসম্ভব আশা পোষণ করে তারও পরাজয় ঘটে।" ধর্মপদ গ্রন্থে যুব বয়সকে সম্পদ অর্জনের উত্তম সময় বলে অভিহিত করা হয়েছে। অঙ্গুত্তরনিকায়ে[৩৩] অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাকে পৃথিবীর চার প্রকার সুখের মধ্যে প্রথম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ গ্রন্থে সম্পদকে পৃথিবীর অন্যতম কাঙ্ক্ষিত বস্তু হিসেবেও উল্লেখ করা হয়েছে।[৩৪] কূটদন্ত সূত্র[৩৫] পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সামাজিক উন্নয়ন অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এ সূত্রে খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধ এবং বাসস্থান - মানুষের এ চারটি মৌলিক চাহিদা পূরণ না হওয়াকে সামাজিক সমস্যা সৃষ্টির কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বুদ্ধ ধম্মিকসূত্রে যথোপযুক্ত বাণিজ্যে লিপ্ত হতে উপদেশ প্রদান করেছেন। সিগালোবাদ সূত্রে আয়-ব্যয় সম্পর্কে বুদ্ধ নিম্নরূপ উপদেশ প্রদান করেছেন :

১. একভাগ নিজে পরিভোগ করবে। এ অংশ থেকে এক ভাগ দান করবে।

২. দুই ভাগ কৃষি বা বাণিজ্যে নিযুক্ত করবে।

৩. চতুর্থ ভাগ সঞ্চয় করে রাখবে, যাতে বিপদের দিনে ব্যবহার করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক বিষয়ে উপর্যুক্ত বৌদ্ধ চিন্তা ধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, অর্থনীতি, নৈতিকতা এবং আধ্যাত্মিকতা পরস্পর সম্পৃক্ত। বৌদ্ধ অর্থনৈতিক ধারণা একদিকে মুনাফা অর্জনকে সমর্থন দেয়, অন্যদিকে নৈতিকতা অনুসরণেরও নির্দেশনা প্রদান করে।

৯. উপসংহার

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক অবকাঠামোতে গ্রাম ছিল উৎপাদক কেন্দ্র, অপরদিকে নগর ছিলো মজুদ ও বিতরণ কেন্দ্র, এবং কৃষি ও ক্ষুদ্রশিল্প ছিল অর্থনীতির প্রাণ বা মূল চালিকা শক্তি। প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড ও কৃষি ব্যতীত অধিক সংখ্যক জনগণ প্রধানত ১৮ প্রকার শিল্প তথা বৃত্তিকে অবলম্বন করে আর্থিক সংস্থান ও জীবিকা নির্বাহ করতো। এসব বৃত্তিধারী শিল্পীর কর্মদক্ষতা ও কলা-কৌশলে প্রস্তুতকৃত দ্রব্য দেশ-বিদেশে খুবই চাহিদা ছিল। কৃষি এবং শিল্পজাত দ্রব্য ছিল ব্যবসা বাণিজ্যের মূল উপাদান। স্থল এবং জল- উভয় পথেই ব্যবসা-বাণিজ্য চলতো। পণ্য পরিবহণে বণিকেরা সাধারণত স্থলপথে গো-শকট, আর জলপথে অর্ণবপোত বা নৌযান ব্যবহার করতেন। তাঁরা নানারকম কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্য নিয়ে দূর-দূরান্তে বাণিজ্য করতে যেতেন এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনপূর্বক দেশকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করতে ভূমিকা রাখতেন। তৎকালে এদেশের সঙ্গে নৌপথে পশ্চিমে পারস্য উপসাগর, দক্ষিণে লঙ্কাদ্বীপ, দক্ষিণপূর্বে মালয় এবং পূর্বে ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। দ্রব্য বেচা-কেনায় দু'প্রকার বিনিময় প্রথা প্রচলিত ছিল। মুদ্রার বিনিময়ে যেমন পণ্যের আদান-প্রদান হতো, তেমনি পণ্যের বিনিময়েও পণ্যের আদান-প্রদান চলতো। তবে মুদ্রাগুলো ছিল ধাতবপদার্থে তৈরী। পালি সাহিত্য সমীক্ষায় দেখা যায়, জাতকের রচনাকালীন অর্থনীতিতে ক্ষেত্র বিশেষে বৌদ্ধ চিন্তা-চেতনার প্রভাব পড়ে। ফলে মুনাফা অর্জন অর্থনীতির মূল দর্শন হলেও বৌদ্ধ-দৃষ্টিভঙ্গি ও ধ্যান-ধারণা নৈতিকতা প্রসূত মুনাফাকেই কেবল স্বীকার করে। এ কারণে বৌদ্ধযুগে অর্থনীতি, নৈতিকতা এবং আধ্যাত্মিকতা পরস্পরের পরিপূরক হয়ে ওঠে। তাই, বৌদ্ধ অর্থনৈতিক ধারণা একদিকে মুনাফা অর্জনকে সমর্থন দেয়, অন্যদিকে নৈতিকতা অনুসরণেরও নির্দেশনা প্রদান করে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

[১] শরৎকুমার রায়, *বৌদ্ধ ভারত*, করুণা প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৪০১ (বাংলা সন), পৃ. ৮৫-৮৫।

[২] *দীঘ নিকায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩।

[৩] *Milinda Panha*, p. 178.

[৪] *Vinaya Pitaka*, op. cit., vol. III., p. 249.

[৫] *Majjhima Nikāya*, op. cit., vol. II., p. 205.

[৬] *Aṅguttara Nikāya*, op. cit., vol. II, p. 82.

[৭] *The Jātaka*, vol. I., p. 8.

[৮] *Vinaya Pitaka*, op. cit., vol. I., p. 220.

[৯] *Dīgha-Nikāya*, op.cit., vol. I, p. 227.

[১০] *Milinda Panha*, p. 333.

[১১] ঈশানচন্দ্র ঘোষ, *জাতক*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

[১২] বেদের 'নিষ্ক' শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়, তবে তাতে এটি দ্বারা স্বর্ণমুদ্রা বুঝাতো কি না তা অস্পষ্ট।

[১৩] *Vinaya Pitaka*, op. cit., vol. II., p. 46.

[১৪] *জাতক*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

[১৫] ঐ।

[১৬] T. W. Rhys Davids & William Stede (ed.), *Pali-English Dictionary*, Indian Edition, 1975, p. 201.

[১৭] বেলু রানী বড়ুয়া, *থেরীগাথা*, বাংলাদেশ রিসার্চ সেন্টার ফর বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ১৪৩-৪৪ ।

[১৮] *Dīgha Nikāya,* op. cit., vol. II., p. 39; *Majjhima Nikāya*, op. cit., vol. II, p. 105. *Aṅguttara Nikāya*, op. cit., vol. II., p. 64.

[১৯] *Milinda Panha*, p. 279.

[২০] *Dīgha Nikāya,* op. cit., vol. I., pp. 211-212.

[২১] Helmer Smith (ed.), *Sutta-Nipāta Commentary being Paramatthajotikā*, P. T. S. London, 1916, vol. I., p. 300.

[২২] *থেরীগাথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

[২৩] *Saṃyutta Nikāya*, op. cit., vol. II., pp. 75.

[২৪] Dhammakitti Siri Dhammananda (ed.) *Manorathapūraṇī, Buddhaghosa's Commentary on the Aṅguttara Nikāya,* P.T.S London, 1924, vol. I., p.112.

[২৫] *The Commentary on the Dhammapada*, op. cit., Vol. I., op. cit., p. 187.

[২৬] ibid, p. 384.

[২৭] *Vinaya Pitaka*, op. cit., vol. I., p. 268-269.

[২৮] প্রজ্ঞালোক মহাথের, *লোকনীতি*, বৌদ্ধ মিশন প্রেস, রেঙ্গুন, পৃ. ২।

[২৯] *Dīgha Nikāya,* op. cit., vol. III., p. 58.

[৩০] *Dīgha Nikāya,* op. cit., vol. III., p. 104.

[৩১] *Aṅguttara Nikāya*, op. cit., vol. IV., p. 281.

[৩২] প্রাগুক্ত জিনবোধি ভিক্ষু, *সদ্ধর্ম্ম নীতি মঞ্জরী*, বুদ্ধিস্ট রিসার্চ এণ্ড পাবলিকেশন সেন্টার, চট্টগ্রাম, ২০০৪, পৃ. ৩৩২-৩৩৫।

[৩৩] *Aṅguttara Nikāya*, op. cit., vol. II., p. 69.

[৩৪] *Aṅguttara Nikāya*, op. cit., vol. IV., p. 281.

[৩৫] *দীঘ নিকায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

অবতরণিকায় উল্লেখ করেছি, জাতকের তথ্যের আলোকে প্রাচীন ভারতের সমাজ জীবন প্রকটিত করার মাধ্যমে ভারতীয় নৃতাত্ত্বিক জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করাই এ অভিসন্দর্ভের মৌল অভীপ্সা। এ উদ্দেশ্যকে ফলপ্রসু করার মানসে আলোচ্য বিষয়কে আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে অভিসন্দর্ভটি রচনা করেছি। বিশেষত, প্রাচীন ভারতের ভৌগোলিক সীমারেখা, রাজনীতি, রাষ্ট্র ব্যবস্থা, জনজীবন, সামাজিক প্রথা ও রীতি-নীতি, ধর্ম-দর্শন, শিক্ষা-সংস্কৃতি, অর্থনীতি প্রভৃতি সমাজ জীবনের অবিচ্ছেদ্য উপাদানসমূহ জাতকে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে সমীক্ষাপূর্বক প্রাচীন ভারতের সমাজ জীবনের রূপরেখা অঙ্কনের চেষ্টা করেছি।

অভিসন্দর্ভটি মূলত জাতকের তথ্যের আলোকে রচিত হয়েছে। তাই জাতকে প্রাপ্ত তথ্য কতটুকু ইতিহাসস্পর্শী তা নির্ণয়ের জন্য প্রথম অধ্যায়ে জাতকের স্বরূপ সমীক্ষা করেছি। সমীক্ষণে দেখা যায় যে, জাতকের প্রধান উপজীব্য বিষয় হচ্ছে গৌতম বুদ্ধের জীবন-দর্শন। তিনি তাঁর শিষ্য এবং অনুসারীদের নৈতিক শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে প্রসঙ্গক্রমে তাঁর অতীত জীবনের নানা কাহিনি ভাষণ করতেন। এ কাহিনিগুলো বৌদ্ধ সাহিত্যের ভাণ্ডারে 'জাতক' নামে পরিচিতি লাভ করে। তাই গৌতম বুদ্ধকে জাতকের স্রষ্টা হিসেবে গণ্য করা যায়। কিন্তু রচনাশৈলী, ভাষা এবং বিষয়বস্তু পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, সবগুলো জাতক গৌতম বুদ্ধ কর্তৃক ভাষিত বা একজন লেখক কর্তৃক রচিত এবং একই সময়ে রচিত হয়েছিল বলে মনে হয় না। কারণ, জাতকের আখ্যানগুলোর মধ্যে রচনাশৈলীর পার্থক্য, পুনঃরুক্তি দোষ এবং বর্ণিত গাথাসমূহের ভাষাশৈলী, ভাব ও কবিত্বগত পার্থক্য রয়েছে। কোনো কোনো আখ্যায়িকা কৃত্রিম এবং বৌদ্ধ ভাবধারা হতে বিচ্যুত বলেও প্রতীয়মান হয়। ফলে ধারণা করা যায় যে, গৌতমবুদ্ধ ছাড়াও, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক জাতক রচিত হয়ে জাতকের কলবর বৃদ্ধি ঘটেছিল। এ কারণে প্রকৃত জাতকের সংখ্যা নিয়েও তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। বুদ্ধের অন্যান্য ধর্মবাণীর ন্যায় জাতকগুলোও খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে সিংহলে লিখিত আকারে সংরক্ষণ করা হয়েছিল। এ কারণে অধিকাংশ জাতক খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের পূর্বে রচিত হয়েছিল বলে ধারণা করা যায়। বর্তমানে পালি ভাষায় যে ত্রিপিটক পাওয়া যায় তা সিংহলে সংরক্ষিত পুঁথি হতে সংকলিত হয়েছিল। জাতক ত্রিপিটকের খুদ্দক নিকায়ের দশম গ্রন্থ। ফলে জাতকও উক্ত পুঁথি হতে সংকলিত হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। *জাতকত্থবণ্ণনা* নামক জাতকের অট্ঠকথা বা ভাষ্য গ্রন্থটি বিশিষ্ট অট্ঠকথাচার্য বুদ্ধঘোষ সিংহলে সংরক্ষিত পুঁথির তথ্যের সাহায্যে খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে রচনা করেছিলেন। তিনি সিংহলে ৫৫০টি জাতক সংরক্ষিত ছিল বলে জাতকত্থবণ্ণা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

ফলে মূল জাতকের সংখ্যা যে ৫৫০টি ছিল তাতে সন্দেহ নেই। নৈতিকতা শিক্ষাদানই জাতক রচনার প্রধান উদ্দেশ্য। ফলে প্রসঙ্গক্রমে জাতকে জনজীবন সংশ্লিষ্ট বহু তথ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। জাতকের বিষয়বস্তু কাহিনি বা গল্পের আদলে সন্নিবেশিত। এজন্য এতে অতিরঞ্জিত ভাবকল্পনাও পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু জনজীবন সংশ্লিষ্ট তথ্যসমূহ জাতকের 'প্রত্যুৎপন্ন বস্তু' তথা 'বর্তমান কথা' নামক অংশে পাওয়া যায়। এ অংশে কখন, কার উদ্দেশ্যে এবং কি উপলক্ষে জাতকটি ভাষিত হয়েছিল তার বর্ণনা আছে। অর্থাৎ এ অংশে বর্ণিত বিষয়সমূহ জাতক ভাষণকারী বা রচয়িতার সমকালীন। এ অংশের তথ্যসমূহ জাতকভাষণকারী বা রচয়িতার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ বা দৃষ্ট হওয়ায় এসব তথ্যের ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। ফলে জাতকের তথ্যের আলোকে অংকিত প্রাচীন ভারতের সমাজ জীবন ইতিহাসস্পর্শী হিসেবে গণ্য করা যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে জাতকের আলোকে প্রাচীন ভারতের ভৌগোলিক অবস্থা বা অবয়ব সমীক্ষা করেছি। সমীক্ষণে দেখা যায়, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ জম্বুদীপ, জম্বুসণ্ড, সুদর্শনদীপ, সিন্ধু, সপ্ত-সিন্ধব প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিল এবং সমগ্র ভারতবর্ষ ষোলটিরও অধিক জনপদ বা রাজ্যে বিভক্ত ছিল। অর্থাৎ ভারতবর্ষের সমগ্র ভৌগোলিক সীমানা বর্তমানকালের ন্যায় কোনো একক রাষ্ট্রের অধীনে ছিল না। পালি অঙ্গুত্তর নিকায় গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, সমগ্র ভারতবর্ষ ষোলটি জনপদে বিভক্ত ছিল। সেগুলো হলো : অঙ্গ, মগধ, কাশী, কোশল, বজ্জি, মল্ল, চেতি, বংস, কুরু, পঞ্চাল, মচ্চ বা মৎস, সূরসেন, অস্সক, অবন্তি, গান্ধার, কম্বোজ। এসব জনপদ বিভিন্ন রাজা ও রাজবংশ কর্তৃক শাসিত হতো। কিন্তু জাতক এবং চূল্লনিদ্দেস গ্রন্থে ষোলটির অধিক জনপদ বা রাজ্যের উল্লেখ দেখা যায়। তাছাড়া, চূল্লনিদ্দেস, মহাবস্তু, জৈন ভগবতী সূত্রে ষোড়শ জনপদের যে নামের তালিকা পাওয়া যায় তাতে মিল এবং অমিল উভয়ই লক্ষ্য করা যায়। এতে বোঝা যায়, ষোল সংখ্যাটি দ্বারা কেবল আয়তনে বড় এবং রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী জনপদ বা রাজ্যগুলোকে বোঝানো হয়েছে। কারণ গাঙ্গেয় উপত্যকায় অবস্থিত অধিকাংশ জনপদ এতে অন্তর্ভূক্ত থাকলেও উত্তর ভারতের বহু জনপদ এতে অন্তর্ভূক্ত করা হয় নি। ফলে ধারণা করা যায় যে, প্রাচীন ভারতের রাজনীতিতে গাঙ্গেয় উপত্যকার জনপদগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতো এবং এগুলো কেন্দ্র করেই প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্র-কাঠামো বিকাশ লাভ করেছিল। তবে ষোড়শ জনপদসমূহ মানচিত্রে উপস্থাপন করলে প্রাচীন ভারতের যে ভৌগোলিক অবয়ব পাওয়া যায় তা বর্তমানকালের ভৌগোলিক অবয়বের সঙ্গে যথেষ্ট মিল পাওয়া যায়। ভৌগোলিক সীমারেখা বিচারে দেখা যায়, প্রাচীন ভারতবর্ষ উত্তরে হিমালয়, উত্তর পশ্চিমে আফগান-পাকিস্তান সীমান্ত, দক্ষিণপূর্বে বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে আরব সাগরের

Dhaka University Institutional Repository

তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই বিশাল ভৌগোলিক সীমারেখায় বসবাসরত জনগোষ্ঠিকে কেন্দ্র করে প্রাচীন ভারতের সমাজ জীবনের ভিত্তি গড়ে ওঠেছিল। এ কারণে ভারতবর্ষের সমাজ জীবন বৈচিত্র্যে ভরপুর।

তৃতীয় অধ্যায়ে প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করেছি। পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রাচীন ভারতের রাজনীতি মূলত উপরে বর্ণিত ষোলটি জনপদ বা রাজ্যকে ঘিরে আবর্তিত হতো। জনপদগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক যেমন ছিল তেমনি যুদ্ধ-বিগ্রহও প্রচলিত ছিল। বিশেষত, অঙ্গ, মগধ, কাশী, কোশল, বজ্জি, মল্ল প্রভৃতি রাজ্য রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী ছিল বিধায় এসব রাজ্যের রাজারা একে অপরের রাজ্য দখলের সংগ্রামে লিপ্ত থাকতো। কিন্তু বুদ্ধের সময়কালে মগধ রাজনৈতিকভাবে ব্যাপক শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং মগধকে কেন্দ্র করে প্রাচীন ভারতের একক রাষ্ট্র-ব্যবস্থা বিকাশ লাভ করতে শুরু করে।

চতুর্থ অধ্যায়ে প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও জনজীবন পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করেছি। বিশ্লেষণে দেখা যায়, গ্রাম-নগর-মহানগর-বন্দর প্রভৃতিকে ভিত্তি করে প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রীয় অবকাঠামো গড়ে ওঠেছিল। অধিকাংশ রাষ্ট্রে রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল এবং রাজপদ ছিল বংশানুক্রমিক। তবে কিছু কিছু রাষ্ট্রে গণতন্ত্র বা কুলতন্ত্রও প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার লোকের পৃথক পৃথক শ্রমদানে রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালিত হতো। পেশা অনুসারে এসব জনগণ সাতটি শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। যেমন, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী, ধর্মীয় সম্প্রদায় শ্রেণি, বণিক শ্রেণি, স্বাধীন পেশাজীবি শ্রেণি, শিল্পী ও কারিগর শ্রেণি, লোকরঞ্জক-রঞ্জিকা শ্রেণি এবং সাধারণ কর্মজীবি শ্রেণি। সুনিয়ন্ত্রিত প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে রাষ্ট্রসমূহ পরিচালিত হতো। প্রশাসনিক ব্যবস্থার কর্ণধার ছিলেন রাজা। প্রশাসনের সর্বত্র ছিল তাঁর কর্তৃত্ব। তাঁর পরেই ছিল উপরাজের স্থান। সাধারণত জ্যেষ্ঠ রাজপুত্ররা উপরাজ পদে অধিষ্ঠিত হতেন। তবে ক্ষেত্র বিশেষে এর ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করা যায়। যেমন, কখনো কখনো রাজার ভ্রাতা বা জামাতা উপরাজপদে অধিষ্ঠিত হতেন। উপরাজের পরে ছিল অমাত্য পরিষদের স্থান। রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অমাত্য পরিষদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন এবং বর্তমানকালের ন্যায় বিভিন্ন প্রশাসণিক মন্ত্রনালয় তাঁদের অধীনে পরিচালিত হতো। সর্ববিষয়ক অমাত্য বর্তমানকালের প্রধান মন্ত্রির ন্যায় ভূমিকা পালন করতেন। এছাড়া, অর্থধর্মানুশাসক, সেনাপতি, পুরোহিত, বিচারক, ভাণ্ডারগারিক, অর্ঘকারক, দ্রোণমাত্য, ছত্র-গ্রাহক, খড়গ-গ্রাহক, রাজবৈদ্য, হিরণ্যক, রজ্জুক, শ্রেষ্ঠী, সারথী, গজাচার্য প্রমুখ কর্মকর্তা সকলেই অমাত্য বা মন্ত্রির পদমর্যাদা সম্পন্ন ছিলেন। নগরসমূহ ‘নগর-গুত্তিক’ নামক প্রশাসনিক কর্মকর্তা দ্বারা পরিচালিত

Dhaka University Institutional Repository

হতো। 'কম্মিক' নামক কর্মকর্তা শুল্ক আদায় করতেন। 'গ্রামভোজক' ছিলেন সর্ব নিম্ন শ্রেণির প্রশাসনিক কর্মকর্তা, যিনি গ্রাম পরিচালনা করতেন এবং রাজকর সংগ্রহ করতেন। এভাবে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার কর্মকর্তার সমন্বয়ে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন জনজীবন নিয়ন্ত্রণ করতো। জাতকে রাজকর সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থার উল্লেখ নেই। তবে জনগণ শস্যের একটা অংশ রাজকর হিসেবে প্রদান করতেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায় এবং জনগণ হতে সংগৃহীত করের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় খরচ নির্বাহ এবং নাগরিক সুবিধা প্রদান করা হতো। তবে গ্রাম অপেক্ষা নগরের লোকেরাই অধিক নাগরিক সুবিধা ভোগ করতেন। কিন্তু রাজনৈতিক দিক থেকে গ্রামগুলো নগর অপেক্ষা কম কেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত ছিল।

পঞ্চম অধ্যায়ে জাতকের তথ্যের আলোকে প্রাচীন ভারতের সমাজ ও সামাজিক প্রথা সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এ অধ্যায়ে প্রাপ্ত ফলাফল সমীক্ষায় প্রতীয়মান হয় যে, বুদ্ধের সময়কালে বা জাতকের রচনাকালে প্রাচীন ভারতে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। সমীক্ষণে দেখা যায়, বৌদ্ধধর্মের আর্বিভাবকালে মানুষ পশুপালনের স্তর অতিক্রম করে কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় প্রবেশ করেছিল। কৃষিভিত্তিক উৎপাদনমুখী সমাজে কঠোর শারিরিক পরিশ্রমের প্রয়োজন ছিল বিধায় উৎপাদন ব্যবস্থায় পুরুষের প্রাধান্য সৃষ্টি হয় এবং অপরদিকে মেয়েরা পিছিয়ে পড়ে। তাছাড়া, পুরুষরা সমাজে তাদের প্রাধান্য বৃদ্ধি করতে নানা অনুশাসন তৈরি করে। এসব অনুশাসন সংস্কাররূপে নারী সমাজ মেনে নিতে থাকলে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠে। সেসময় পরিবার ছিল সমাজের মূল কেন্দ্রবিন্দু। পরিবার গঠনের সামাজিক ও শাস্ত্রসম্মত প্রথা ছিল বিবাহ। প্রাচীন শাস্ত্রে আট প্রকার বিবাহ প্রথার উল্লেখ আছে। যথা : ব্রাহ্মবিবাহ, দৈববিবাহ, আর্যবিবাহ, প্রজাপত্য-বিবাহ, অসুর-বিবাহ, রাক্ষস-বিবাহ, পৈশাচ-বিবাহ এবং গান্ধর্ব-বিবাহ। তন্মধ্যে ব্রাহ্মবিবাহ, দৈববিবাহ, আর্যবিবাহ এবং প্রজাপত্য-বিবাহ শাস্ত্রীয় বিবাহবিধিরূপে স্মৃতিশাস্ত্রকারগণের দ্বারা প্রশংসিত এবং অপরগুলো নিন্দিত হয়েছে। আট প্রকার বিবাহ প্রথার সবগুলো জাতকে উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে জাতকে নিম্নরূপ পাঁচ প্রকার বিবাহ প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায় : অভিভাবক কৃর্তক স্থিরকৃত বিবাহ, স্বয়ম্বর বিবাহ, গান্ধর্ব-বিবাহ, রাক্ষস-বিবাহ এবং অসুর-বিবাহ। বর্তমানকালের মতো প্রাচীনকালে বিবাহের ক্ষেত্রে নানা বিধি নিষেধ প্রচলিত ছিল। স্বজাতি, কুল এবং বংশ হতে বিবাহ করা ছিল সামাজিক ও শাস্ত্রসঙ্গত রীতি। জাতকে বালিকা বিবাহের কিছু কিছু উল্লেখ পাওয়া গেলেও মেয়েরা সাধারণত ১২-১৬ বছর বয়সের মধ্যে বিবাহ করতো। তবে অধিকাংশ জাতকে ১৬ বছর বয়সকে বিবাহের আদর্শ বয়স হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বহুবিবাহ, বিধবা বিবাহ এবং কণেপণ প্রথা প্রভৃতিও প্রচলিত ছিল। তাছাড়া, সবর্ণের সঙ্গে অসবর্ণের বিবাহ অনুৎসাহিত

Dhaka University Institutional Repository

করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া, জাতি বা বর্ণপ্রথা ছিল প্রাচীন ভারতের সমাজ জীবনের মূল ভিত্তি। সমাজের সকল মানুষকে চারটি বর্ণ বা শ্রেণিতে বিভক্ত করে ব্রাহ্মণ্য সমাজ কাঠামো নির্মিত হয়েছিল। ব্রাহ্মণ্য সামাজিক অবকাঠামোতে ব্রাহ্মণের স্থান ছিল সর্বোচ্চ। তাঁরা সমাজে চারটি বিশেষ সুবিধা ভোগ করতেন। যথা : অবধ্যতা, অধ্যয়ন-অধ্যপনা, যাজন এবং যজন। পশুবলী এবং ব্যয়বহুল যাগযজ্ঞ ছিল ব্রাহ্মণ্য পূজাচারের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ব্রাহ্মণের পরেই ছিল ক্ষত্রিয়ের স্থান। রাজ্যশাসন এবং যুদ্ধবিদ্যা ছিল ক্ষত্রিয়দের পেশা। ক্ষত্রিয়ের পরে ছিল বৈশ্যের স্থান, ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল বৈশ্যদের পেশা। শূদ্ররা ছিল সর্ব নিম্নস্তরে, অন্য তিন শ্রেণির লোকের সেবা করাই ছিল তাঁদের পেশা। জাতকে 'অন্ত্যজ' শ্রেণিভূক্ত একশ্রেণির লোকের উল্লেখ পাওয়া যায়, যারা মানবেতর জীবন-যাপন করতো। কিন্তু ষড়তীর্থঙ্কর, বৌদ্ধধর্ম, আজীবিকধর্ম, জৈনধর্ম প্রভৃতির আবির্ভাবের ফলে সমাজে ব্রাহ্মণদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও মর্যাদা হ্রাস পেতে থাকে। ক্ষত্রিয়রা রাজ্যশাসন প্রক্রিয়ার সাথে এবং বৈশ্যরা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত থাকার কারণে ক্রমে সমাজে তাঁদের প্রাধান্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। বুদ্ধ বর্ণপ্রথার বিরোধিতা এবং বৌদ্ধসংঘে সকল শ্রেণি-পেশার লোকদের স্থান দেওয়ার কারণে বর্ণপ্রথা ক্রমশ দুর্বল হতে থাকে এবং অন্ত্যজ বা অস্পৃশ্য শ্রেণির মানুষ মানবিক অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার লাভ করতে শুরু করে। জাতক আরো সাক্ষ্য দেয় যে, দাস প্রথা ছিল প্রাচীন ভারতের সমাজ জীবনের এক অভিশপ্ত অধ্যায়। কৃষিভিত্তিক সমাজে মানুষ উৎপাদনমুখী হলে জমির মালিকানা তথা ব্যক্তিগত ভূসম্পত্তির ধারণার সৃষ্টি হয় এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উদ্বৃত্ত উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ফলে ভূমির মালিক অন্য মানুষদের সাহায্যে উদ্বৃত্ত উৎপাদন পূর্বক ধনবান হওয়ার স্বপ্ন দেখে। ফলশ্রুতিতে ধন বৈষম্য সৃষ্টি হয় এবং অসমান্তরাল এক সমাজ ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। সমাজে ধন বৈষম্য সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সবল মানুষ অপেক্ষাকৃত দুর্বল মানুষকে নানা কৌশলে অধীনস্ত করে সম্পদ আহরণ করতে শুরু করে। এভাবে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে সমাজে দাসপ্রথা সৃষ্টি হয়। দাস প্রথা প্রথম সৃষ্টি হয় গ্রীকে। বর্ণপ্রথার মাধ্যমে তা ভারতবর্ষেও বিস্তৃতি লাভ করে। তবে দাসপ্রথা উদ্ভব ও অব্যাহত থাকার পেছনে যে প্রলুব্ধকারী কারণ, তা ছিল অর্থনৈতিক। মানুষের সভ্যতার অগ্রগতি হয়েছে. কিন্তু উদ্বৃত্তের ধারণা জীবন্ত থেকেছে। কৃষিকর্মের বিস্তার ঘটেছে। কিন্তু এই সূত্র সব ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়েছে। বর্তমানেও দাসত্ব ও দাস প্রথা পৃথিবীর মানুষের জীবনের অনিবার্য অঙ্গ হয়ে বিরাজ করছে।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়ে জাতক রচনাকালে ভারতের প্রচলিত ধর্মীয় মতাদর্শ সম্পর্কে বর্ণনা করেছি। এ অধ্যায়ের প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, বুদ্ধের সময়কালে বা জাতক রচনাকালে বহু ধর্মীয় সংঘ এবং ধর্মীয় মতাদর্শের অস্তিত্ব ছিল। বুদ্ধ পূর্ববর্তী সময় থেকে প্রচলিত বৈদিক আচার-অনুষ্ঠান প্রাচীন ভারতের ধর্মীয় জগতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। সে সময় যাগ-যজ্ঞ নির্ভর অসংখ্য দেবতার পূজা অর্চনা প্রচলিত ছিল। যজ্ঞকারীর পূজায় তুষ্ট হতেন দেবতা এবং পূরণ করতেন যজ্ঞকারীর মনের বাসনা। ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ দেবতা ও যজ্ঞকারীর মধ্যকার যোগসূত্র রচনা করতেন। পশুবধ ছিল যজ্ঞের বা পূজার অন্যতম উপকরণ। ব্রাহ্মণগণ ছিলেন সমাজ নিয়ন্তা। বৈদিক চিন্তা-ধারার বাইরে মত প্রকাশ ছিল প্রায় অসম্ভব। এরূপ এক পরিস্থিতিতে আবির্ভূত হন ষড়তীর্থঙ্কর গণ, মহাবীর এবং গৌতম বুদ্ধ। ষড়তীর্থঙ্কদের মতাদর্শ ধর্মীয় চিন্তা-চেতনার জগতের নতুন বিপ্লব আনয়ন করে। তৎকালে স্বাধীন মত প্রকাশের কারণে তাঁদেরকে মুক্ত চিন্তার দার্শনিক হিসেবে গণ্য করা হয়, যদিও গৌতম বুদ্ধ তাঁদের ধর্ম-দর্শন মুক্তির জন্য সহায়ক নয় বলে অভিমত পোষণ করেছেন। বৈদিক আচার-আচরণ এবং যাগ-যজ্ঞের হোমানলে মানুষের চিন্তা-চেতনা যখন কুয়াশাচ্ছন্ন তখন ষড়তীর্থঙ্কদের মতাদর্শ মানুষকে কিছুটা স্বাধীন চিন্তা-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। তবে তাঁদের মতাদর্শ মানুষকে সঠিক মুক্তির পথ নির্দেশ করতে পারেনি। তখন গৌতম বুদ্ধ তাঁর ধর্ম-দর্শন প্রচারের মাধ্যমে মানুষকে অদৃশ্য শক্তির উপর নির্ভরশীলতা থেকে মুক্তি দেন এবং কর্মবাদের মাধ্যমে নিজেই নিজের নিয়ন্তা হিসেবে ক্ষমতা প্রদান করেন। তিনি চতুরার্য সত্য সম্যকভাবে উপলব্ধি পূর্বক অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলনের মাধ্যমে নির্বাণ লাভ সম্ভব বলে দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন এবং বলেন, 'প্রত্যেকে নির্বাণ লাভ করতে সক্ষম'। তাঁর এরূপ অভিমত বৈদিক আদর্শে উদ্ভাসিত যুগে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। মানুষ নতুনভাবে শিক্ষা নেয়, 'যাগ-যজ্ঞ নয় আত্মশুদ্ধি এবং স্বীয় কর্মফলেই মানুষ দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করতে সক্ষম।'

সপ্তম অধ্যায়ে প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতি সমীক্ষা করেছি। প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায়, ঋষিগণই ছিলেন প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতির মূল উৎস। ঋষিদের প্রজ্ঞালোক থেকেই ভারতবর্ষে শিক্ষার প্রথম রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়েছিল এবং ঋষি পরিবারের মাধ্যমেই তা সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল। জাতীয় সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করাই ছিল প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে একে রক্ষা করার অভিপ্রায়ও প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় লক্ষ্য করা যায়। বিদ্যার্থীকে আত্ম-প্রত্যয়, স্বাবলম্বী, সেবা-ব্রত পরায়ণ ও সামাজিক কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ করাই ছিল এই শিক্ষার বিশেষ লক্ষ্য। প্রাচীন ভারতে শিক্ষা এবং ধর্মকে অভিন্ন দেখার ফলে ভারতীয় শিক্ষায় সর্বদাই

Dhaka University Institutional Repository

আধ্যত্মিক সম্পদ প্রাধান্য লাভ করে। এছাড়া, শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে আত্মিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকায় শিক্ষায় সাধারণত কোনো সঙ্কট সৃষ্টি হতো না। মানসিক উৎকর্ষতা, রুচি ও প্রবণতা অনুসারে বিষয় ও বৃত্তি শিক্ষা ব্যবস্থা এবং পাঠ পদ্ধতি নির্ধারণ; অবৈতনিক, আবাসিক এবং কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রবর্তন প্রভৃতি ছিল প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার অনন্য উপাদান। শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনায় সমাজের প্রত্যেক শ্রেণি-পেশার মানুষের দায়িত্ব গ্রহণের দৃষ্টান্ত প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় যেরূপ লক্ষ্য করা যায় তা আর কোনো দেশে লক্ষ্য করা যায় না। বৌদ্ধধর্ম প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় এক বৈপ্লবিক যুগের সূচনা করে। বৈদিকযুগে শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল ব্রাহ্মণ্য সমাজের গণ্ডিভূত, বৌদ্ধযুগে তা জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ সকলের জন্য উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। ফলে সাধারণ মানুষও শিক্ষার অধিকার লাভ করে। এভাবে বৌদ্ধযুগে শিক্ষা ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক আদর্শ স্থাপিত হয়। দ্বিতীয়ত, বুদ্ধ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তে সাধারণ মানুষের মাতৃভাষা তথা প্রাকৃত ভাষাকে প্রাধান্য দেয়া হলে বিশাল জনগোষ্ঠি মাতৃভাষায় বিদ্যাচর্চার সুযোগ লাভ করে। এক্ষেত্রে বৌদ্ধ বিহারগুলো বিদ্যালয়ের ভূমিকা পালন করায় সমগ্র ভারতবর্ষে শিক্ষার হার দ্রুত বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। এ কারণে বৈদিকযুগে গুরুগৃহ ও বৌদ্ধযুগে সঙ্ঘ ছিল জনসাধারণের গর্বের বস্তু। এগুলোই ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে ঋদ্ধ করেছিল এবং অনন্য বৈশিষ্ট্য দান করেছিল। সেই ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ শিক্ষা-সংস্কৃতি বর্তমান ভারতবর্ষের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ভিত্তি নির্মাণ করেছিল।

অষ্টম অধ্যায়ে প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করেছি। এতে দেখা যায়, প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক অবকাঠামোতে গ্রাম ছিল উৎপাদক কেন্দ্র, অপরদিকে নগর ছিলো মজুদ ও বিতরণ কেন্দ্র, এবং কৃষি ও ক্ষুদ্রশিল্প ছিল অর্থনীতির প্রাণ বা মূল চালিকা শক্তি। প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড ও কৃষি ব্যতীত অধিক সংখ্যক জনগণ প্রধানত ১৮ প্রকার শিল্প তথা বৃত্তিকে অবলম্বন করে আর্থিক সংস্থান ও জীবিকা নির্বাহ করতো। এসব বৃত্তিধারী শিল্পীর কর্মদক্ষতা ও কলা-কৌশলে প্রস্তুতকৃত দ্রব্য দেশ-বিদেশে খুবই চাহিদা ছিল। কৃষি এবং শিল্পজাত দ্রব্য ছিল ব্যবসা বাণিজ্যের মূল উপাদান। স্থল এবং জল- উভয় পথেই ব্যবসা-বাণিজ্য চলতো। পণ্য পরিবহণে বণিকেরা সাধারণত স্থলেপথে গো-শকট, আর জলপথে অর্ণবপোত বা নৌযান ব্যবহার করতেন। তাঁরা নানারকম কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্য নিয়ে দূর-দূরান্তে বাণিজ্য করতে যেতেন এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনপূর্বক দেশকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করতে ভূমিকা রাখতেন। তৎকালে ভারতবর্ষের সঙ্গে নৌপথে পশ্চিমে পারস্য উপসাগর, দক্ষিণে লঙ্কাদ্বীপ, দক্ষিণপূর্বে মালয় এবং পূর্বে ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। দ্রব্য বেচা-কেনায় দু'প্রকার বিনিময় প্রথা প্রচলিত ছিল।

মুদ্রার বিনিময়ে যেমন পণ্যের আদার-প্রদান হতো, তেমনি পণ্যের বিনিময়েও পণ্যের আদান-প্রদান চলতো। তবে মুদ্রাগুলো ছিল ধাতবপদার্থে তৈরী। পালি সাহিত্য সমীক্ষায় দেখা যায়, জাতকের রচনাকালীন অর্থনীতিতে ক্ষেত্র বিশেষে বৌদ্ধ চিন্তা -চেতনার প্রভাব পড়ে। ফলে মুনাফা অর্জন অর্থনীতির মূল দর্শন হলেও বৌদ্ধ-দৃষ্টিভঙ্গি ও ধ্যান-ধারণা নৈতিকতা প্রসূত মুনাফাকেই কেবল স্বীকার করে। এ কারণে বৌদ্ধযুগে অর্থনীতি, নৈতিকতা এবং আধ্যাত্মিকতা পরস্পরের পরিপূরক হয়ে ওঠে। তাই, বৌদ্ধ অর্থনৈতিক ধারণা একদিকে মুনাফা অর্জনকে সমর্থন দেয়, অন্যদিকে নৈতিকতা অনুসরণেরও নির্দেশনা প্রদান করে।

পরিশেষে বলা যায়, জাতকে প্রাচীন ভারতের সমাজ জীবন সম্পর্কে বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়, যদিও তা সমাজ জীবনের প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচনে অপ্রতুল। তৎসত্ত্বেও, জাতকে সমাজ জীবনের যেসব উপাদানের প্রতিচ্ছবি পাওয়া গেছে, বর্তমান ভারতীয় উপমহাদেশের সমাজ জীবনেও সেসব উপাদানের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। অতএব, বলা যায়, প্রাচীন সমাজ জীবনকে ভিত্তি করে বর্তমান ভারতের সমাজ জীবনের ভিত রচিত হয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. প্রাথমিক উৎস : পালি

- *Aṅguttara Nikāya*, 5 vols. (ed.) R. Morris and E. Hardy, London, P. T. S. London 1885-1900
- *The Atthasālinī, Buddhaghosa's Commentary on the Dhammasaṅganī*, (ed.) Edward Muller, London, P. T. S. 1897
- *Cūllaniddesa*, (ed.) W. Stede, London, P.T.S. 1956
- *Cūllavaṃsa*, (ed.) Wilhelm Geiger, London, P. T. S. 1980
- *Dīgha Nikāya*, 3 vols., ed. T. W. Rhys Davids, and J. Estin Carpenter, (ed.), London, P. T. S. 1890-1911
- *Divyāvadāna*, (ed.) P. L. Vaidya, Mithila Institute, Dharbung 1956
- *Jātaka*, 6 vols., (ed.) V. Fausboll and Dines Anderson, London, P. T. S. 1962
- *Kathāvatthu*, (ed.) A. C. Taylor, London, P. T. S. 1894
- *Madhuratthavilāsinī nāma Buddhavaṃsaṭṭhakathā of Bhadantācariya Buddhadatta Mahāthera*, (ed.) I. B. Horner, London, P. T. S. 1946
- *Majjhima Nikāya,* 3 vols., V. Trenckner and R. Chalmers, London, P. T. S. 1888-1902
- *Mahāvastu*, (ed.) E. Senart, Amsterdam, 1988
- *Manorathapūranī, Buddhaghosa's Commentary on the Aṅguttara Nikāya*, (ed.) Max Walleser, London, P. T. S. 1924
- *Papañcasūdanī : Majjhimanikāyaṭṭhakathā of Buddhaghosācariya*, (ed.) J. H. Woods and D. Kosambi, London, P. T. S. 1922
- *Paramatthadīpanī, Dhammapāla's Commentary on the Therīgāthā*, (ed.) E. Muller, London, P. T. S. 1893
- *Paramattha-dīpanī Theragathā-Aṭṭhagathā, The Commentary of Dhammapālācariya*, (ed.) F. L. Woodward, London, P. T. S. 1940
- *Paramattha-dīpanī , Udānaṭṭhakathā (Udāna Commentary) of Dhammapālācāriya*, (ed.) F. L. Woodward, London, P. T. S. 1926

Dhaka University Institutional Repository

- *Paṭisambhidāmagga*, (ed.) A. C. Taylor, London, P.T.S. 1905
- *Dhammapāla's Paramatthadāpanā, being the Commentary on the Peta-vatthu*, (ed.) E. Hardy, London, P. T. S. 1894
- *Dhammapāla's Paramttha-dīpanī pt. IV., being the Commentary on the Vimāna-vatthu*, (ed.) E. Hardy, London, P. T. S. 1901
- *Petavatthu*, (ed.) N. A. Jayawickrama, London, P.T.S. 1977
- *Saddhammapajjotikā, the Commentary on the Mahāniddesa and Cūllaniddesa*, 2 vols., (ed.) A. P. Buddhadatta, London, P. T. S. 1931-1939
- *Saṃyutta-Nikāya*, 5 vols., (ed.) L. Feer, London, P. T. S. 1884-1898
- *Sāratthappakāsinī : Buddhaghosa's Commentary on the Saṃyutta-Nikāya*, (ed.) F. L. Woodward, London, P. T. S. 1929
- *Sammoha-vinodanī, Abhidhamma-pitake Vibhaṅgaṭṭhakathā*, (ed.) A. P. Buddhadatta, London, P. T. S. 1923
- *Sutta-Nipāta*, (ed.) D. Andersen and H. Smith, London, P. T. S. 1913
- *Sutta-Nipāta Commentary being Paramatthajotikā*, (ed.) Helmer Smith, London P. T. S. 1916
- *Samantapāsādikā, Buddhaghosa's Commentary on the Vinaya Pitaka*, 2 vols, (ed.) J. Takakusu and M. Nagai, London, P. T. S. 1924
- *The Mahāvaṃsa*, (ed.) Wilhelm Geiger, London, P.T.S. 1958
- *The Summaṅgalavilāsinī, Buddhaghosa's Commentary on the Dīgha-Nikāya*, (ed.) T. W. Rhys Davids & J. Estlin Carpenter, London, P. T. S. 1886
- *The Commentary on the Dhammapada*, (ed.) H. C. Norman, London P. T. S. 1906
- *The Niddesa*, (ed.) L. de La Valle Poussin and E. J. Thomas, London, P. T. S. 1916
- *The Summaṅgalavilāsinī, Buddhaghosa's Commentary on the Dīgha-Nikāya*, (ed.) W. Stede, London, P.T. S. 1886-1932.
- *Vinaya Pitaka*, 5 vols., (ed.) Herman Oldenberg, London, P. T. S. 1879-1883
- *Visuddhimagga of Buddhaghosācariya*, Henry Clarke Warren and Dharmanada Kosambi, Massachuestts 1950.

Dhaka University Institutional Repository

দ্বৈতীয়িক উৎস : ইংরেজি

- *A Dictionary of the Pali Language*, R. C. Childers, Rinsen Book Company, Tokyo, 1987
- *A Handbook of Pali Literature*, Oskae von Hinuber, De Griyter, New York, 1996
- *A History of Indian Literature*, (ed.) Jan Gonda, vol. vii., Fasc. 2, Wiesbaden, 1983
- *A History of Pali Literature*, Bimala Churn Law, Indica Books, Varanasi India 2000 (rep.)
- *A History of Pre-Buddhisttic Indian Philosophy*, Benimadhab Barua, Motilal Banarsidass, Calcutta, 1921
- *A Manual of Abhidhamma*, Narada Thera, Buddhist Missionary Society, Kuala Lampur, 1979
- *Ancient Indian Education*, R. K. Mookerji, New Delhi, 1986
- *Buddhist Councils and Development of Buddhism*, Sumangal Barua, Atisha Memorial Publishing Society, Calcutta 1997
- *Buddhist India*, T. W. Rhys Davids, Motilal Vanarsidas Publishers Private Limited, Delhi 1993
- *Buddhist Nikayas through Ancient Chinese Eyes*, J. Wang, Beiheft, 1994
- *Buddhist Recods of the Western World*, S. Beal, Low Price Publication, Delhi, 1973
- *Bukkhiyo yo Setsu*, Egaku Mayeda, Tokyo, 1975
- *Cambridge History of India*, Avestan Vendidad, London, 1918
- *Cunningham's Ancient Geography of India*, (ed.) N. Majumdar, Indological Book House, Varanasi, 1976
- *Dialogue of the Buddha*, (trans.) T. W. Rhys Davids, London, P.T.S. 1977
- *Dictionary of Pali Proper Names*, 2 vols. G. P. Malalasekera, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd, New Delhi, 1998 (3rd ed.)
- *Early History of India including Alexander's Campaigns*, V. A. Smith, Humphrey Milford Press, Oxford, 1924

Dhaka University Institutional Repository

- *Everyday Life in Early India*, Edward Michael, B. T. Batsford Ltd., London, 1968
- *Geography of Early Buddhism*, Bimala Churn Law, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd, New Delhi 1979
- *Genshi Bukkhyono Seiten No Seiritsu Kenkyo*, Egaku Mayeda, Sankibo,Tokyo, 1964
- *Historical Geography of Ancient India*, B. C, Law, Society of Asiatique De Paris, France 1954
- *History of Indian Literature*, 2 vols, M. Winternitz, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., 1991 (3rd 2d)
- *History of Buddhist Thought in India*, E.J. Thomas,
- *History of Doctrines of Ajvakas*, A. Basham, New Delhi, 1956
- *Indian Culture in the days of the Buddha*, A. P. de zoysa, Colombo, 1955
- *Kaccayana's Pali Grammar*, (ed.) S. C. Vidyabhusan, New Delhi, 1966
- *Kindred Sayings*, (trans.) F. L. Woodward, London, P.T.S. 1930
- *Manual of Buddhism*, E. Hardy, ZDMG 53
- *On Yuan Chwang's Travels in India*, Thomas Watters, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd, New Delhi, 1996
- *Pali-English Dictionary*, T. W. Rhys Davids and W. Stede, Munshiram Manoharlal Publishers, New Delhi, 1975
- *Pali Language and Literature*, Wilhelm Geiger, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd, New Delhi, 1996 (rep.)
- *Pali Language and Literature*, Kanai Lal Hazra, D. K. Printworld (P) Ltd, 1994
- *Political History of Ancient India*, H. C. Roychaudhuri, New Delhi, 1973
- *Record of the Buddhists Kingdom*, (trans.) J. Leggs, Oxford, 1886
- *Si-Yu-Ki, Buddhist Records of the Western World*, S. Beal, Motilala Baranasidas, Delhi, 1918
- *The Buddha and His Teachings*, Narada Thera, Vajirarama, Colombo, 1973
- *The Great Women of India*, (ed.) Swami Madhavananda and R. C. Majumder,New Delhi, 1977
- *The Lalita Vistara*, (trans.) R. L. Mitra, Sri Satguru Publications, Delhi, 1998

Dhaka University Institutional Repository

- *The Pali Literature of Ceylon*, G.P. Malalasekera, Buddhist Publication Society, Kandy, 1994
- *Theory of Soul in Theravada Buddhism*, Ryudo Yasui, Atish Memorial Publishing Society, Calcutta, 1994
- *The Wonder that was India*, A. L. Basham, Rupa & Co., 1954
- *Women under the Primitive Buddhism*, I. B. Horner, Routledge & Kegan Paul Ltd, London, 1930
- *Encyclopedia of Religion and Ethics*, *Husting's* voll. Viii.

দ্বৈতীয়িক উৎস : বাংলা

- *আর্য্য-অষ্টাঙ্গিক-মার্গ*, বীরেন্দ্রলাল বড়ুয়া, বোধিসত্ত্ব বিহার, চট্টগ্রাম, ১৩২৮ বাংলা
- *উদান*, (অনু.) শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৩০
- *কৌটিলীয়ম্ অর্থ শাস্ত্রম্*, (অনু.) মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, ২০০২.
- *গৌতম বুদ্ধের ধর্ম-দর্শন*, সুকোমল চৌধুরী, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলিকাতা, ১৯৯৭.
- *চূল্লবর্গ*, (অনু.) বিনয়াচার্য ভদন্ত সত্যপ্রিয় থের, রাজবন বিহার রাঙ্গামাটি, ২০০৮ (২য় সংস্করণ)
- *জাতক*, (অনু.) ঈশানচন্দ্র ঘোষ,ষষ্ঠ খণ্ড, করুণা প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৩৯৯ (বাংলা)
- *জাতক সন্দর্শন*, সুমন কান্তি বড়ুয়া এবং শান্টু বড়ুয়া, অ্যার্ডন পাবলিকেশন, ঢাকা,২০১১
- *ত্রিপিটক পরিচিতি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ*, সুকোমল বড়ুয়া এবং সুমন কান্তি বড়ুয়া, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০০
- *থেরগাথা*, (অনু.) স্থবির, রেঙ্গুন বৌদ্ধ মিশন প্রেস, ১৯৩৫.
- *থেরীগাথা*, (অনু.) ভিক্ষু শীলভদ্র, মহাবোধি সোসাইটি, কলিকাতা, ১৩৫৭ বাংলা
- *থেরীগাথা*, (অনু.) বেলু রানী বড়ুয়া, বাংলাদেশ রিসার্চ সেন্টার ফর বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ, ঢাকা, ২০০৪.
- *দাস প্রথা*, সিরাজ উদ্দিন সাথী, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০১১
- *দীঘ নিকায়*, (অনু.) ভিক্ষু শীলভদ্র, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলিকাতা, ১৯৪৭

Dhaka University Institutional Repository

- *দীপবংস*, (অনু.) সুমঙ্গল বড়ুয়া এবং বেলু রানী বড়ুয়া, বাংলাদেশ রিসার্স সেন্টার ফর বুড্ডিস্ট স্টাডিজ, ঢাকা, ২০০৪
- *দীপবংস*, (অনু.) দীপঙ্কর শ্রজ্ঞান বড়ুয়া ও সুমঙ্গল বড়ুয়া, বাংলাদেশ পালি সাহিত্য সমিতি, চট্টগ্রাম, ২০০৩
- *ধর্মপদ*, (অনু.) ধর্মধার মহাস্থবির, বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা, কলিকাতা, ১৯৫৪
- *পালি-বাংলা অভিধান*, (সংকলিত) শান্তরক্ষিত মহাস্থবির, বৌদ্ধধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ঢাকা, ২০০১
- *পালি ভাষার ইতিবৃত্ত*, দিলীপ কুমার বড়ুয়া, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১০
- *পালি সাহিত্যের ইতিহাস*, রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮০
- *পালিসাহিত্যে নগরবিন্যাস ও নগরজীবন*, করুণানন্দ ভিক্ষু, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪
- *পালি সাহিত্যে নারী*, বাণী চট্টোপাধ্যায়, পুনশ্চ, কলিকাতা, ১৯৯০
- *প্রাচীন ভারতের ইতিহাস*, সুনীল চট্টোপাধ্যায়, পশ্চিবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৮৭
- *প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস*, হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, পশ্চিবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৮৯
- *প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস*, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, কলিকাতা, ১৯৯৮
- প্রাচীন ভারতে নারী, ক্ষিতিমোহন সেন, কলিকাতা, ১৯৭৬
- *পৃথিবীর আদিম সমাজ*, নিজাম উদ্দিন আহ্‌মেদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭০
- *বঙ্গীয় শব্দকোষ*, শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য অকাদেমী, কলিকাতা, ১৯৬৬
- *বাংলাদেশের ইতিহাস*, রমেশচন্দ্র মজুমদার, জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৩৭৩ (বাংলা সন),
- *বুদ্ধচরিতম্*, (অনু.) তারাপদ ভট্টচার্য, সংস্কৃত সাহিত্য ভাণ্ডার, নির্বাহী সম্পাদক প্রসুন বসু, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৮৯.
- *বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম* এবং *প্রাচীন বৌদ্ধ সমাজ*, শ্রী শান্তিকুসুম দাশ গুপ্ত, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলিকাতা, ১৯৯৮
- *বুদ্ধবাণীর মূলতত্ত্ব*, সুমঙ্গল বড়ুয়া এবং বেলু রানী বড়ুয়া, পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০১০

Dhaka University Institutional Repository

- *বোধিসত্ত্বাবধান-কল্পলতা*, (অনু.) রায় শ্রীশরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলিকাতা, ২০০০
- *বৌদ্ধ দর্শনে বিমুক্তিমার্গ*, জিনবোধি ভিক্ষু, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১০
- *বৌদ্ধ দর্শনে সত্য দর্শন*, আচার্য্য বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির, ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৮৮
- *বৌদ্ধ দর্শনে পারমিতত্ত্ব*, সুমন কান্তি বড়ুয়া, পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০০৮
- *বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস*, মণিকুন্তলা হালদার (দে), মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলিকাতা, ১৯৯৬
- বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, কলিকাতা
- *বৌদ্ধরমণী*, শ্রী বিমলাচরণ লাহা, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলিকাতা, ১৯৯৯
- *বৌদ্ধ ভারত*, শরৎকুমার রায়, করুণা প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৪০১ (বাংলা সন)
- বৌদ্ধভারতে নারীর স্থান, সুকুমার সেনগুপ্ত, সবিতা, কলিকাতা, ১৯৪০
- *বৌদ্ধ সাহিত্য ও শিক্ষা-দীক্ষার রূপরেখা*, অনুকুলচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৯৮৫
- *বৈদিক ও বৌদ্ধ শিক্ষা*, নলিলনীভূষণ দাশগুপ্ত, প্রকাশ ভবন, কলিকাতা, ১৩৯৮ (বাংলা সন)
- *ভগবান বুদ্ধ*, ধর্মানন্দ কোসাম্বী, সাহিত্য-আকাদেমী, কলিকাতা, ১৯৮০
- *ভারতবর্ষের ইতিহাস*, রোমিলা থাপার,ওরিয়েন্ট লংম্যান প্রা. লি., কলকাতা, ২০০৪
- *ভারতবর্ষের ইতিহাস*, কোকা আন্তোনভা, গ্রিগোরি বোন্‌গার্দ-লেভিন এবং গ্রিগোরি কতোভস্কি, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, পুনমুদ্রন ১৯৮৬
- *ভারত ইতিহাসের সন্ধানে*, দিলীপ কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ২০০০
- *মধ্যম নিকায়*, (অনু.) বেণীমাধব বড়ুয়া, কলিকাতা, ১৯৪০
- *মহাপরিনিব্বান সুত্তং*, (সংকলিত ও অনূ.) রাজগুরু ধর্ম্মরত্ন মহাস্থবির, চট্টগ্রাম, ১৯৪১
- *মহাবর্গ*, (অনু.) প্রজ্ঞানন্দ স্থবির, শ্রী অধরলাল বড়ুয়া কর্তৃক প্রকশিত,কলিকাতা, ১৯৩৭
- *মহামানব বুদ্ধ*, রনধীর বড়ুয়া, আভাময়ী বড়ুয়া কৃর্তক প্রকাশিত, চট্টগ্রাম, ১৯৫৭
- *মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন*, ভিক্ষু শীলাচার শাস্ত্রী, নন্দন কানন বৌদ্ধ বিহার, চট্টগ্রাম, ১৯৭৮

Dhaka University Institutional Repository

- *মহাবংস*, (অনু.) দিলীপ কুমার বড়ুয়া এবং মৈত্রী তালুকদার, অ্যার্ডন পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০১১
- *মনুসংহিতা*, (অনু.) মানবেন্দু বন্দোপাধ্যায়, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, ১৪১০ বাংলা
- *মানুষের পৃথিবী আদিম মানুষের কথা*, সিরাজ উদ্দিন সাথী, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০১১
- *মানব সমাজ* (ভূমিকা ও সম্পাদনা, যতীন সরকার), রাহুল সাংকৃত্যায়ন, রুক্কু শাহ্ ক্রিয়েটিভ পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১০
- *মিলিন্দ প্রশ্ন*, (অনু.) পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির, ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৫
- *রাহুল সাংকৃত্যায়নের বৌদ্ধ দর্শন*, পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির, কলিকাতা, ১৪০১
- *লোকনীতি*, প্রজ্ঞালোক মহাথের, বৌদ্ধ মিশন প্রেস, রেঙ্গুন, ১৯৪৫
- *শূদ্রক বিরচিত মৃচ্ছকটিক*, সুকুমারী ভট্টাচার্য, সাহিত্য আকাদেমী, নতুন দিল্লী, ১৯৮০
- *শ্রীমদ্ভগবদগীতা*, গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৯৭৭
- *সংযুক্ত নিকায়*, প্রথম খণ্ড, (অনু.) শীলানন্দ ব্রহ্মচারী, ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৪০০ বাংলা
- *সদ্ধম্ম নীতি মঞ্জরী*, জিনবোধি ভিক্ষু, বুদ্ধিস্ট রিসার্চ এণ্ড পাবলিকেশন সেন্টার, চট্টগ্রাম, ২০০৪
- *সুত্তনিপাত*, (অনূ.) সাধনানন্দ মহাস্থবীর (বনভান্তে), রাঙ্গামাটি, ১৯৮৭
- *স্বপ্নবাসবদত্তা*, (অনু.) গণপতি শাস্ত্রী, কলিকাতা, ১৯৮৬

Dhaka University Institutional Repository

[সমাপ্ত]